কৃশানু

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা—৯

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

ছয় টাকা

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বন্ধুবরেষু—

বন্ধু,

তোমাকে প্রথম দেখি বৈশাখের খর-দীপ্ত মধ্যাহ্নে। শ্রদ্ধা জেগেছিল। আজ আবার দেখলাম বর্ষার মেঘ-মলিন অপরাহ্নে। মুগ্ধ হোলাম। সেই স্বীকৃতি এখানে সংযুক্ত হোল।

প্রীতিবদ্ধ গ্রন্থকার

এই লেখকের

বন্ধনী

শৃঙ্খল

আকাশ ও মৃত্তিকা

পান্থনিবাস

বসন্ত রজনী

মধুচক্র

ঘরের ঠিকানা

দেহ যমুনা

মনের গহনে

হংসবলাকা

বহ্ন্যুৎসব

শ্মশানঘাট

ক্ষণ বসন্ত

কৃষ্ণা

শতাব্দীর অভিশাপ

কালো ঘোড়া

মহাকাল

ক্ষুধা

নতুন ফসল ঃ

ময়ূরাক্ষী

গৃহকপোতী

সোমলতা

হালদার সাহেব (নাটক)

শীতের বেলা খুবই অল্প পরমায়ু নিয়ে আসে।

সকাল হতে-হতে দুপুর, দুপুর হতে-হতে সন্ধ্যা। শুভেন্দুর পড়বার ঘরেও দিনের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। আর ঠিক পড়া যায় না। কিন্তু মহারাজ প্রিয়দর্শী যে তাঁর নবনবতি ভাইকে সত্যসত্যই হত্যা করেননি, এ সম্বন্ধে এমন একটি অকাট্য প্রমাণ তার হাতে এসেছে যে, ঘরের আলো জ্বালবার কথা তার মনে নেই। চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য তীব্র ক'রে সেই প্রায়ান্ধকারেও সে পুরাতন পুঁথিখানির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিল।

এমন সময় ঘরের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি কোমল তনুলতা তার সোফায় তার গা ঘেঁষে ধুপ করে বসে পড়লো।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতেই শুভেন্দুর চোখ দুটো যেন খুশিতে ঝলমল করে উঠলো :

—শ্রী! আজকে যে! আমি ভেবেছিলাম,

শ্রী হাসলে। খুব ম্লান হাসি।

বললে, কাজ হয়ে গেল।

শ্রীর খদ্দরের শাড়ি থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ধুলায় ধূসর। মুখ মলিন, চোখে কালিমা।

শুভেন্দু বললে, কী সর্বনাশ! তুমি ট্রেণে এলে, না হেঁটে এলে?

শ্রী হাসলে। বললে, হাঁটাও ভালো। মাঝ রাস্তায় ট্রেণের পিছন দিক দিয়ে নেমে ট্যাক্সিতে এসেছি। রাস্তার ধুলোয় এই অবস্থা।

এমন ঘটনা শ্রীর জীবনে এই প্রথম নয়। শুভেন্দুও এতে অভ্যস্ত। সে চাকরটাকে ডেকে বাথরুমে গরম জল দিতে বললে। ঠাকুরকে বললে চায়ের জল চড়াতে।

ক্লান্তিতে শ্রীর দেহ যেন ভেঙে আসছিল। তাকে ঠেলে উঠিয়ে শুভেন্দু বললে, আগে স্নান করে এস। তারপর চা খেতে খেতে শোনা যাবে তোমার দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ।

হঠাৎ তার চোখ পড়লো শ্রীর পায়ের দিকে। শুভেন্দু চমকে উঠলো: ও কী করেছ! বুড়ো আঙুলটা যে একেবারে গেছে!

শ্রী একটু হেসে বুড়ো আঙুলটা আড়াল করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শুভেন্দু তখন ব্যস্তভাবে ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে পা-টা টেনে নিয়েছে। নখের আধখানা উঠে গেছে এবং সমস্ত স্থানটায় কৃষ্ণাভ লাল রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বেদনার একটা গাঢ় ছায়া শুভেন্দুর মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল।

কিন্তু সে পলকের জন্যে। তখনই শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় লাগালে এমন করে?

মৃদু কণ্ঠে শ্রী উত্তর দিলে, ট্রেণের পিছন দিকে নামতে গিয়ে, লাইনের পাথরে।

তারপর ক্ষত স্থানের দিকে চেয়ে হেসে বললে, নখটা আধখানা উড়ে গেছে দেখছি। এতটা যে লেগেছে উত্তেজনার মুখে বুঝতেই পারিনি।

শুভেন্দু কোনো কথা বললে না। গরম জল হয়ে গিয়েছিল। রান্নাঘর থেকে একটা প্যানে ক'রে খানিকটা গরম জল এনে ক্ষত স্থান ধুইয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে।

বললে, যাও, স্নান ক'রে এস। চা হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে একটা আড়ামোড়া ভেঙে কুণ্ঠিত হাস্যে শ্রী বললে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু। খাবার-টাবার কিছু আছে তো?

বাঁ হাতে শুভেন্দু তাকে বাথরুমের দিকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, আছে বোধ হয়। সে আমি দেখছি। তুমি স্নান ক'রে এস তো।

স্নান সেরে শ্রী যখন ফিরলো, তখন টিপয়ের উপর চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। শুভেন্দু রুটিতে জেলী মাখাচ্ছে।

ভুরু টেনে শ্রী বললে, আরে বাপ! জেলী কোত্থেকে এল?

শুভেন্দু হেসে বললে, ইলার কাণ্ড!

শ্রী দু'পেয়ালা চা তৈরী ক'রে এক পেয়ালা শুভেন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে এক পেয়ালা নিজে নিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরঝি এসেছিল নাকি?

শুভেন্দু বললে, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি সকালে গিয়েছিলাম প্রোফেসর দত্তের ওখানে সেই মহারাজ প্রিয়দর্শীর

—প্রিয়দর্শী থাক। তারপরের কথা বলো।

—আমি ভোরে উঠেই সেখানে চলে গিয়েছিলাম। চাকরটাকে পয়সা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এসে শুনি শঙ্কর আর ইলা এসেছিল। দেখে, তুমি নেই, আমি নেই, ঠাকুরটা ভাত নামিয়ে রেখে কাজের অভাবে ঝিমুচ্ছে! তারা আবার টাকা দিয়ে চাকরকে বাজারে পাঠায়। ইলা মাছের তরকারী রেঁধে দিয়ে চলে যায়। জেলীটা দিতেই বোধ হয় এসেছিল তারা।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরঝির ওখানে তার পরে গিয়েছিলে তুমি?

—কি ক'রে যাই? আমি তো

—যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো কোনো দরকারে এসেছিল। অন্তত: কেন এসেছিল সে খরটা নেওয়াও উচিত ছিল।

—ছিলই তো। কিন্তু প্রিয়দর্শীর এই ব্যাপারটা

—স্বীকার করছি গুরুতর।—শ্রী হেসে বললে,—কিন্তু মহারাজ প্রিয়দর্শী, যতদূর জানি, অহিংস ব্যক্তি। তোমার বোন কিংবা শঙ্করবাবুর মতো কোপনস্বভাবের তো নয়। তিনি অবশ্যই একটু অপেক্ষা করতে পারতেন।

শুভেন্দু হো হো করে হেসে উঠলো: যা বলেছ। কাল সকালেই যাব একবার। ওদের যেন কোথায় এবার বেড়াতে যাওয়ার কথা আছে না?

অন্যমনস্কভাবে শ্রী বললে, বলছিলেন তো দার্জিলিং যাবেন। কিন্তু এই সব গোলযোগের মধ্যে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—গোলযোগ কি রকম পাকিয়ে এলে?

—মন্দ নয়।

—ট্রেন ওড়াবে নাকি?

—ট্রেন ওড়াব কেন? সে তো আমাদের নিজেদের লোককেই মারা হবে।

—তবে?

—আছে, সে অনেক ব্যাপার। তোমার এ নতুন চাকরটা কবে এল?

—পরশু থেকে।

—সেটা গেল কোথায়? গিরধারী?

—সে তো তুমি যাওয়ার পরদিনই পালিয়েছে।

—হঠাৎ?

—তার ভয় হোল, তোমরা কি সব গণ্ডগোল পাকাবে, আর ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে। বেচারী নতুন বিয়ে করেছে। বাড়ির লোকদের সঙ্গে আর দেখা হবে কি না হবে, এই ভেবে ভয়ে দুর্ভাবনায় কাঠ হয়ে উঠেছিলো। এমন কাঁদতে লাগলো যে. আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

—তাই নাকি? কিন্তু এটাকে কি ক'রে পেলে?

—ওইটেই ফুস্‌লে-ফাস্‌লে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়।

—এটা আবার পালাবে না তো?

—বলা যায় না কিছুই। সেজন্যে খুব তোয়াজে রেখেছি। দু'বেলা চা খাওয়াচ্ছি, বুঝলে? যদি চায়ের মৌতাতে আটকে থাকে। তোমার আঙুলে কি যন্ত্রণা হচ্ছে?

—যেটুকু হবার কথা তার বেশী নয়।

—কিন্তু কী ব্যাপারটা বল তো? কোথায় গেছলে? কি ক'রে এলে? অমন চোট লাগালেই বা কি ক'রে?

—বলি:

১৯৪২এর ২০শে অগষ্টের কিছু আগে।

বম্বে কংগ্রেস তখনও বসেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষ্যে কংগ্রেস থেকে শ্রীরা কয়েকজন, ক'টি ছেলে এবং ক'টি মেয়ে, উত্তরবঙ্গে গেল কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি প্রচারের জন্যে।

আত্রেয়ী নদীর দুই তীরে কত গ্রাম, কত শহর ওরা ঘুরলো। তখন ভরা বর্ষা। কিশোরী আত্রেয়ীর দেহে যেন যৌবনের তরঙ্গ জেগেছে। কিন্তু সে পদ্মার মতো মাতাল হয়ে ওঠেনি। যৌবন জেগেছে যেন দুঃখীর ঘরে সুন্দরী তন্বীর দেহে। সে গৌরব করে না, গর্ব করে না, কুণ্ঠিত নম্রতায় ক্ষিপ্রচরণে যেন সকলকে এড়িয়ে চলে যায়। তীব্রতা তার মনের গভীরে।

চওড়া রাস্তা চলে গেছে সোজা। তার থেকে অল্প দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রামগুলি অভাবের রিক্ততা মাথায় নিয়ে যেন গাছগুলির আড়ালে ঝিমুচ্ছে। মাটির বাড়িগুলি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

কত তাদের দুঃখ! তবু কত শান্তি!

জায়গাটি খুবই ভালো লেগেছিল শ্রীদের। উন্মুক্ত রাঙা-মাটির মাঠ, গাছের ছায়া, কোমল স্নেহশীল মৃত্তিকা, তার উপর কচি ঘাসের আস্তরণ, উদার আকাশ,—কখনও নির্মেঘ শান্ত, যেন তপস্যারত,—কখনও মেঘে চঞ্চল, উড়ে-যাওয়া পাখির ডানায় চঞ্চল···

—জানো, মুক্তির ক্ষুধা যে মানুষের জীবনে কত দিকের, জানলাম সেখানে গিয়ে। শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি নয়,—কলকাতা শহর ইট, পাথর, এ্যাসফাল্‌টামে মুড়ে, ট্রামের লাইনে বেঁধে রেখে ছিল আমার যে-মন, আত্রেয়ীর ধারে তার সমস্ত বাঁধন যেন ঝর ঝর ক'রে খুলে গেল। মুক্তি পেলাম অবারিত স্থানের মধ্যে।

শ্রীর মন সেই অনর্গল মুক্তির স্মৃতির মধ্যে ডুবে চুপ হয়ে গেল।

—কোথায় উঠেছিলে ওখানে?—ওর ধ্যানরত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে শুভেন্দু একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে।

—অনেক জায়গায়।

হঠাৎ শ্রী ধড়মড় ক'রে উঠে বললে, একটি জায়গায় ছিলাম দু'টো দিন। কী সুন্দর জায়গা! চারিদিকে আম-কাঁঠালের গাছ। ছায়ায় মন জুড়িয়ে যায়। সকাল-সন্ধ্যায় একটি কাঁঠাল গাছের নিচে বসতো আমাদের বৈঠক। রাত্রে চাঁদের আলো কাঁঠালের মসৃণ পাতার ফাঁক দিয়ে পিছলে এসে পড়তো আমাদের মুখে-মাথায। তাকে ভুলব না।

শ্রী এক মিনিট থামলো।

—আব একটি মেযেকে দেখে এলাম। বাঙালী-ঘবের স্বল্পভাষিণী শ্যামলী মেয়ে। ভায়েব জন্যে যমের দোবে যে কাঁটা দেয সেই মেযে। সবাই বলে সেজদি, আমরাও বলতাম সেজদি। অসাধারণ কিছু নয়, তবু আশ্চর্য। মনের মধ্যে তাকেও গেঁথে নিয়ে এলাম।

শ্রী থামলো।

—কিন্তু পাযে লাগলো কি ক'বে?—শুভেন্দু জিজ্ঞাসা কবলে।

—হ্যাঁ, পাযে।—শ্রীর যেন চমক ভাঙলো। বলতে লাগলো:

—ওইখানেই পুলিশ আমাদের পিছু লাগলো। সবাই বুঝলাম, ব্যাপার সুবিধে নয। হয তো সেই রাত্রেই আমাদের গ্রেপ্তাব করতো। কাজও আমাদেব হযে গিযেছিল। সুতবাং রাত্রির অন্ধকারে ওখান থেকে বেরিযে পড়লাম। সোজা পথে নয়, অনেক ঘুবে। ওখান থেকে হাঁটা-পথে মালদহ, সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহাব, মনিহাবী ঘাট। ষ্টীমাবে একটি লোককে দেখে সন্দেহ হ'ল। আমরা ছড়িযে পড়লাম। এক এক জন এক এক কামবায় উঠলাম। বর্ধমানে যেন পুলিশেব একটু সমারোহ দেখলাম। হয তো আমাদের জন্য নয়। তবু মন কেমন ক'বে উঠলো। ট্রেন ছাড়বাব মুখে পিছন দিকে নামতে গিয়েই এই বিপত্তি।

শান্ত কণ্ঠে শুভেন্দু বললে, অমন ক'বে কি নামে?

—নামে না। আমিও নামতাম না। জেলে আমাব কী ভয়? কিন্তু,

—কিন্তু?

শ্রীর মুখের উপর লজ্জার ছায়া খেলে গেল। বললে, থাক।

—থাকবে কেন? বলোই না।

শ্রী বললে, দেখ, এবারে আমার নিস্তার নেই। আজই হোক, আর দুদিন পরেই হোক, আমাকে ধরবেই।

—তবে?

—আমার ইচ্ছা, এবারে ওরা আমাকে তোমার কাছ থেকে ধরে নিয়ে যাক। শুধু সেই লোভেই ট্রেনের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এলাম।

শুভেন্দুর একখানি হাত দুই হাতের মধ্যে নিয়ে শ্রী খেলা করতে লাগলো।

দুই

ইলাদের বাড়ি খুব দূরে নয়।

শুভেন্দুকে শ্রী আর মহারাজ প্রিয়দর্শী নিয়ে বসতেই দিলে না। টেনে বাড়ি থেকে বার করে ইলাদের বাড়ি নিয়ে চললো।

সেদিন কি একটা পর্বোপলক্ষ্যে ছুটি ছিল। সুতরাং বাইরের ঘরেই শঙ্করকে পাওয়া গেল। ওদের পদশব্দে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলেই সে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো:

—শিগগির এসো, শিগগির এসো, একটা কি সুন্দর কাঁচপোকা তেলাপোকাকে টেনে এনেছে, দেখবে এস।

কাঁচপোকার উপর ছেলেবেলা থেকেই ইলার প্রচুর লোভ। সে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। পরণে তার একখানা আটপৌরে শাড়ি, আঁচলটা আঁট ক'রে কোমরে বাঁধা। হাতে হলুদের দাগ।

সে ছুটে বাইরের ঘরের ভিতরের দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েই হেসে ফেললে।

শঙ্কর কবি নয়, এঞ্জিনিয়ার। লোহা-লক্কড়, ইঁট, কাঠ, চুণ, বালি, সিমেণ্ট নিয়েই তার কারবার। কিন্তু উপমাটা তার বড় যুৎসই হয়েছিল।

শুভেন্দু দেখতে কালো-কদাকার। রং আবলুসের মতো না হ'লেও বেশ কালো। শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই, অথচ টিংটিঙে লম্বা। গলাটা উটের মতো দীর্ঘ। ঠোঁট পুরু এবং সম্মুখের দাঁত দুটি বেশ বড়। মাথার শক্ত শক্ত চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। এ সত্ত্বেও তার মুখ যদি মানুষকে আকৃষ্ট করে, সে শুধু তার সুন্দর ভ্রূ এবং বড় বড় সুন্দর চোখের জন্যে। সমস্ত দেহের মধ্যে ভগবান শুধু ঐ একটি জায়গাতেই সুনিশ্চিত প্রতিভার চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। ওর চোখের দিকে না চাইলে মনে হবে, লোকটি তাতেও না, মাতেও না, নিতান্তই তেলাপোকার মতো চ্যাবচেবে।

ওর পাশে শ্রীকে কাঁচপোকা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। শাণিত তলোয়ারের মতো ঋজু ওর দেহ, বর্ণ কাঁচা সোনার মতো চিক্কণ, উদ্দাম কর্মশক্তিতে চোখ দুটো চঞ্চল। কিন্তু ওর দেহ-রেখা কি যেন অপূর্ব কৌশলে এবং সুষমায় সেই উদ্দামতাকে সংযত রেখেছে।

ভুরু বেঁকিয়ে শঙ্করকে শ্রী বললে, আমার স্বামীকে আপনি তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করলেন?

করযোড়ে শঙ্কর বললে, করলাম। কারণ, যোগ্যতর কোনো উপমা আমার মনে পড়লো না। ইচ্ছা করলে আপনি সংশোধন ক'রে দিতে পারেন।

শুভেন্দু বললে, বরং বলতে পারতে বিউটি এণ্ড দি বিষ্ট। তেলাপোকাটা না পাখি, না পশু। ওটা দেখলেই আমার গা কি রকম ক'রে ওঠে। তুমি আমাকে ভল্লুক বল, কিংবা বন্য বরাহ বলতে পার, কিন্তু তেলাপোকা নয়।

উত্তরে শঙ্কর একটা কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইলার ধমক খেয়ে চুপ করলে।

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, দিগ্বিজয় থেকে কবে ফিরলে বৌদি?

ঠোঁট টিপে হেসে সে-প্রশ্নটা শ্রী এড়িয়ে গেল। বললে, তুমি কি রান্না করছিলে?

--হ্যাঁ ভাই। ঠাকুরটা পালিয়েছে।

—বেশ করেছে। তা নিজে কেন? এটিকে লাগিয়ে দিলেই তো পারতে।

শঙ্কর বললে, পারেননি যে, সে আমার প্রতি করুণায় নয়, নিজেরই জন্যে।

শ্রী বললে, কি রকম?

শঙ্কর বললে, আমি না হয় রাঁধলাম, কিন্তু ওঁকে তো খেতে হবে।

—ও! সেই জন্যে!

—ওর সঙ্গে পারবি না ভাই। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে চল্।—বলে ওর হাতে একটা টান দিতেই শুভেন্দু বললে, আস্তে ইলা। ওর পায়ে ব্যথা!

—ব্যথা! কি ব্যাপার!—হাত ছেড়ে দিয়ে ইলা সবিস্ময়ে বললে।

—অর্থাৎ সংগ্রামটা অহিংস হলেও একেবারে রক্তশূন্য নয়।—শুভেন্দু বললে।

— আচ্ছা, তুমি থামো।

বলে শ্রী ইলার সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল।

তারপর রান্নাঘরে ইলা ও শ্রীর মধ্যে এবং বসবার ঘরে শঙ্কর ও শুভেন্দুর মধ্যে কথা হতে লাগলো:

●

—বৌদি, অমনি করে দাদাকে একলা ফেলে রেখে উধাও হোস, আমার বড় ভয় করে।

—ভয়টা কি! তোর দাদা কি কচি ছেলে যে ছেলেধরায় চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে?

—কচি ছেলেরও অধম। তারও ক্ষিধে-তেষ্টার বোধ আছে। দাদার তাও নেই। খেতে দিলে খাবে, না দিলে বুঝতেই পারবে না, ওর ক্ষিধে পেয়েছে।

কথাটা সত্য। তাই শ্রী চুপ ক'রে রইলো।

—সে দিন গিয়ে যা দেখে এলাম!

—হ্যাঁ, শুনেছি। তোমার জেলী খেলাম। ভারি চমৎকার হয়েছে।

—দাদা খেয়েছে?

—খেয়েছেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। কারণ ওঁর কাছে ঝোলা গুড় আর জেলীতে কোন তফাৎ নেই। তা সে যাক্‌গে। তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি তাই বলি:

—ব্রাদার, একটু চা হবে নাকি ?

— কি রকম প্রশ্ন ! এসেছি যখন, তখন কিছু না খেয়ে কি যাব ?

—তাহ'লে চলো, একটা রেষ্টুরেণ্টে যাওয়া যাক।

—রেষ্টরেণ্টে মানে ?

—মানে, একাধিক মেয়ে যখন একত্র হয় তখন স্বামী-পুত্র-সংসার সবই তারা ভুলে যায়। সুতরাং ভিতর থেকে যে চা আসবে সে ভরসা করি না।

—এই ব্যাপার ! তা, বোনের সম্বন্ধে আমার এটুকু ভরসা আছে। আমি অপেক্ষা করব।

শঙ্কর হেসে বললে, ওইটেই তোমার একমাত্র জোর শুভেন্দু। তুমি অপেক্ষা করতে জানো।

—এবং সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত জিতেও যাই। দেখেছ তো ?

শুভেন্দু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলো।

ইঙ্গিতটা যে শ্রী সম্পর্কে সে কথা বুঝতে শঙ্করের বিলম্ব হ'ল না। বললে, হ্যাঁ, অন্ততঃ এক জায়গায় যে জিতেছ, তা স্বীকার করি।

—সব জায়গায় জিতবো, তুমি দেখে নিও। জান, শান্ত হয়ে, নম্র হয়ে অপেক্ষা করতে জানা সাফল্যের সব চেয়ে সুনিশ্চিত চাবিকাঠি।

—দেখা যাক।

●

—ইলা, এবারে আমার নিস্তার নেই। যে কোনো দিন সকালে শুনবে, আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভয়ে ইলার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

গম্ভীর ভাবে বললে, আমি কতদিন তোকে নিষেধ করেছি ভাই। বিয়ের আগে ছাত্রীজীবনে যা করেছিস, করেছিস। এখন রাজনীতি ছেড়ে দে। তা তুই

শ্রী হেসে বললে, এ বিষয়ে তোর সঙ্গে আমার একটা স্থায়ী মতভেদ সেই কলেজের আমল থেকে রয়েই গেছে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক। এখন কথা হচ্ছে, তোর দাদাকে নিয়ে। তাঁকে কার কাছে রেখে যাই ?

বিরক্ত ভাবে ইলা বললে, গান্ধীজীর কাছে। তিনি রাজি না হ'লে ঠাকুর চাকরের কাছে।

—অগত্যা।

শ্রী নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো।

●

—শুনেছ বোধ হয়, এঁর জেলযাত্রা নাকি অবধারিত।

—বৌদির ? তোমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন ?

—আমার নিজেরই কাছে।—শুভেন্দু হাসলো।

—ভালো। কিন্তু তোমার কাছা খুলে গেলে কাছা লাগিয়ে দেবে কে ? ভুল ট্রামে চড়তে গেলে আটকাবে কে ? কে কলম খুঁজে দেবে, খাতা-পেন্সিল বই দরকার মতো হাতের কাছে এগিয়ে দেবে ?

—বিয়ের আগে যে দিত সেই।

—অর্থাৎ তুমি নিজে নয়। হিন্দু হস্টেলে থাকতে আমি মাঝে মাঝে ও কার্য করতাম। আরও কেউ কেউ করত শুনেছি। কিন্তু এখন শুনি তোমার আরও উন্নতি হয়েছে।

—আশা করি হয়েছে। আমি মনে করছি, তোমাদের সবাইকে খুঁজে-পেতে বার ক'রে আবার পুরাণো চাকরীতে বাহাল করব।

—সবাইএর কথা জানিনে, কিন্তু আমার উপায় নেই।

—কেন ?

—কারণ, যাঁরা কাছা দেন না এখন এমন একজনের চাকরীতে বাহাল হয়েছি। তিনি ছাড়বেন কেন ?

এ উত্তরে শুভেন্দু হাসলে। বললে, আমি ভাবছি এখন থেকে বাইরে স্যুট এবং বাড়িতে লুঙ্গী পরব।

—তাতে কাছার সমস্যা মিটবে। কিন্তু অন্য সব সমস্যা ?

—একটা তো মেটাই আগে।

বলতে বলতে শুভেন্দুর মুখ কিন্তু সত্যই করুণ হয়ে উঠলো।

●

—দাদার জন্যে ভেবো না, অন্ততঃ আমি যতক্ষণ আছি। কিন্তু তুমি চলে গেলে ওঁর যে কত কষ্ট হবে, সে কি জানো না?

—জানি।—শ্রী শক্ত হয়ে বললে,—কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। কোনো লোক দুঃখ পাবে না, অথচ দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, এমন তো হয় না। তাছাড়া আমাকে বিয়ে করলে এ দুঃখ যে পেতেই হবে, সে তো উনি জানতেন। আমি ওঁর অপরিচিত ছিলাম না।

—সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে। তুমি আমার সঙ্গে পড়তে, আমাদের বাড়ী আসতে-যেতে, দাদার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

—উনি কি জানতেন না আমি কংগ্রেসের কর্মী, কতবার জেলে গেছি, আরও কতবার যাব? আমি নিজে ওঁকে বলেছি।

—হয় তো বলেছ। কিন্তু সেকথা শোনার কান ওর তখন ছিল না।

—সে অপরাধ কি আমার?

—না। তাছাড়া, তোমাকে আমরা জানি, দাদার মনের মধ্যেকার তুমি সেই তুমি নও।

—সর্বনাশ! সে আমিটি কী তাহ'লে?

—সে শুধু দাদাই জানেন। আমি জানি, নিজের স্বপ্নের রঙে রাঙিয়ে তোমাকে তিনি নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন।

কথাটা শুনে শ্রীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। প্রকাশ্যে বললে, তোরা ভাই-বোনে এতও পারিস! কিন্তু তাও যদি হয়, সেও আমার অপরাধ নয়।

—না। অপরাধের কথাই এটা নয়। আমি শুধু বলছি, দাদার মনের মধ্যে ডুব দিয়ে সেই শ্রীকে একবার দেখ্। তাহ'লে জেল কেন, স্বর্গেও যেতে চাইবিনা।

শ্রী হাত জোড় ক'রে বললে, না ভাই, ও ডুব-দেওয়া-দেওয়ি ব্যাপারে আমি নেই। ও আমি পারিও না। জানিস তো, যতগুলি প্রার্থী এসে ভিড় করেছিল, মন-জানাজানি করতে গেলে এ জীবনে আমার বিয়ে কবাই হয়ে উঠতো না হয়তো। এ বিষয়ে আমি ভাই সোজা বুদ্ধির লোক।

কথাটা হাসির। কিন্তু ইলা হাসলো না। চা এবং খাবার ট্রের উপর সাজিয়ে চাকর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলে।

●

—শুভেন্দু, বিবাহটা ঠিক কাব্য নয়। মাঝে মাঝে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়।

—তার মানে?

—তার মানে বিয়ের পরই বৌদিকে কংগ্রেসের কাজ থেক নিবৃত্ত করা উচিত ছিল।

—কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, শ্রীর ইচ্ছায় কখনও বাধা দোব না।

—দাম্পত্য জীবনে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেয়ে প্রতিশ্রুতি ভাঙার রেওয়াজই বেশি।

—আমি তা পারি না।

—না পারলে কষ্ট পেতে হবে। এই দেখ, চা এসে গেছে! বাঃ। অপেক্ষা করার মূল্য আছে দেখা যাচ্ছে।

●

চায়ের পিছনে পিছনেই এলো শ্রী এবং ইলা। দুখানি চেয়ার টেনে বসলো তারা। খাবারের প্লেটগুলো ওদের কাছে কাছে নামিয়ে দিয়ে ইলা পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলো।

শুভেন্দু বললে, শঙ্কর এতক্ষণ তোদের নিন্দে করছিল।

চা ঢালতে ঢালতে মুখ না তুলেই ইলা বললে, সম্প্রতি ওইটেই ওঁর একমাত্র পেশা হয়েছে।

—বলছিল, মেয়েরা যখন গল্পে মাতে তখন স্বামী-পুত্রের কথা ভুলে যায়।

—সত্যি। পতিদেবতারা চোখের সামনে কাঁটার মতো সর্বক্ষণ এমন ভাবে বিরাজ করেন যে, ওই মুহূর্তগুলি ছাড়া তাদের ভোলবার আর সুযোগই পাওয়া যায় না।

শঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম হোল?

—চমৎকার! কিন্তু ও তো সর্বক্ষণই শুনছি। বৌদি, অপনার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে—

শ্রী বললে, নিবেদন করুন।

—আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না?

—জেলে?

—হ্যাঁ। এ গঞ্জনা অসহ্য।

—বেশ তো। তা হলে চা'টা খেয়ে নিন। তার পরে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। সন্দেশটা আগে খান। ওটা সেখানে একেবারেই পাওয়া যাওয়া না।

শঙ্কর চমকে উঠলো: বলেন কি! সন্দেশ পাওয়া যাবে না?

—না।

—তবে সেখানে যাচ্ছেন কিসের জন্যে?

—আমি আর যাচ্ছি কোথায়? গেলে তারা নিয়ে যাবে। ও এমন একটি জায়গা শঙ্করবাবু যে, নিজের ইচ্ছায় যাওয়াও যায় না, আসাও যায় না।

ইলা বললে, জিগ্যেস কর দাদা, কি উনি স্থির করলেন। আমাকে হাঁড়িতে চাল নিতে হবে তো।

শুভেন্দুকে আর জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। শঙ্কর বিরক্তভাবে তাড়াতাড়ি জবাব দিলে:

—নাঃ! সন্দেশই পাওয়া যায় না। তা হলে আর গিয়ে কি করব?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

শ্রী বললে, আঙুরের মতো তুলোয় শুইয়ে রেখে-রেখে শঙ্করবাবুর পরকাল ঠাকুরঝিই শেষ করে রেখেছেন।

—যা বলেছেন বৌদি। আমি কত নিষেধ করি…আর একটা করে সন্দেশ হবে না কি হে শুভেন্দু? তোমার বোনের স্বহস্তে প্রস্তুত। তোমার বোনের জিভে যত ঝালই থাক, হাত বড় মিঠে!

এবং নিজেই পাদপূরণ করে বললে, পেটেও পিঠেও।

তিন

সেদিন দুপুরে অসহ্য গুমোট পড়েছিল।

ক'দিন থেকে বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নেই। মেঘ আসছে আর চলে যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে না।

শুভেন্দু পড়বার ঘরে। তার ছোট টেব্‌লটিতে বই এবং কাগজের একটা ছোট-খাটো পাহাড় জমেছে। তারই মধ্যে বসে একাগ্র মনে কাজ করছে সে, এই অসহ্য গুমোটেও। তার পুরু চশমাটা ঘামে পিছলে থেকে থেকে নাকের ডগায় নেমে আসছে। বাঁ হাত দিয়ে বারেবারে সেটাকে উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চোখের দৃষ্টি একাগ্র ক'রে একবার এ-বই একবার ও-ই ঘাঁটছে, আর ঘন ঘন নোট নিচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই উৎসাহে চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে।

শোবার ঘরে দরজা-জানালা সব বন্ধ ক'রে, ভিজে ন্যাকড়ায় মেঝেটি বেশ ক'রে মুছে শ্রী শুয়ে ছিল। চেষ্টা করছিল ঘুমোবার। কিন্তু গুমোটে সুবিধা হচ্ছিল না। হাতের পাখাখানা চলছিল ঘন ঘন। কখনও ইলার সকালের কথাগুলো মনে ক'রে মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল, কখনও শঙ্করের কথা ভেবে ঠোঁটের কোণে হাসি জমছিল।

মনটা তার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুই, কি জানি কেন, ভালো লাগছিল না।

গেল শুভেন্দুর ঘরে। তার পিছনে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু শুভেন্দু তার উপস্থিতি টের পেল ব'লে মনে হল না।

কর্মরত তপস্বী স্বামীর দিকে চেয়ে শ্রী একটা মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, জানলা দিয়ে ঝাঁঝ আসছে। ওগুলো বন্ধ ক'রে আলোটা জেলে দোব ?

নোট নিতে-নিতেই শুভেন্দু বললে, দাও।

শ্রী আলোটা জেলে দিয়ে জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিলে। তার পরে বললে, কত ঘেমেছ ! ভিজে গামছাটা আনোনি কেন ?

গামছাটা আনবার জন্যে শ্রী দরজার দিকে পা বাড়ালো।

শুভেন্দুর নোট নেওয়া সেই মুহূর্তে বোধ করি শেষ হল। ডান হাতটা বাড়িয়ে শ্রীর একখানা হাত সে ধ'রে ফেললে।

বললে, কোথায় যাও ?

—গামছা আনতে।

—আনতে হবে না, থাক।

কপালে চোখ তুলে শ্রী বললে, থাকবে কি গো ! ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ !

শুভেন্দু ঠোঁট কুঁচকে হাসলে। বললে, সেকালে মুনি-ঋষিরা বৈশাখের খররৌদ্রে চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জেলে তপস্যা করতেন। কোনো করুণাময়ী মুনিপত্নী সে আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছেন ব'লে শুনেছ ?

শ্রীর হাতখানি তখনও শুভেন্দুর মুঠোর মধ্যে।

শ্রী বললে, অকারণ কষ্ট ক'রে লাভ কি ? আমি বলি, অন্ততঃ তোমার পড়বার ঘরখানার জন্যে একটা পাখা কেনা যাক।

শুভেন্দু আবারও হাসলে। বললে, জষ্টিস সেন তাঁর মেয়ের জন্যে একজন টিউটার খুঁজচেন। সেটা নিলে পাখার বাতাস খাওয়া যেতে পারতো। কিন্তু সেও তো জবাব দিলাম।

বিরক্ত কণ্ঠে শ্রী বললে, দিলে কেন ?

—ভালো লাগে না ব'লে।

—কিন্তু তাহ'লে দুপুরে তোমার পড়াশুনোর সুবিধে হ'ত।

—না হ'ত না।—অকস্মাৎ শুভেন্দুর বড় বড় চোখ যেন দপ্ করে জলে উঠলো। সে তীব্র দ্রুত কণ্ঠে বলতে লাগলো : আমি জানি কিছুই সুবিধা

হ'ত না। শ্রী, সত্যকে পেতে হয় দুঃখ-দহনের পথে। দুঃখকে এড়িয়ে চললে সত্যকেই এড়িয়ে চলা হয়। মুনি-ঋষিরা যে প্রখর রোদে আগুন জ্বেলে, প্রচণ্ড শীতে জলে গলা ডুবিয়ে তপস্যা করতেন, সে পাগলের খেয়াল নয়। তোমার কথাও ভাবো। তুমি যে জেলে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছ, সেই বা কেন? কারণ তোমার তপস্যা হচ্ছে দেশসেবা। দুঃখের পথই তাই তোমার পথ। নয় কি?

শ্রী চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

ওদের বয়সের তফাৎ বেশি নয়।

শ্রী হলো ইলার বয়সী। তার মানে শুভেন্দু থেকে দু'তিন বৎসরের মাত্র ছোট। দুজনে বন্ধুর মতো। স্বামীর সম্বন্ধে তার ছিল সখ্যতার ভাব। ভক্তি অথবা শ্রদ্ধার প্রশ্ন কখনই তার মনে আসেনি, আসার অবকাশও ঘটেনি। আজ প্রথম শুভেন্দুর মুখের দিকে, ওর হোমাগ্নিশিখার মতো আয়তোজ্জ্বল চোখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে হ'ল, শুভেন্দু তার চে'য়ে, সাধারণ মানুষের চেয়ে, অনেক বড়। এবং তার মনে যে ভাবটি জাগলো তাকে ভক্তি বললে হয়তো বেশি বলা হবে, কিন্তু শ্রদ্ধা বললে অসঙ্গত হবে না।

কিন্তু সেও বড় কথা নয়।

এই শ্রাবণ-মধ্যাহ্ন তারও চেয়ে বড়, তারও চেয়ে তীব্র যে অনুভূতি তার স্নায়ু-শিরায় বয়ে নিয়ে এল, তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

শুভেন্দুকে বিয়ে করে সে ভালবেসে নয়,—একরকম খেয়ালে প'ড়েই। ইলার কাছ থেকে সে জেনেছিল, শুভেন্দু তাকে ভালোবাসে, অত্যন্ত ভালোবাসে। কিন্তু তারও চেয়ে তার বড় ভরসা ছিল শুভেন্দুর ভদ্র মনের উপর। অল্প বয়স থেকেই শ্রী রাজনীতিক্ষেত্রে কাজে নেমেছিল। সুতরাং এটুকু অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল যে, সংসারে ভদ্রলোকের চেয়ে দুর্লভ প্রাণী আর নেই। সে একটি ভদ্রলোককে বিবাহ করছে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা সেদিন আর তার ছিল না।

আজ প্রথম সে উপলব্ধি করলে, শুভেন্দুর মুঠির মধ্যে তার হাত যেন কেঁপে উঠলো। শুভেন্দুর স্পর্শ তার স্নায়ু-শিরায় যেন আগুন ধরিয়ে দিলে। এমন অনুভূতি সে তো আর কোথাও কোনদিনই পায়নি।

তার ভাষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। নির্ণিমেষে শুভেন্দুর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই বোধ করি সম্ভবও ছিল না। অনন্ত কাল হয়তো তাই চেয়ে থাকত। এমন সময় চাকরটা এসে জানালে, বসবার ঘরে ভুজঙ্গবাবু অপেক্ষা করছেন।

শ্রীর ইচ্ছা করছিল না যেতে। কিন্তু শফর থেকে ফিরে আসার পর ভুজঙ্গের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ভুজঙ্গ একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক। শুধু তাই নয়, ওদের দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। বলতে গেলে শ্রীর রাজনৈতিক গুরু। সুতরাং গুরুতর কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ এসেছেন।

শুভেন্দু তাই ওকে ঠেলা দিয়েই পাঠিয়ে দিলে।

শ্রী বসবার ঘরে যেতেই ভুজঙ্গ বললে, পায়ে চোট লাগিয়েছ শুনলাম। এখন সেরেছে?

শ্রী প্রশ্নটার জবাব দিলে না। হেসে বললে, এসেই সে খবরও কানে পৌঁছেচে?

—পৌঁছেচে বই কি! এই রৌদ্রে তাই তো খবর নিতে এলাম।

এইটেই হ'ল ওদের দলের বিশেষত্ব। কত কর্মী কত কাজে দিন রাত্রি ঘুরছে। শরীর কখনও ভালো, কখনও খারাপ। কত আকস্মিক বিপদ পায়ে পায়ে ঘুরছে। নেতার কিন্তু সমস্ত দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে কিছুই এড়াচ্ছে না। তখনই তিনি ছুটছেন তার বাড়ি, যোগাচ্ছেন ঔষধ-পথ্য, সান্ত্বনা, সমবেদনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা। পরস্পরের হৃদয়ে-হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে একটা অদৃশ্য বন্ধন। এইটেই শ্রীকে আটকে ফেলেছে সব চেয়ে বেশি ক'রে।

—যাকগে। আঘাত তাহ'লে যতখানি শুনেছিলাম ততখানি গুরুতর নয়। তারপরের খবর কি বলো?

—ভালো। কর্মীদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখলাম। জনসাধারণও

বাধা দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, জনসাধারণের কথা থাক। কর্মীদের কথা বলো।

শ্রী বিস্মিত হোল: কেন বলুন তো? আমাদের আন্দোলন জনসাধারণকে বাদ দিয়ে তো নয়।

—কাগজে-পত্রে নয় বটে, কিন্তু কাজের সময় তাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণ স্বাধীনতা চায়, এ তুমি এখনও বিশ্বাস কর? এই আন্দোলনে ওদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তা নিষ্ক্রিয়। কাল যদি পুলিশ তোমাকে গুলী করে, ওরা চায়ের দোকানে ব'সে তোমার বীরত্বের প্রশংসা করবে। কিন্তু নিজের মেয়েকে বলবে না, তোমার জায়গা নিতে। বরং তোমাদের মতো মেয়ের সঙ্গে নিজের মেয়েকে মিশতেই দেবে না।

শ্রীর মুখের উপর একটা কালো ছায়া খেলে গেল।

ভুজঙ্গ তাড়াতাড়ি বললে, না, না। তুমি এর জন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ো না, শ্রী। সকল দেশেই জনসাধারণ বলতে এইই বোঝায়: একটা নিষ্ক্রিয়, আত্মস্থ, আত্মসুখ-পরায়ণ মানবসমষ্টি। তা যদি না হোত, তাহ'লে ওদের দেশেও যুদ্ধের জন্যে 'কনস্ক্রিপশন' করতে হোত না। তুমি পরাজিত ফ্রান্সের সম্বন্ধে পেত্যাঁর বিবৃতি তো পড়েছ। আমার মনে হয় জেতা-বিজেতা নির্বিশেষে সব দেশের জনতার মনোভাবই এই রকম।

—তাহ'লে ওই জনতা নিয়েই একদল জেতে, আর একদল হারে কেন?

—জেতে শ্রেষ্ঠতর সমরাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠতর যন্ত্রসজ্জার জন্যে। আর জেতে কুশলী সমরনায়কের জন্যে। তারা জানেন, এদের দিয়ে কি করানো যায় না, আর কি করানো যায় এবং কেমন করেই বা যায়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোনো বড় আদর্শের জন্যে প্রাণ যারা দিতে যায়, তারা লাখে এক জনের বেশি নয়। ইতিহাস রচনা করে তারাই। আমাদের প্রত্যাশাও তাদেরই কাছে, জনতার কাছে নয়।

কথাগুলো ভুজঙ্গ এক নিশ্বাসে প্রদীপ্ত কণ্ঠে ব'লে গেল। কিন্তু শ্রীর অন্তর স্পর্শ করলে না। এই তো সে ঘুরে এলো গোটা উত্তর বাংলা। সাধারণের কাছ থেকে কত উৎসাহ, কত সহানুভূতি, কত প্রীতি পেয়েছে। এরা স্বাধীনতা চায় না?

—চাইবে না কেন শ্রী, নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু তা নিজেরা অর্জন করতে চায় না। অন্যেরা রক্তের বিনিময়ে অর্জন ক'রে দিক, এই তারা চায়। ওদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ভালো খাওয়া-পরা, সুলভ চাকরী এবং অল্প পরিশ্রমে বেশি মাইনে,—তার বেশি নয়।

ভুজঙ্গ এক মুহূর্তে কি যেন ভেবে নিলে।

তারপর বললে, আমার ভয় হয় শ্রী, দেশ যদি এই মহাযুদ্ধের পরে হঠাৎ স্বাধীন হয়ে যায় এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে না পারেন, তাহ'লে এই জনসাধারণকে নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

ভুজঙ্গের এই নৈরাশ্যবাদ শ্রীর ভালো লাগছিল না।

বললে, ছেড়ে দিন ভবিষ্যতের কথা। এখনকার অবস্থা কি বলুন।

ভুজঙ্গ বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। সেদিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললে, ভালো নয়।

—কেন? কমিউনিষ্টরা অগষ্ট বিপ্লবে বাধা দেবে?

—তা তো দেবেই। কিন্তু তাদের জন্যে আমি ভয় পাই না।

—তবে?

—আমার ভয় 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রদের জন্যে।

—তারা বাধা দেবে?

—না। ততদূর পারবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ এত টাকা ওরা পাচ্ছে যে, ওদের নৈতিক মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে।

—কি রকম?

—সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার শ্রী। বাংলা দেশে খবরের কাগজ কোনো দিনই লাভজনক ব্যবসা ছিল না। ধনী অর্থ ঢালতেন লাভের লোভে নয়, দেশসেবার নেশায়। সাংবাদিকরাও আসতেন বেতনের লোভে নয়। সামান্যই ছিল তখন বেতনের হার। আসতেন ওই দেশসেবার নেশাতেই। খবরের কাগজের নীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরাই। তার জন্যে তাঁরাই যেতেন জেলে। কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র না হলে খবরের কাগজের মালিকরা সম্পাদকের কাজে

কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করতেন। যুদ্ধের কল্যাণে খবরের কাগজ আজকে একটা লাভজনক ব্যবসা। আজ আর মালিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তার ফলে সম্পাদক আজ তাঁর হুকুমমতো প্রবন্ধ লেখবার কেরাণী মাত্র। ভয়ের কথা এইখানে।

এই কথাগুলো শ্রী রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল। জিজ্ঞাসা করলে, ভয়ের কথা কেন?

—কারণ খবরের কাগজের মেরুদণ্ড এতে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুমি আশ্চর্য হবে শ্রী, ইংরেজের শাসন যখন রীতিমত মজবুত তখন অকথ্য উৎপীড়ন ক'রেও যে সংবাদপত্রের তেজস্বিতা এবং স্বাতন্ত্র্য তারা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি, আজ অপরাহ্ণ-বেলায় বিজ্ঞাপনের ঘুস দিয়ে তাই তারা করতে সক্ষম হয়েছে! আমার বিশ্বাস, আসছে বিপ্লবে আমাদের 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র মহল থেকে এতটুকু সাহায্যও আমরা পাব না।

শ্রী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের আন্দোলন কি তাহ'লে ব্যর্থ হবে?

এবারে ভুজঙ্গ হেসে ফেললে। বললে, তা কি হতে পারে শ্রী! এ হ'ল আমাদের ধর্ম, বইছে আমাদের রক্তে। কার সাধ্য একে বাধা করে!

একটু থেমে ভুজঙ্গ আবার বললে, স্বাধীনতা আমরা কিনতে চাই। রক্তের মূল্যে এই স্বাধীনতা আমরা কিনবই। এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু

কি যেন একটা কথা ভাববার জন্যে ভুজঙ্গ থামলো। নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দুই চোখ মেলে শ্রী চেয়ে রইল তার দিকে।

ভুজঙ্গ বলতে লাগলো:

—চেয়ে দেখছ না শ্রী, এই যুদ্ধ কী প্রচণ্ড বেগে জাতটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে অধঃপতনের গহ্বরে? ভায়ের মৃতদেহের ওপর দিয়ে সমস্ত লোক ছুটে চলেছে পয়সার লোভে, উন্মাদের মতো। দুটো পয়সার লোভে আজ এরা না করতে পারে এমন কাজ তো দেখিনে। দুঃশাসনের মতো এরা আজ নিজেরই কুললক্ষ্মীর বস্ত্র-হরণে মেতেছে। কে ভ্রুক্ষেপ করে দেশের ছেলেমেয়েরা কাঁকর আর সোপস্টোন খেয়ে নির্বীর্য হয়ে যাচ্ছে কি না। হাজার হাজার তরুণের

রক্তে যদি আজ স্বাধীনতা আসেও, সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করবার মতো বলিষ্ঠ বাহু কোথায়? ভাবছি সেই কথা শ্রী, আজ থেকে পাঁচ-দশ-পনেরো বৎসরের পরের কথা।

শুনতে শুনতে শ্রীরও মন দমে যাচ্ছিল। ভুজঙ্গের রাজনৈতিক বুদ্ধির উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। দীর্ঘকালের পরিচয়ে সে দেখে এসেছে, যেমন আশ্চর্য এই লোকটির কর্মশক্তি, তেমনি আশ্চর্য এর প্রতিভা। এই দুই বস্তুর দুর্লভ সমন্বয় এর মধ্যে ঘটেছে।

তবু সান্ত্বনার সুরে শ্রী বললে, ও সব ঠিক হয়ে যাবে ভুজঙ্গবাবু। স্বাধীনতার সূর্য উঠলেই এই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে দেখবেন। সেই পরশ-পাথরের স্পর্শে এক মুহূর্তে জাতির নৈতিক চরিত্র বদলে যাবে।

ভুজঙ্গ খুব উৎসাহিত হ'ল ব'লে মনে হোল না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, প্রার্থনা করি, তোমার কথাই সত্য হোক। এত লোকের রক্তদান এবং দুঃখবরণ যেন সার্থক হয়। কিন্তু আজকে আমি উঠি শ্রী। আমার আবার চাকরী আছে।

শ্রী ব্যস্ত হয়ে বললে, সে কি! এরই মধ্যে উঠবেন কি? চা খাবেন না?

—চা?

চায়ের নামে ভুজঙ্গ আবার বসলো। শ্রী চাকরটাকে চায়ের জল চড়াতে ব'লে আবার ফিরে এলো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, শুভেন্দুবাবুকে দেখছি না শ্রী?

—তিনি পড়ার ঘরে মহারাজ প্রিয়দর্শীকে নিয়ে পড়েছেন।

—তিনি দিন রাত্রি পড়েন বোধ হয়, না?

শ্রী হেসে বললে, ইচ্ছাটা তাই। কিন্তু আমার জন্যে ততটা পেরে ওঠেন না।

ওর কণ্ঠস্বরের পরিহাস-তরলতা একটা দীর্ঘশ্বাসে উড়িয়ে দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, আমি যদি ওই রকম পড়বার সময় পেতাম! মিথ্যে রাজনীতির ঘোলা জলে নামলাম!

—হিংসে করবেন না। ওঁর অবস্থাটা শুনুন তাহ'লে। যে ঘরে পড়েন সেখানে একটা পাখা নেই। এই দুরন্ত গরমে সর্বাঙ্গে অজস্র ধারায় ঘাম ঝরছে। তারই মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন একাগ্র মনে।

—পাখা একটা দাওনি কেন ?

—পয়সা কোথায় ? বললেন,—সেন সাহেবের মেয়েকে পড়ালে পাখার খরচটা উঠতো। কিন্তু তাতেও উনি জবাব দিয়ে এসেছেন !

—কেন ?

—একটু আরামের জন্যে উনি পড়ার সময়টা কমাতে রাজি নন। শুনলেন কথা ? অধ্যয়ন ওঁর কাছে নাকি তপস্যা। সেকালে যে সব মুনি-ঋষিরা প্রখর গ্রীষ্মে চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জেলে তপস্যা করতেন, উনি তাঁদেরই শিষ্য।

ভুজঙ্গের চোখ দুটো হঠাৎ যেন দপ্‌ ক'রে জলে উঠলো : বলো কি ?

—বিশ্বাস না হয় দেখবেন চলুন।

চার

শুভেন্দুর পড়ার ঘরে ঢুকে ভুজঙ্গ বললে, শ্রীর কাছে শুনে আপনার তপস্যা দেখতে এলাম শুভেন্দুবাবু।

হাতের কলমটা রেখে শুভেন্দু বললে, বেশ করেছেন। কিন্তু আপনাকে বসাই কোথায় ?

—তার কিছু দরকার হবে না শুভেন্দুবাবু। কারণ এঘরে আপনি ছাড়া কারও সাধ্য নেই দু'মিনিট বসে।

ম্লানমুখে শুভেন্দু বললে, আমারও কষ্ট হয়। কিন্তু কী করি বলুন।

ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে ভুজঙ্গ বললে, সিভিল সাপ্লাইএ চাকরী নিন।

—সেটা কি ?

—সেটা অন্নবস্ত্র সমাধানের কারখানা। এই যুদ্ধে খোলা হয়েছে। কি, ও জানালাটা বন্ধ রেখেছেন কেন ?

বিব্রত ভাবে শুভেন্দু বললে, এই দেখুন! ওই জানালাটা নিয়ে কি করি বলুন তো ? ওটা খোলা রাখলে গরম হাওয়া আসছে, বন্ধ করলে গুমোট।

—হুঁ। আমার কি মনে হয় জানেন ?

—কি ?

—আমাদের এই দেশটা গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলায় কাজ করবার জন্যে নয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, সন্ধ্যের পরে যখন ঝিরঝিরে হাওয়া দেবে, তখন খোলা ছাদে ব'সে যত ইচ্ছা, গবেষণা করুন, কিন্তু দুপুর বেলায় নয়।

শ্রী এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, ছাদ কোথায় পাব ভুজঙ্গবাবু। ফ্ল্যাট বাড়ি, এর যে ছাদ সে সকলের জন্যে। সেখানে নিরিবিলি গবেষণা করা যায় না।

কথাটা ভুজঙ্গের খেয়াল হয়নি। বললে, তাও বটে। তাহলে আর উপায় কি? আচ্ছা আমি আজ আসি শুভেন্দুবাবু। নমস্কার।

ভুজঙ্গ চলে যেতে শ্রী বললে, আমি বরং তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করি।

শুভেন্দু পাখাসমেত ওর হাতখানা ধ'রে ফেলে বললে, পাগল নাকি! আমার কাজটা হয়েই গেছে প্রায়। চলো, ওঘরে গিয়ে একটু গল্প করা যাক।

সে রাত্রে শ্রী চোখের পাতা বন্ধ করতে পারলে না।

শিশুর মতো অসহায় এই লোকটিকে কার জিম্মায় রেখে সে জেলে যাবে? এর ক্ষুৎ-পিপাসা বোধ নেই, সময়েরও জ্ঞান নেই। দিলে খাবে, না দিলে চাইবে না। কে একে দেখবে? কেই বা একে সময়ে নাওয়াবে-খাওয়াবে?

শ্রী বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো।

জীবনটা যেন কী! এর উপরে যেন কারও হাত নেই। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন নিজের খেয়ালে একে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে,— কেউ জানে না কোথায়। পিছনের দিকে চেয়ে শ্রী অবাক হয়ে যায়: কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে কোথায় এল, আরও কোথায় যাবে কে বলতে পারে?

যে গৃহ, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সে জন্ম নিয়েছে এবং জীবনের কুড়িটা বছর কাটিয়েছে, সে পরিবেশ আজ কোথায় পড়ে রয়েছে? এই দারিদ্র্য এবং অসচ্ছলতার সঙ্গে সেই প্রাচুর্য ও বিলাসের মিল কোথায়? সেখানকার চিন্তাধারাও এখানকার থেকে কত পৃথক! কে ভাবতে পেরেছিল সেই স্বর্গলোক থেকে এই কঠিন মৃত্তিকায় সে কোনোদিন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে নির্বাসিত হয়ে আসবে? অথচ তাই-ত এল!

কেন? কিসের লোভে?

কিছুরই লোভে নয়। সে নিজে জানে, নিছক খেয়ালে। যে মানুষটিকে অল্পকালের জন্যে ছেড়ে যেতে আজ তার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে, সেদিন একেও সে ভালোবাসেনি। এরও গৃহে সেদিন সে ভালোবাসার টানেই আসেনি।

বরং সেদিন সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত, সে ভুজঙ্গকেই ভালোবাসে। ভুজঙ্গ তার গুরু, তার আদর্শ, তার বন্ধু। সেদিন সে তো মনে মনে স্থিরই করেছিল ভুজঙ্গকেই দেবে বরমাল্য। অথচ সময় যখন এল, ভুজঙ্গ রইলো এক পাশে পড়ে বন্ধু হয়ে, গুরু হয়ে, হয়তো আদর্শ হয়েও। কিন্তু স্বামী হয়ে এল প্রায়-অপরিচিত অন্য একজন, যার সঙ্গে তার জীবনের পথের মিলও বেশি নয়। এবং তারই বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আজ রাত্রে তার চোখে ঘুম নেই!

এত বড় বিস্ময়, কিন্তু কত সহজে ঘটছে! কত সহজে!

পাশে অকাতরে ঘুমুচ্ছে শুভেন্দু। তার মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কী সুন্দর মুখ!

শ্রীর মনে হোল, বাইরের রূপটাই মানুষের চরম রূপ নয়। তার অন্তরের একটা রূপ আছে। সেই হচ্ছে সত্যকারের রূপ। ক্যামেরার লেন্সে তা ধরা পড়ে না, পড়ে শিল্পীর তুলিতে। শ্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে, যে-বয়সে বাইরের রূপটাই চোখে পড়ে বেশি, সেই বয়সেও শুভেন্দুর প্রকৃত রূপটি তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। খেয়ালের মুঠোয় জীবনকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছেই বলতে হবে। কত জায়গায় কত ভুল, কত ত্রুটিই না ঘটেছে! কিন্তু অন্তত জীবনের এই শ্রেষ্ঠতম নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার ভুল হয়নি, এ বিষয়ে আজকে আর তার মনে অনিশ্চয়তা নেই।

শুভেন্দুর প্রশান্তি-সুন্দর মুখের দিকে পরম স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কতক্ষণ অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে তার মন করুণায় ভরে উঠলো। তাকে নিয়ে কত বড় স্নেহে কত বড় দুঃখ নিয়ত সে সহ্য করছে। তার ইচ্ছার উপর একটি দিনের জন্যেও নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করেনি। একটি দিনের জন্যেও বলেনি, শ্রী, এ আমি ভালোবাসি না, এতে আমার কষ্ট হয়, এ কাজ কোরো না।

শ্রীর মনে হোল আজ রাত্রে শুভেন্দু যদি একবার বলে তাহলে সে সব করতে পারে, সব করতে পারে। আজ শুভেন্দুকে শ্রীর অদেয় কিছু নেই।

কিন্তু বলবে কি শুভেন্দু ?

শ্রী জানে শুভেন্দু কিছু বলবে না। পাথরের মতো নীরব থাকবে। বাইরে থেকে যাকে নিতান্ত দুর্বল এবং অসহায় বোধ হয়, ভিতরে ভিতরে সেই লোকটি যে কতখানি শক্ত, তা শ্রীর জানতে বাকি নেই। সেইখানেই তার ভয়।

ওই তো চাকর, এবং এই তো কলকাতা শহরের অবস্থা। যে-কোনোদিন বাড়ির অর্ধেক জিনিষপত্র নিয়ে ও পলায়ন করতে পারে। সেদিন রান্নার লোকের অভাবে শুভেন্দু যদি দিনের পর দিন উপবাসীও থাকে, তবু বোনের কাছে যাবে না, কাউকে বলবে না তার খাওয়া হচ্ছে না।

এমনি শক্ত মানুষ শুভেন্দু।

এ সব কথা শ্রী যতই ভাবে, ততই তার বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। ভেবে পায় না, একে চাকরের অনিশ্চিত করুণার উপর রেখে সে যাবে কি করে? অথচ এখন আর ফেরবারও তার পথ নেই, একেবারেই পথ নেই।

শুভেন্দু হঠাৎ চোখ মেলে চাইলে। শ্রীর চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে, ঘুমোওনি এখনও ?

খোলা জানালা দিয়ে অনেকখানি চাঁদের আলো খাটের উপর এসে পড়েছে।

শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে শ্রী বললে, ঘুম আসছে না কিছুতে।

একটা হাত বাড়িয়ে শুভেন্দু ওকে নিজের কাছে টেনে আনলে এবং তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, যা অনিবার্য, যা অবশ্যম্ভাবী তার সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলতে হয়। তাতে মনে শান্তি আসে। ঘুমোও।

শুভেন্দু ধীরে ধীরে ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল।

সকালে শ্রী যখন উঠলো তখন আর ওর মনে দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র নেই। সারারাত্রি ঝড় বৃষ্টির পরে প্রভাতের মেঘমুক্ত আকাশে যে শান্ত বৈরাগ্য ফুটে ওঠে, ওর মনের সেই বৈরাগ্য প্রতিফলিত হয়েছে ওর মুখে। সে একটা অপূর্ব দৃশ্য।

সকালে চায়ের টেবিলে শুভেন্দুর সঙ্গে অনেক আজে-বাজে হাস্যপরিহাস করলে। তারপর চাকরটাকে ডেকে বললে, তুই শুধু ডাল-ভাত নামিয়ে রাখবি। আর সব আমি রাঁধব। কী রান্নাই রাঁধছ বাবা! মুখ গেল!

বলেই স্নানের জন্যে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখে ভুজঙ্গ বসে আছে। এ সময়ে সে বড় একটা আসে না।

শ্রী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু খবর আছে নাকি ভুজঙ্গবাবু?

—আছে।

একপাশে একটি বেতের মোড়ার উপর বসে শ্রী বললে, কী খবর? 'বন্দরের কাল হ'ল শেষ'? তা আমি তো প্রস্তুত।

—তা জানি। কিন্তু খবরটা তারও চেয়ে একটু বেশি। তোমার জেলে যাওয়া হবে না।

শ্রীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠলো একটা দুর্বোধ্য অনুভূতিতে। শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করলে, কেন?

ভুজঙ্গ ধীরে ধীরে বলতে লাগলো:

—এবারে আমরা মাতবো ধ্বংসের নেশায়। আগের আগের বারের মতো শান্তভাবে যদি জেলে যাই, কে করবে ধ্বংসের খেলা? সুতরাং বাইরে আমাদের থাকতেই হবে।

—কিন্তু পুলিশ থাকতে দেবে কেন?

—দেবেই না তো।

—তাহলে?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, পুলিশ এসে আমাদের গ্রেপ্তার করবার আগেই আমাদের সরতে হবে।

—কোথায়?

—মাটির নিচে।

গা-ঢাকা দিয়ে এর আগে শ্রী কখনও থাকেনি। কংগ্রেসের কাজে তার আবশ্যকও হয়নি। শ্রী বিষয়টি মনে মনে অনুধাবন করতে লাগলো।

জিজ্ঞাসা করলে, এই কি গান্ধীজির আদেশ ?

—তা তো বলতে পারব না শ্রী। তিনি আমাদের অনেক উঁচুতে। কিন্তু যিনি ঠিক আমাদের উপরে এ আদেশ তাঁর। এক একটি অঞ্চল ভাগ ক'রে এক একজনের উপর তিনি ভার দিয়েছেন। এমনি একটা অঞ্চলের ভার পড়েছে তোমার এবং আমার উপর। তার ছকও তিনি তৈরি ক'রে রেখেছেন।

-কোন অঞ্চলের ভার আমাদের উপর পড়েছে ?

—আজ সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে এবং আমাকে গিয়ে সেই কথাটি জেনে আসতে হবে।

গুপ্ত আন্দোলনের একটা মাদকতা আছে। কিছু দুঃসাহস, কিছু ভয়, কিছু অনিশ্চয়তা, কিছু সর্বনাশের নেশা,—সমস্ত মিলে একটা রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়।

ভুজঙ্গ যখন চলে গেল, শ্রী আচ্ছন্নের মতো সেইখানে বসে রইল। চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করলে, ভাত-ডাল হয়ে গেছে মা, এইবারে।

ক্লান্তভাবে শ্রী বললে, তুইই যা পারিস রাঁধ বাবা, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

পাঁচ

ওয়েলেস্‌লী অঞ্চলের জঘন্য নোংরা সরু একটি গলির মধ্যে হ'লেও বাড়িখানি নিতান্ত মন্দ নয়। মাঝের হলঘরখানি হয়তো একটু অন্ধকার, কিন্তু পাশের ঘরগুলি বেশ বড় বড় এবং আলোবাতাসযুক্ত। সাম্‌নে-পিছনে খানিকটা খোলা জায়গাও আছে। বাড়ির আদি মালিক,—সম্ভবতঃ কোনো ইংরেজ, সেখানে যে বাগান করেছিলেন, তাও বোঝা যায়। বহুকাল সংস্কারের অভাবে এবং অব্যবহারে এখন তা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়িখানিও বেশ জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তা বাইরের দিকটা। ভিতরটা, বিশেষ উপরের ঘরগুলি, সম্পূর্ণ বাসযোগ্য।

ফলে মোদাব্বেরের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তার উপর ভাড়া খুবই কম। সুতরাং যেটুকু অসুবিধা হয়, ভাড়ার স্বল্পতায় তা ভালোরকমই পুষিয়ে যায়। যাচ্ছিলও তাই। এমন সময় বাধলো বিভ্রাট। এলো জাপানী বোমার আতঙ্ক।

সিঙ্গাপুর জাপানীরা দখল ক'রে ফেলেছে এবং রেঙ্গুনে ফেলছে বোমা — রেঙ্গুনও যায়-যায়। বিমানে রেঙ্গুন থেকে ক'লকাতা আর কতই দূর। ফেললেই হোল সেখানেও গোটা কয়েক বোমার লাড্ডু।

ক'লকাতার নাগরিক যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো। ট্রামে-বাসে চায়ের দোকানে, আফিসে-মেসে নিত্য অদ্ভুত-অদ্ভুত লোমহর্ষক গুজব ওঠে। মাথার উপর বিদেশী সরকার। তাদের বিশ্বাস নেই। লোকে অস্থির হয়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে লোকে ক'লকাতা ছাড়তে আরম্ভ করলো। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজপথে অবিরাম স্রোতে চলতে লাগলো নারী ও শিশু বোঝাই

নানাবিধ যান,—রিক্সা, মোটর, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী,—ষ্টেশনের দিকে। দুই ফুটপাথে অসম্ভব জনতার স্রোত,—সঙ্গে ছেলেমেয়ে, মাথায় বিবিধ আকারের মোট, চলেছে ষ্টেশনে। হাওড়া-শেয়ালদায় নয়, সেখানে ওঠবার সঙ্গতি এদের নেই। এরা চলেছে হেঁটে, অনেক দূরের কোনো ষ্টেশনে, যেখানে কড়া মিলিটারী পাহারা নেই, তাড়া-তাড়া নোটের ঘুষের আদান-প্রদান নেই,—যেখানে দেহের শক্তি এবং যাত্রীদের করুণার উপর নির্ভর ক'রে হয়তো ট্রেনে চড়া সম্ভব হবে।

এমনি আতঙ্কে ক'লকাতা শহর যখন থমথম করছে, অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রির অস্বাভাবিকতায় যখন ঘরের মধ্যেও বুকের স্পন্দন ভারি হয়ে উঠছে, তখন মোদাব্বেরেরও তা অসহ্য হয়ে উঠলো এবং একদিন তাকে পরিবারবর্গ দেশে রেখে আসতে হোল।

তারপরে এই ভুতুড়ে বাড়ির মতো বাড়িতে কি ক'রে দিনরাত্রি কাটাবে, এই চিন্তায় যখন সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন ভুজঙ্গ তার বাড়িখানি চাইলে।

মোদাব্বের ভুজঙ্গের শুধু সহপাঠী নয়, পাশের গ্রামের লোক। সেই সূত্রে এ বাড়িতে কয়েকবার ভুজঙ্গ এসেছে। এও সে জানে যে, মোদাব্বেরের পরিবারবর্গ এখানে নেই।

বিস্মিতভাবে মোদাব্বের বললে, এপাড়ায় এই জীর্ণ বাড়ি নিয়ে তুমি করবে কী?

ভুজঙ্গ কিছুই গোপন করলে না। মোদাব্বের কংগ্রেসের লোক নয়, বরং একটু লীগ-ঘেঁষাই। তবু সে বন্ধু, তাকে বিশ্বাস করা চলে। বিশেষ, ইংরেজের সঙ্গে যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে কংগ্রেসের উপর সহানুভূতির অভাব ঘটবার কোনো কারণ নেই।

মোদাব্বের বললে, ভাইরে, ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে একা এত বড় বাড়িতে থাকতে আমার গা ছমছম্ করে। ঘুম হয় না। এই ক'দিনই বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুর্বল বোধ করছি। তোমরা এলে তো বাঁচি। কিন্তু এই মুসলমান এবং ফিরিঙ্গি পাড়ায় পাঁচজনে সন্দেহ করবে না কি?

ভুজঙ্গ বললে, সন্দেহ যাতে না করে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। সেও ভেবে রেখেছি। আমার সঙ্গে একটি মেয়েও আসবেন।

—মেয়ে!—মোদাব্বেরের চোখ কপালে উঠলো,—বলে কি হে!

—হ্যাঁ, মেয়ে। বোরখা ঢেকে তিনি আসবেন। তোমাকে জানাতে হবে, দেশে থাকার অসুবিধা দেখে তোমার স্ত্রী ফিরে এলেন।

বিস্ময়ে মোদাব্বের শুধু নির্বাক হয়ে শুনে যেতে লাগলো।

শেষটায় ভুজঙ্গ বললে, আর আমার জন্যে ভেবো না। আচকুন-পায়জামার এমন পোষাক আমি করব যে, তুমিই ধরতে পারবে না, আমি মুসলমান নই, হিন্দু।

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কাটলে মোদাব্বের জিজ্ঞাসা করলে, সবতো বুঝলাম, কিন্তু এবাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি আবার গিয়ে উঠবো কোথায়?

ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে বললে, তোমার স্ত্রী এলেন দেশ থেকে ফিরে। তাঁকে এবাড়িতে একলা ফেলে রেখে তুমি চ'লে যাবে কি রকম?

মোদাব্বের বললে, কিন্তু সেই মহিলাটির অসুবিধা হবে যে!

—কিছু অসুবিধা হবে না।

—কিন্তু তোমরা এখানে থেকে করবে কী?

ভুজঙ্গ বললে, সেইটি তুমি কোনোদিন জানতে চাইবে না। ব্যস্। তাহ'লে এই কথা রইলো।

সেই কথাই রইলো। দু'তিন দিনের মধ্যে ভুজঙ্গ শ্রীকে নিয়ে এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হোল, একটা ঘোড়ার গাড়িতে। কিছুদিন আগে যারা মোদাব্বেরের স্ত্রীকে চ'লে যেতে দেখেছে, তারা এই বিপদের সময় আবার তাকে ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হোল।

মোদাব্বের কপালে হাত ঠেকিয়ে সখেদে জানালে, মেয়েমানুষের কাণ্ডই আলাদা। কী আর করা যায়!

—বাঁদী পাবে কোথায়? কলকাতায় বাঁদী-চাকর বলতে কেউ নেই।

নিস্পৃহভাবে মোদাব্বের বললে, দেখে নিকগে ভাই। নিজের ইচ্ছায় এসেছে, নিজেই বুঝবে।

সে তো বটেই। এরকম খামখেয়ালী স্ত্রীলোকের কষ্ট পাওয়াই উচিত।

মোদাব্বের ভেবেছিল, এরা আসাতে শুধু যে সে এই শূন্য বাড়িতে একা থাকার বিভীষিকা থেকেই মুক্তি পাবে তা নয়, অনভ্যস্ত হাতে রাঁধাবাড়ার দায় থেকেও অব্যাহতি পাবে। কিন্তু বিধাতা যার অদৃষ্টে সুখ লেখেননি, তাকে কে বাঁচাতে পারে?

শ্রীর সঙ্গে মোদাব্বেরের আসামাত্রই পরিচয় হয়েছে। বেশ লেগেছে তার শ্রীকে। মাঝে মাঝে ওদের সন্ধ্যার আসর সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে বেশ জমে ওঠে।

কিন্তু সে নিতান্তই মাঝে মাঝে।

বোরখা ঢাকা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে প্রত্যেক সকালেই শ্রী কোথায় বেরিয়ে যায়, ফেরে একটা দুটোর সময়। আবার বিকেলে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যার অনেক পরে।

কোথায় যে যায় মোদব্বের জানে না, ভদ্রতাবশতঃ জিজ্ঞাসাও করতে পারে না। কিন্তু পাড়ার কৌতূহলী লোকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় একান্ত ক'রে তারই। বুদ্ধি ক'রে একটা কৈফিয়ৎও সে বানিয়ে নিয়েছে। বলে: বিপদ আর কাকে বলে মশাই! একে তো বোমার ভয়েই অস্থির আছি, তার ওপর অসুখ।

—অসুখ আবার কার?

—শ্বশুরের। তিনি জামাই বাড়ি আসবেন না। কাজে কাজেই ওঁকেই ছুটতে হয় সকালে বিকেলে। ওষুধ খাওয়ানো, পথ্যি দেওয়া, গা স্পঞ্জ করা, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া,—সবই তো আছে।

তাতো বটেই। বাপের অসুখে মেয়ে কি স্থির থাকতে পারে?

তবু ভুজঙ্গ এবং শ্রীর জন্যে ওর দুশ্চিন্তাও কম হয় না। অগষ্ট বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। ছেলেরা ট্রাম পোড়াচ্ছে, ট্রামের তার কেটে দিচ্ছে, ডাকবাক্সে দিচ্ছে আগুন। বাইরে কোথাও রেলের লাইন উঠিয়ে দিয়েছে।

স্থানে স্থানে ট্রেন চলাচল বন্ধ। ইংরেজ সৈন্যেরা যেন পাগল হয়ে গেছে। তারা ট্রাকে চ'ড়ে শহরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে-সেখানে মারছে, গুলি করছে। তার উপর আছে পুলিশ। দেশি পুলিশের উপর গবর্ণমেণ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। তারা যেখানে-সেখানে বেপরোয়া গুলি চালাতে অথবা ছেলেদেব উপর অত্যাচার করতে অসম্মতি জানাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কিছু করছেওনা। কিন্তু ফিরিঙ্গি পুলিশ এবং গোরা সৈন্যেরা যে উন্মাদ কাণ্ড করছে, তাতে বড় রাস্তা কারও পক্ষে নিরাপদ নয়, মেয়েদের পক্ষে তো নয়ই।

সন্ধ্যার পরে সেই অনুযোগ একদিন সে কুণ্ঠিতভাবে জানালে।

ভুজঙ্গ এবং শ্রী তো হেসেই অস্থির। বললে, এপাড়ায় আবার গোলযোগ কোথায় ?

—এপাড়ায় হয়তো নেই। কিন্তু আপনারা তো আর এপাড়ায় থাকেন না। দু'পা গেলেই তো গোলযোগ সুরু।

—তা ঠিক। তবে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে গেলে কেউ কিছু বলে না।

মাথা নেড়ে মোদাব্বের বললে, ও কথা আর বোলো না ভুজঙ্গ। নিজের চোখে দেখা ঘটনা : দূরে একটা মিলিটারী গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি যেন একটা ঘটলোও, রব উঠলো পালাও, পালাও, কি করব ভাবছি, কানে এলো গুলির আওয়াজ, চক্ষের পলকে ও-ফুটপাথে একটা ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং একবার একটা অস্ফুট আওয়াজ ক'রেই স্থির হয়ে গেল। আমরা সামনের একটা দোকানে উঠে পড়েছিলাম। মিলিটারী ট্রাকটা বেরিয়ে গেলে ছেলেটার কাছে গিয়ে দেখলাম, সব শেষ। জায়গাটা রক্তে ভাসছে! হাতে ওর কাপড়ের একটা প্যাকেট! শুনলাম নাকি বোনের বিয়ের বাজার করতে বেরিয়েছিল।

শুনতে শুনতে শ্রীর চোখে ধ্বক্ ক'রে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এ অবস্থায় আমাদের তাহ'লে কর্তব্য কী, মোদাব্বের সাহেব? বাপ-পিতামহের দেশ ছেড়ে তো যেতে পারি না,—

যাবই বা কোন্ চুলোয় বলুন। এই চল্লিশ কোটি লোককে আশ্রয় দেবার জন্যে কোন্ দেশই বা কোল পেতে বসে রয়েছে!

মোদাব্বের বললে, ঠিক কথা। কিন্তু ওদের দিকটাও দেখুন। ওরাও কিছু এদেশে নেমন্তন্ন খেতে আসেনি। তলোয়ারের জোরে এদেশ ওরা জয় করেছে। আজকে ওদের Quit India বললেই ওরা আপ্যায়িত হয়ে বলবে না, তাই যাচ্ছি মশাই, জাহাজ ভাড়াটা দিয়ে দিন।

ওর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো।

শ্রী জবাব দিলে, ইচ্ছা যে ওদের নেই, তা তো দেখাই যাচ্ছে। তলোয়ারের জোরে যতদিন থাকতে পারা যায় ততদিন থাকবার চেষ্টা ওরা তো করবেই। কিন্তু এই যদি স্থির হয়ে থাকে মোদাব্বের সাহেব যে, এক পক্ষকে এদেশ ছেড়ে যেতেই হবে, তা'হলে কাদের যেতে হবে ব'লে আপনি মনে করেন? ওদেরই।

শেষের দিকে শ্রীর কণ্ঠে এমন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা ধ্বনিত হ'ল যে, মোদাব্বের চমকে ওর মুখের দিকে চাইলে।

সেদিন সকালে শ্রী আর বেরোয়নি, ভুজঙ্গ একাই বের হয়েছিল। দুপুরে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললে, খুব বেঁচে গেছ!

—কি রকম?

—আমরা তো সোমবারে গা-ঢাকা দিলাম, মঙ্গলবারেই তোমাদের বাড়ি সার্চ করা হয়। শুভেন্দুবাবুকে থানায় নিয়ে গিয়ে অনেক জিগ্যেসাবাদ ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়।

—ওঁর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। ভালোই আছেন। তোমার কথা জিগ্যেস করলেন। বললাম, তুমি দিব্যি আছ।

শ্রী হাসলে।

ভুজঙ্গ হাসতে হাসতে বললে, ভাগ্যিস তিনি ব'লে বসেননি, চলুন একবার দেখা ক'রে আসি।

—কী হোত তাহ'লে ?

—কী হোত ? সে আর তুমি কি বুঝবে ? আয়নায় মুখ তো দেখনি। অমন সুন্দর রং, এই ক'দিনেই তামাটে হয়ে গেছে। মাথার চুলে বোধ হয় তেল পড়েনি এসে পর্যন্তই। শুভেন্দুবাবুর জন্যে তোমার মন কেমন করছে তো ?

শ্রী হাসলে, বললে, আপনার কি মনে হয় ?

—মনে হয়, মন কেমন করছে।

শ্রী প্রতিবাদ করলে না। শুধু হাসলে। তার মনে পড়ছিল, চলে আসার সময়ের কথাটা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শ্রীর পা যেন আর চলে না। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলো। কি যেন সে বলতে গেল শুভেন্দুকে। সিঁড়ির মাথায় সোজা হয়ে নিঃশব্দে শুভেন্দু দাঁড়িয়ে। সারারাত্রি দুজনে শুধু কথা বলেই কাটিয়েছে ; তবু কী যেন বাকি ছিল বলতে। সেই কথাটি যে ঠিক কি, তা আজও শ্রী জানে না। সেই অনির্বচনীয় কথাটি সে বলতে যাবে, শুভেন্দু বাধা দিলে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আর একটি কথাও নয়। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। নিচে মোটরের মধ্যে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আর তুমি থামতে পাবে না শ্রী।

ধীরে ধীরে শ্রী নেমে চলে এল। মোটরের মধ্যে যাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা শ্রীর কেউ নয়। আশ্চর্য, যে লোকটি শ্রীর সব চেয়ে নিকট, যে একান্ত করে শ্রীরই, সেই লোকটির মধ্যে কোনোদিন কোনোকারণেই সে ব্যস্ততার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলো না। ওর কৃশ ভঙ্গুর দেহের মধ্যে অমন দুর্ভেদ্য মন কেমন করে যে রয়েছে !

ভুজঙ্গ স্নান সেরে এসে শ্রীকে ওই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছ ?

শ্রী প্রথমটা চুপ করে রইলো। তারপরে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর খাওয়া দাওয়া কোথায় হচ্ছে জানেন ?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, না। ওটা আমাদের পক্ষে এমনই তুচ্ছ ব্যাপার যে, জিগ্যেস করার কথা খেয়ালই ছিল না। এর পরে একদিন দেখা করে জেনে

নোব, উনি খাচ্ছেন কোথায়, ধোবাবাড়ির কাপড়-চোপড়ের হিসাব মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে কি না, ঘর-দোর নিয়মিত সম্মার্জিত হচ্ছে কি না,—আর কি জিগ্যেস করব ?

—কাছা কে দিয়ে দিচ্ছে ?

—সেও কি আরেকজনকে দিয়ে দিতে হয় নাকি ?

—হ্যাঁ। নইলে লোটাবে মাটিতে।

—সর্বনাশ কাণ্ড। এবকম লোককে তুমি ফেলে এলে কি ক'রে ?

শ্রী হেসে বললে, আপনার পাল্লায় পড়ে।

-ভালো কাজ হয়নি। আচ্ছা, আমি কালকেই খবর নোব। এখন চল দেখি, মোদাব্বেব কি রাঁধলে।

খেতে বসে চচ্চড়িটা মুখে দিয়েই ভুজঙ্গ বললে, এ তো তোমার শ্রীহস্তের রান্না ব'লে মনে হচ্ছে না, মোদাব্বেব।

মোদাব্বেব বললে, না ভাই, এ আসল শ্রী-হস্তের রান্না।

—হুঁ।

মিনিটখানেক ভুজঙ্গ নিঃশব্দে খেয়ে গেল। তারপরে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, চাল কিছু বেশি নিয়েছ তো শ্রী ?

শ্রী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, চাল !

—হ্যাঁ। মোদাব্বেবের রান্না খেয়ে-খেয়ে পেটটা যেন মরুভূমি হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, টানবে।

শ্রী বললে, তার অসুবিধা হবে না। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে টেনে যান। কিন্তু আপনি ভারি অকৃতজ্ঞ।

—কেন ?

—মোদাব্বের সাহেব রেঁধে দিচ্ছেন ব'লে দু'বেলা দুটো খেতে পাচ্ছেন। তাঁকেই হ্যানস্তা !

এ অপবাদ স্বীকার ক'রে নিয়ে ভুজঙ্গ বললে, ঠিক। মোদাব্বের, তুমি রাগ কোরো না। এই জন্যেই বোধ করি লোভকে পাপ বলেছে।

মোদাব্বের বললে, বলুক তাতে আর তোমার ভয়টা কি ? কিন্তু ভেবে

দেখ, রাজনীতির আয়োজনে এই অন্নপূর্ণাদের তোমরা নামিয়েছো ট্রামের তার-কাটার আর বম্ ফেলার কাজে।

—অন্যায় করেছি। সে আমরাও বুঝি। কিন্তু কী করব বলো? গরজ বড় বালাই। ভরসা শুধু এই যে, প্রয়োজনের একটা মেয়াদ থাকে। আমাদের রাজনীতিক প্রয়োজনও একদিন মিটবে। সেদিন চামুণ্ডারা আবার অন্নপূর্ণায় পরিণত হবেন।

মোদাব্বের বললে, যদি না হন। যে উদ্দাম জীবনে এঁরা অভ্যস্ত হচ্ছেন, তা ছাড়তে এঁরা যদি প্রস্তুত না হন।

ভুজঙ্গ বললে, তাতেই বা এমন কি লোকসান! তুমি চমৎকার বেগুনের কাবাব বানাবে, আমিও চাঁদপানা মুখ ক'রে খাব।

শুনে সবাই হেসে উঠলো।

ভুজঙ্গ বললে, কথাটা আমিও ভেবেছি মোদাব্বের। নতুনতর এবং উদ্দাম জীবনের একটা আকর্ষণ আছে। যে মেয়েরা দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে এই পথে নেমেছেন, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেও এঁদের অনেকেই এ-জীবন ছাড়তে পারবেন না, পারা সহজও নয়। কিন্তু এঁরাই তো স্ত্রীজাতির শেষ বংশ নন।

মোদাব্বের বললে, না। কিন্তু পরবর্তী বংশও তো দল বেঁধে হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে আসবেন না। তাঁরাও এই আবহাওয়াতেই মানুষ হবেন। সেক্ষেত্রে?

—সেক্ষেত্রে সমাজকে নতুনভাবে তারই উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। উপায় কি বলো? পুরুষের স্বৈরতন্ত্রের পরমায়ু শেষ হয়েছে। মেয়েরা স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে। অথচ জৈবপ্রয়োজনে উভয়ের একসঙ্গে ঘর বাঁধাও চাই-ই। সুতরাং নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠবে।

—কিন্তু সে কি সহজ হবে?

—না। একদিনেও হবে না, ধীরে ধীরে হবে। কিন্তু হবেই।

উষ্মার সঙ্গে মোদাব্বের বললে, সে তো সবাই জানে, যা-হোক-একটা কিছু হবেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ভালো হবে, কি মন্দ হবে?

—কিছু ভাল হবে, কিছু মন্দও হবে। এখনও তো তাই আছে মোদাব্বের, —কিছু ভালো, কিছু মন্দ।

—কিন্তু যে সমাজে নারী উচ্ছৃঙ্খল, সতীত্ব যেখানে কুসংস্কার, সে কি সত্যি ভালো মনে কর ?

মাথা নেড়ে ভুজঙ্গ বললে, আমার মনে-করা-না-করায় কিছুই এসে-যায় না মোদাব্বের। মানুষ তার নিজের প্রয়োজন এবং সুখ-সুবিধার দিকে চেয়ে ঘর তৈরি করে, ঘরের দিকে চেয়ে নিজেকে তৈরি করে না। নারীর সতীত্ব, তাদের পর্দানশীনতা যদি আগামী দিনের সমাজের কাজে না লাগে, যদি অসুবিধাজনক হয়, তাহ'লে তার নৈতিক মূল্য যত বেশিই হোক, তা থাকবে না। সে নিয়ে দুঃখ-দুশ্চিন্তা মিছে। কারণ সে-সমাজে তোমাকেও বাস করতে হবে না, আমাকেও বাস করতে হবে না।

—তাই ব'লে সে-সমাজের জন্যে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই ?

—হয়তো আছে। কারণ আমরা যে পথে চলেছি, তার একটা গতি আছে। সেই গতি আগামী সমাজকেও একটা আকৃতি দেবে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, আমরা যদি লোভে, স্বার্থে অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় মেয়েদের ঘরের বাইরে এনে থাকি, তাহ'লে আগামী সমাজ অবশ্যই আমাদের অভিশাপ দেবে। কিন্তু আদর্শ যদি আমাদের উঁচু হয়, মন এবং বুদ্ধি পরিষ্কার থাকে, তাহ'লে আমাদের চলার পথে ভুল-ভ্রান্তি যদি কিছু ঘটেই, আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে সেটুকু ক্ষমা করা তাদের পক্ষে নিশ্চয় কঠিন হবে না।

মোদাব্বের বললে, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তোমার মত কি ?

—অত্যন্ত উদার। কিন্তু একথা বলার বিপদ আছে।

স্ত্রী এতক্ষণ নিঃশব্দে ওদের তর্ক শুনছিলো। এবারে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, একথা বলার বিপদটা কি ?

—গুরুতর বিপদ। প্রথমতঃ আমার একটি স্ত্রীও নেই যাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে এই উদারতা সপ্রমাণ করতে পারি। সুতরাং তোমার স্বামী যদি এইখানে এসে ঠোঁট কুঁচকে বলেন, "পরের স্ত্রী নিয়ে এ ঔদার্য চমৎকার, তাহলে আমাকে মাথা নিচু করে থাকতেই হবে।

ভুজঙ্গ তার প্লেট হাতে করে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনও।

ঝি-চাকর নেই, এখন পাওয়াও যাবে না। সুতরাং ওরা খবরের কাগজ পেতে খায়। খাওয়া হয়ে গেলে নিজের নিজের প্লেট সাবান দিয়ে কলতলায় ধুয়ে নেয়, কাগজগুলো মেথরের ঝুড়িতে ফেলে দেয়। এছাড়া আব কিছু ওরা করেও না, পারেও না। শ্রী এতখানি ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। এবং যেদিন সে বেরোয় না, সেদিন কোমরে কাপড় জড়িয়ে সব ঘরগুলো ধুয়ে দেয়। তার ফলে বাড়িটা মোটামুটি পরিষ্কারই থাকে। সুবিধা এইটুকু যে, বাড়িতে ছেলেপুলে তো নেই। থাকলে এভাবে বাড়ি পরিষ্কার রাখা কঠিন হোত। কিন্তু সেকথা সে ভুজঙ্গ কিংবা মোদাব্বের কাউকে বোঝাতে পারে না।

প্লেট-হাতে ভুজঙ্গ শ্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তোমার সেই উপাদেয় বক্তৃতাটি কি আজও দেবে?

শ্রী হেসে বললে, না। উপাদেয় বস্তুর অপব্যয় আমি করি না।

—সাধু সাধু!

ছয়

দুপুরে শ্রী কোথাও বার হয়নি! বার হওয়া নিরাপদও নয়, বিশেষ আবশ্যকও ছিল না। ভুজঙ্গ কোথা থেকে ঘুরে এইমাত্র ফিরলো।

দিনটা কি-একটা ছুটির দিন। মোদাব্বের তার নিজের ঘরে একপ্রস্থ নিদ্রা দিয়ে আর একপ্রস্থ দেওয়া যায় কি না বিবেচনা করছিল। ভুজঙ্গের পায়ের শব্দ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভুজঙ্গ নাকি?

—হাঁ। তোমাদের চা কি হয়ে গেছে?

—ক'টা বাজে?

—পাঁচটার কাছাকাছি।

মোদাব্বের ধড়মড় ক'রে উঠে বললে, বলো কি হে? আমি ভাবছিলাম, আর একবার ঘুমোব কি না।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শ্রী বললে, চায়ের জল চড়িয়েছি, আসুন সবাই।

ঠিক এই সময়ে বড় রাস্তায় একটা কলরব উঠলো। মোদাব্বেরের শোবার ঘর থেকে অদূরে বড় রাস্তার একাংশ দেখা যায়।

মোদাব্বের ডাকলে, দেখে যান, দেখে যান, কী বিরাট একটা মিছিল!

মস্ত বড় মিছিলই বটে। দলের পর দল পতাকা হাতে চলেছে তো চলেইছে। ছেলে আছে, মেয়ে আছে, মিলের কুলীও আছে প্রচুর। স্লোগান উঠেছে:

জাপানকে
রুখতে হবে।
রুখতে গেলে
অস্ত্র চাই।
আমাদেরকে
অস্ত্র দাও।

মোদাব্বের সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের কংগ্রেসের মিছিল ব'লে তো মনে হচ্ছে না। কারা ওরা?

ভুজঙ্গ বললে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধপিয়াসী একদল ভারতবর্ষীয় নর-নারী।

—কি চাচ্ছে ওরা?

—জাপানকে রোখবার জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অস্ত্র চাচ্ছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এদের অস্ত্র দেবে। কি বলো?

বোধ হয় না।

—কেন? ইংরেজ যা চায়, এরাও তাই চায়। তবে দেবে না কেন?

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, সে কথা কোনো ইংরেজকেই জিগ্যেস কোরো বরং। তারাই ভালো জানে।

মোদাব্বের বললে, কিন্তু তুমি বুঝলে কি ক'রে যে বৃটিশ এদের অস্ত্র দেবে না?

ভুজঙ্গ তেমনিভাবে হেসে বললে, অত্যন্ত সহজে। এবং সেকথা ওরাও জানে। নইলে মিছিল বের ক'রে গলা ছেড়ে আকাশ বিদীর্ণ করতে হোত না।

শ্রী তার ঘর থেকে আবার ডাকলে, আসুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

ওরা শ্রীর ঘরে এলো।

মোদাব্বের বললে, অস্ত্র না দেওয়া অন্যায় হবে।

ভুজঙ্গ জবাব না দিয়ে পর-পর কয়েক চুমুক চা খেলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, অন্যায় হবে কেন?

মোদাব্বের বললে, অন্যায় হবে না? ওরা তো বৃটিশ পক্ষকেই যুদ্ধে সাহায্য করতে চায়।

—সেজন্যে অস্ত্রের কি প্রয়োজন? অস্ত্র হাতে পেলেই তো যুদ্ধ করা যায় না। যুদ্ধ শেখা চাই। সেজন্যে ওদের উচিত হাজারে-হাজারে ইংরেজ-সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দেওয়া। নয় কি

মোদাব্বের কথাটা বুঝলে, বললে, তাই'লে ওরা তাই করছে না কেন?

—সে ওরাই জানে। দেখ মোদাব্বের, 'চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধিত হয় না'—এটা রাজনীতিক্ষেত্রেও সত্যি। লেলিন চালাকি দিয়ে জেতেননি। তাঁর মূলধন ছিল মস্ত বড় সাধনা, এবং মস্ত বড় প্রস্তুতি। তাঁর উপলব্ধির মধ্যেও ফাঁকি ছিল না। এদের সঙ্গে ওঁদের এইখানেই তফাৎ।

মোদাব্বের নিঃশব্দে চা খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করলে, তোমরা কি জাপানের দিকে ভুজঙ্গ?

—আমরা আমাদের নিজেদের দিকে ছাড়া আর কারও দিকে নই। ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে আমরা স্বাধীন হ'তে চাই। তার জন্যে যেদিকে হ'লে সুবিধা হয়, সেই দিকে। জাপান অথবা জার্মানীর সঙ্গে আমাদের মিল এইখানে যে, আমরা সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রু।

মোদাব্বের আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি বিশ্বাস ইংরেজকে তাড়িয়ে সুশৃঙ্খলে এদেশ শাসন করতে পারো?

ভুজঙ্গ এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে, শ্রীর দিকে কটাক্ষে একবার চাইলে, তারপর বললে, সত্যি কথা বলব? আমার নিজের সন্দেহ আছে। কেন বলি: জনতার মন এখনও স্বাধীনতা গ্রহণ করবার জন্যে তৈরি হয়নি। এখনও সে

ছোট লোভ, ছোট স্বার্থকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। সে চায় বিনামূল্যের আরাম। স্বাধীনতার মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়।

মোদাব্বের বললে, আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

—স্পষ্ট করেই বলি : দেশে আজ অন্ন নেই, চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। সে কান্না ধনিকের কানে পৌঁছচ্ছে না। দুটো পয়সা লাভের লোভে তারা দেশের জনশক্তিকে পঙ্গু, এমন কি ধ্বংস করতেও পিছপা নয়। কোথায় চাল লুকিয়ে রাখা হয়েছে, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় তা জানেন। কিন্তু রূপো দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মুখ ঝালিয়ে সীল ক'রে দেওয়া হয়েছে। আর আমরা সাধারণ লোকেরা, যত দামই লাগুক, পেটের অন্ন যে কোন উপায়ে হোক যোগাড় করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করছি। তুমিই বলো, এ কি স্বাধীন জাতের লক্ষণ?

প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে মোদাব্বের জিজ্ঞাসা করলে, দেশ যদি সুশৃঙ্খলে শাসন করতে পারবে না-ই জেনে থাক, তাহ'লে কেনই বা 'ভারত ছাড়' স্লোগান তোলা, কেনই বা এ আন্দোলন?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে উত্তেজিতভাবে ভুজঙ্গ বললে, তার কারণ, তথাপি স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই। আমি জানি, বাক্যে, চিন্তায়, আচরণে স্বাধীন জাতি হ'তে আমাদের সময় নেবে, সুশৃঙ্খলে শাসন চালাতে এখনই আমরা পারব না, বহু ত্রুটি ঘটবে, অদৃষ্টে জমা হবে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ, তথাপি স্বাধীনতা আমাদের চাই,—এই জন্যে যে, ওই দুর্গতি এবং ওই দুর্দশার ওপারে রয়েছে অবারিত সমৃদ্ধি। তারই লোভে সমস্ত দুঃখ আমরা সইব।

মোদাব্বের বললে, কিন্তু আমাদের, মানে মুসলমানদের,

ভুজঙ্গ হাতজোড় ক'রে বললে, ওই প্রসঙ্গটি থাক মোদাব্বের। যে কারণে হোক, ওই সমস্যাটির মীমাংসা করবার মন আজ কারও নেই। আমি শুধু বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের ভাগ্যদেবতা যথাসময়ে তারও সুমীমাংসা ক'রে দেবেন। কিন্তু এখন আমি উঠব। ফিরতে একটু রাত হবে। নিতান্ত যদি রাত্রে না ফিরি চিন্তিত হয়ো না। ভোরের দিকে নিশ্চয়ই ফিরব।

ভুজঙ্গ চ'লে গেলে মোদাব্বের এবং শ্রী দুজনেই নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ব'সে রইল।

হঠাৎ মোদাব্বের উচ্ছ্বসিতভাবে ব'লে উঠলো : আশ্চর্য ছেলে এই ভুজঙ্গ !

শ্রী ওদের এতক্ষণের তর্কের মধ্যে একটা কথাও বলেনি, এখনও বললে না।

মোদাব্বের মনের ঝোঁকে বলতে লাগলো :

—ছেলেবেলা থেকেই ওকে জানি কি না। ক্লাসে ওর চেয়ে ভালো ছেলে কেউ ছিল না, অথচ কোনো পরীক্ষায় ও কখনও ফার্স্ট হয়নি। যে প্রক্রিয়ায় ফার্স্ট হয়, সে প্রক্রিয়া চিবকাল ও সযত্নে পরিহার ক'রে এসেছে। ও তপস্যা করেছে জ্ঞানের। ওব যে এই বলিষ্ঠ নির্ভীকতা, আমি জানি এরও বনেদ জ্ঞানেব উপর। সুতরাং পাকা বনেদ।

শ্রী নিঃশব্দে শুনছিল। এখন বললে, ওঁর জ্ঞানের খবর আমি অবশ্য রাখি না। কিন্তু সমস্ত কিছুকে অত্যন্ত সহজে বোঝবার এবং তাকে স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা ওঁর অসাধারণ। অন্যকে অসঙ্কোচে হুকুম করবার শক্তিও অসামান্য। আচ্ছা, ওঁরা কি জমিদাব ?

—কোনো কালে না।

—আশ্চর্য ! অথচ মাঝে মাঝে আমার মনে হযেছে, হুকুম কববাব শক্তি যেন রয়েছে ওঁর রক্তের মধ্যে, অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে।

একটু পরে মোদাব্বের বললে, যদি কিছু মনে না কবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—করুন।

—আমবা শুনেছিলাম, ভুজঙ্গেব সঙ্গে আপনার বিবাহ এক সময় প্রায় স্থির হয়েছিল।

—কার কাছে শুনেছিলেন ? ভুজঙ্গবাবুব কাছে কি ? — তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শ্রী জিজ্ঞাসা করলে।

থতমত খেয়ে মোদাব্বের বললে, ঠিক তার কাছে নয়। তবে মনে হচ্ছে, এ প্রসঙ্গ তার সামনেও একবার উঠেছিল, কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করেনি।

—হয় তো তার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে কোনদিন কারও কাছে কিছু শুনেছি ব'লে মনে পড়ছে না। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

ব'লেই শ্রী উপহাসভরে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

একটু চুপ ক'রে মোদাব্বের বললে, হঠাৎ একথা কেন মনে এলো বলি : এই ক'দিন ধ'রে আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখছি তো। মনে হচ্ছে, আপনাদের জীবনের ধারা যেন এক হয়ে মিশে গেছে : এক লক্ষ্য, এক সাধনা, এক গতি। বিবাহের এর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা আমি কল্পনা করতে পারি না।

—অর্থাৎ ফুটবল খেলোয়াড়ের স্ত্রী ফুটবল-খেলোয়াড় না হ'লে মিলন পরিপূর্ণ হয় না, কি বলেন ?

—তা নয়। কিন্তু ধরুন সাহিত্যিকের স্ত্রী সাহিত্যিক, কিংবা গায়কের স্ত্রী গায়িকা।

—ঠিক। কিন্তু ব্রাউনিং-দম্পতি, কিংবা কুরী-দম্পতি ছাড়া এ রকম পরিপূর্ণ মিলন ক'টা দেখেছেন ? মোদাব্বের সাহেব, আমার কাছে বিবাহ একটা বড় রকমের আপোষ। রাজনীতিতে সেই আপোষের ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ। আমার তাই মনে হয়, স্বামী স্ত্রী দুই-ই রাজনীতিক হ'লে বিবাহ খুব সুখের হয় না।

– সেই ভেবেই কি আপনি ভুজঙ্গকে বিয়ে করলেন না ?

এবার শ্রী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, কে যে কাকে কেন বিয়ে করে, কেউ বলতে পারে ?

—কেন পারে না ?

—কারণ নিজের মনই নিজের সবচেয়ে অপরিচিত বস্তু। চেষ্টা করলে মনকে জয় হয় তো করা যায়, কিন্তু জানা যায় না।

—তাহ'লে বিয়ের আগে মন জানা-জানি হয় কি করে ?

—হয় না। শুধু মনে হয়, মন জানা-জানি হয়েছে। নইলে বিয়ের পর অত ডাইভোর্স হয় কি করে বলুন।

মোদাব্বের এর উত্তর দিতে পারলে না।

শ্রী বললে, আমার বিয়ে একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার মোদাব্বের সাহেব। বিয়ের আগে আমার স্বামীকে যে খুব ভালো ক'রে জানতাম তাও নয়। শুধু

জানতাম, তিনি শিক্ষিত এবং ভদ্র। স্থিরও করে ফেললাম হঠাৎ। এমন হঠাৎ যে আমার স্বামী পর্যন্ত অবাক হয়ে যান।

মোদাব্বের বললে, এত তাড়াতাড়ি কিছু করা কি ঠিক?

—কি জানি। আমার ভয় হয়েছিল, আরও বেশি ভাবলে পাছে আরও বেশি ভুল করি।

—কিন্তু খোদা মানুষকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন,

বাধা দিয়ে শ্রী বললে, সত্যি। কিন্তু তার একটা সীমা বেঁধে দেননি, সেইটে তাঁর ভুল হয়েছে। যদি জানতাম, একমাস ভাবলে যতদূর ঠিক হয়, দু'মাস ভাবলে তার দ্বিগুণ, তিন মাসে তিনগুণ, তাহ'লে বিধাতার এই দানের একটা মানে পাওয়া যেত। তা তো নয়। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, চোখ-কান-নাক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভগবান সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, শুধু মনেরই দেননি। আর তাই নিয়েই যত ঝামেলা।

—তার মানে?

—তার মানে, দূরে এবং কাছে যত লোক এই মুহূর্তে আপনার সম্বন্ধে আলোচনা করছে সব যদি আপনি শুনতে পেতেন, তাহ'লে কি পাগল হয়ে যেতেন না! চোখ মেলে চাইলেই সমস্ত যদি দেখা যেত, তাহ'লে দিবারাত্রি গান্ধারীর মতো চোখ বেঁধে রাখা ছাড়াও উপায় থাকত না। সেই দুর্দৈবের হাত থেকে ভগবান মানুষকে বাঁচিয়েছেন, কেবল মনেরই বেলায় রাশ একেবারে আলগা ক'রে দিয়েছেন। না মোদাব্বের সাহেব, আরও বেশি ভাবলে যা করেছি তার চেয়ে ভালো কিছু করতাম, এমন মনে করবার অন্ততঃ এখনও কোনো কারণ ঘটেনি।

ব'লে শ্রী নিঃশব্দে নিজের মনে তলিয়ে তলিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো। তার সমস্ত মুখ কোথাকার যেন একটা শান্ত মাধুর্যে প্লাবিত হয়ে গেল।

ভুজঙ্গের জন্যে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ওরা দুজনে খেতে বসলো।

বাইরে ছম ছম করছে নিস্তব্ধ ক'লকাতা। ট্রাম নেই, লোক-চলাচল নেই। ঘরের মধ্যে ব'সেও মানুষ কথা বলছে চুপে-চুপে। এমনি ক'লকাতার অবস্থা।

মোদাব্বের উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, এখনও ভুজঙ্গ ফিরলো না, ভয়ের কোনো কারণ নেই তো ?

শ্রী হেসে বললে, ভয়ের কারণ তো মানুষের আজ্ঞ পদে পদেই রয়েছে মোদাব্বের সাহেব। পথে বেরুলে মানুষের কত কী ঘটতে পারে। তা নিয়ে আর কত ভাবা যাবে ?

ওর নিস্পৃহতায় বিস্মিত হয়ে মোদাব্বের জিজ্ঞাসা করলে, তাই ব'লে আপনার মনে কি ভাবনা হচ্ছে না ?

—হ'লেই বা কি করা যাবে বলুন। পথে বেরিয়ে যে মোড়টা পর্যন্ত একবার খুঁজে আসবেন, সে উপায়ও নেই, পুলিশে ধরবে। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষ করতেই হবে।

শ্রী হাসলে।

—কিন্তু রাত্তিরে ঘুমুতেই কি পারবেন ? আমি তো পারব না।

—পারতেই হবে। নইলে কাল সকালে খুঁজতে যেতেও পারবেন না, খালি হাই উঠবে আর চোখ বুঁজে আসবে।

শ্রী আবার নিশ্চিন্তভাবে হাসলে।

তার হাসি দেখে মোদাব্বেরের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। বললে, আশ্চর্য ! আপনি ভুজঙ্গবাবুকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন তা জানি ব'লেই মনে কিছু হচ্ছে না। অন্য কেউ হ'লে অনেক কথা ভাবতো।

একটু ম্লান হেসে শ্রী বললে, ভাবলে অস্বাভাবিক হ'ত এমন কথা কিছুতেই বলবো না। শুধু বলবো, রাজনীতিতে হৃদয়বিলাসের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, এর মন্ত্র হচ্ছে : 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি কভু ভয়'। এই যে অভিঃ মন্ত্র, এ মন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্যে মনকে তৈরী করতে হয়। তার জন্যে সময় দরকার।

—কিন্তু

বাধা দিয়ে শ্রী বললে, না, এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই। রাজনৈতিক উপন্যাসের নামে সস্তা যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বেরুচ্ছে, তাই প'ড়ে আপনি অনেক-কিছু হয়তো রাজনীতিকদের সম্বন্ধে কল্পনা ক'রে রেখেছেন যার অধিকাংশই সত্যি

নয়। উপন্যাসের 'টিনের দেবতা'দের চেয়ে সত্যিকার রাজনীতিক অনেক বড়।

একটু ভেবে মোদাব্বের বললে, বুঝলাম। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকের মুস্কিল এই যে, সমুদ্র যেখানে গভীর সেখানে তাকে আমাদের সমুদ্র ব'লে মনেই হয় না। যে-সমুদ্র অগভীর, যেখানে ঢেউ ওঠে পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে, সেই-সমুদ্রই মনে লাগে বেশি। আপনি 'টিনের দেবতা'র কথা বললেন, কিন্তু বলুন দেখি, 'টিনের দেবতা' যেমন সহজে দৃষ্টি এবং হৃদয় আকর্ষণ করে, আসল দেবতা তেমন ক'রে পারেন ?

শ্রী হেসে বললে, পারেন না ব'লেই 'টিনের দেবতা' নিয়ে যেমন আমরা মাতামাতি করি, আসল দেবতা নিয়ে তেমন করি না। তাই ভুজঙ্গবাবুরা কর্মীর ওপরে আর প্রোমোশন পান না। আর নেতা হন তাঁরা, যাঁরা মস্ত বড় গাড়ী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। নয় কি না ?

মোদাব্বের মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, ঠিক বলেছেন। এও সেই একই কথা হোল। মানে, লোকের ত্যাগ এবং শৌর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখের আড়ালেই রয়ে যায়। কিন্তু মোটর বস্তুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ দেবতা। আমার কাঙ্গাল মনকে সে দেখা দেওয়ামাত্র জয় করে। এই পর্যন্ত বুঝলাম। কিন্তু সহকর্মীর বিপদে উদ্বিগ্ন হব না, মনের ওপর এ কী রকম জুলুম ?

শ্রী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, আপাত দৃষ্টিতে অন্যায় জুলুম ব'লেই মনে হবে। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে লাভটা কি বলুন। কাজের লোকের কাছে উদ্বেগ শুধু কাল-হরণ করে, মনকে দুর্বল করে।

—কিন্তু তাই যে মানুষের স্বভাবধর্ম।

দৃঢ়কণ্ঠে শ্রী বললে, কিন্তু রাজনীতিতে যারা নামবে, সেই স্বভাবধর্মকে তাদের অতিক্রম করতে হবে। এই হোল আমার গুরুর আদেশ।

সবিস্ময়ে মোদাব্বের জিজ্ঞাসা করলে, কে আপনার গুরু ?

—যাঁর জন্যে আজ রাত্রে আপনি ঘুমুতে পারবেন না, তিনিই।

—ভুজঙ্গ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল অথবা কোনোদিন ফিরে এসে তিনি যদি এই হৃদয়-বিলাসের কথা শোনেন, তাহ'লে জীবনে হয়তো আমার মুখই দেখবেন না।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মোদাব্বের বললে, ও যে এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে এ আমি ভাবতেই পারি না। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি।

ওর কথায় শ্রী হেসে ফেললে। বললে, একে আপনি নিষ্ঠুর বলেন! তাহ'লে যে-ডাক্তার মানুষের আধখানা পা কেটে বাদ দিয়ে দেন, তাঁকে আপনি কি বলবেন?

—ও দুটো এক নয় শ্রী দেবী।

—এক। মানুষকে বিচার করতে হবে তার উদ্দেশ্য দিয়ে, কাজ দিয়ে নয়। রাজনীতিতে ব্যক্তির চেয়ে বড় হোল দেশ, পদ্ধতির চেয়ে বড় হোল কাজ। ভুজঙ্গ বাবু আমার কাছে যত বড়ই হোন, দেশের চেয়ে বড় নন। সেই দেশের কাজে একজন ভুজঙ্গবাবুর জীবন-প্রদীপ হঠাৎ যদি নিভেই যায়, তার জন্যে শোক করার কিছুই নেই।

মোদাব্বেরের বিস্ময়-বিস্ফারিত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ শ্রী কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলে। বললে, কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। রাত অনেক হোল। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন গে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, এর চেয়ে অনেক বড় দুর্যোগের রাত উনি পার হয়ে এসেছেন, এও হয়তো তেমনি ক'রে পার হবেন। আর যদি নাই পার হ'তে পারেন, তাতেই বা কি?

ব'লে হাসতে হাসতে নিজের শোবার ঘরে চ'লে গেল।

সাত

ক'লকাতা শহরের আবহাওয়াটা দেখতে দেখতে এমন হয়ে উঠলো যে, গবেষণার কাজেও শুভেন্দু ঠিক মন বসাতে পারে না। অথচ পারলে তার ভালো হোত। খাওয়া সম্বন্ধে চিরকালই সে নির্বিকার। চাকরটা সিদ্ধ-পোড়া যা জুটো দেয়, তাতে তার কিছু অসুবিধা হয় না। স্ত্রীর অভাবেও তার যে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে তা নয়। তবে দুশ্চিন্তা হয় বই কি! এবং সেই দুশ্চিন্তা একপাশে ঠেলে রাখবার জন্যেই গবেষণায় সে ডুবে থাকতে চায়।

কিন্তু তার যো নেই। তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে চারিদিকের আবহাওয়া যেন কোমর বেঁধে লেগেছে। খবরের কাগজের নেশা তার নেই। কচিৎ কখনও পড়ে। সুতরাং খবর প'ড়ে বিচলিত হবার কারণ ঘটে না। বলতে গেলে সে একরকম গুহার মধ্যে তপস্যা করে। কিন্তু তথাপি তার নিস্তার নেই।

পরশু দিন তার পড়বার ঘরের জানলা দিয়ে এসে পড়লো একটা টিয়ার গ্যাস। চাকরটা এসে তাকে টেনে বার ক'রে নিয়ে এসে চোখ ধুইয়ে না দিলে হয়তো সে অজ্ঞানই হয়ে যেত! কাল তার দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে সার্জেন্ট পাড়ার ক'টি ছোট ছোট ছেলেকে বেদম প্রহার ক'রে গেছে।

রাজনীতি চর্চা সে করে না। সে পুরাদস্তুর অধ্যাপক। কিন্তু জাতির জীবনে এক-এক সময় এমন এক-একটা ঝাপটা আসে যে, নির্বিরোধ অধ্যাপকও তার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। শুভেন্দুর মনও বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মহারাজ প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে গবেষণাতেও সে আর মনোনিবেশ করতে পারছে না। ঘরেও তার মন বসে না, বাইরে বেরুতেও ইচ্ছা করে না।

কাল শঙ্কর এসেছিল তার খবর নিতে।

শ্রী নেই। ইলা শুভেন্দুর খাওয়া-পরা নিয়ে খুবই ভাবছে। অথচ শহরের অবস্থা এমনই ভয়াবহ যে, মেয়েছেলের পক্ষে রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয় মোটেই। তার ইচ্ছে, শ্রী না ফেরা পর্যন্ত শুভেন্দু যেন তার ওখানে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা কি ক'রে হয়? শ্রী যে-কোনো দিন যে-কোনো সময় এ-বাসায় অন্ততঃ মিনিট কয়েকের জন্যেও চ'লে আসতে পারে। সুতরাং তার জন্যে শুভেন্দুর কিছুক্ষণের জন্যেও বাড়ি ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব।

শঙ্কর ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, এ চাকরীটা শুভেন্দুর ভালো হয়েছে। তার উত্তরে শুভেন্দুর হাসা ছাড়া আর কীই বা করবার ছিল?

শ্রীর জন্যে উৎকণ্ঠাও হয়। মাঝে মাঝে ভুজঙ্গের লোক তাকে শ্রী সম্বন্ধে খবর দিয়ে যায়। তবু উদ্বেগ সম্পূর্ণ কাটে না। বিপদ তো পদে-পদে। কখন কি ক'রে কোথায় কি বিপদে পড়ে, কেউ কি বলতে পারে? হয় তো যে-মুহূর্তে ভুজঙ্গের লোক তাকে শ্রীর কুশলসংবাদ দিচ্ছে, সেই মুহূর্তেই সে একটা বিপদে প'ড়ছে। কেউ কি জানে? সুতরাং উদ্বেগ তার থাকেই।

কিন্তু এই অবস্থাও একদিন তার অসহ হয়ে উঠলো। পড়াশুনা, বাইরে বেরুনো বন্ধ। ঘরেও শান্তি নেই। সে স্থির করলে, এমন ক'রে নিষ্কর্ম বসে থাকা চলে না। ডক্টর দত্তের সঙ্গে আবার সেই প্রিয়দর্শীর গবেষণাটা আরম্ভ হওয়া দরকার। কতদিনে এ হাঙ্গামা শেষ হবে বলা যায় না। ততদিন কিছু তো করতে হবে তাকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বার হয়ে পড়লো। বড় রাস্তায় ট্রাম-বাস কিছু নেই। কিছুদিন থেকেই বন্ধ আছে। ডক্টর দত্তের বাড়ীটাও কাছে নয়। কিন্তু কি আর করা যাবে? হেঁটেই চলতে লাগলো।

রাস্তা জনশূন্য বললেই হয়। কেমন ভয়-ভয় করে যেন।

দোকান অনেকগুলো খোলা আছে বটে, কিন্তু কেমন যেন উচ্চকিত ভাব।

শুভেন্দুর ভালো লাগছিল না। একবার মনে হোল, ফিরে যায়। কিন্তু পাদুটো সুমুখের দিকে চ'লেই চলে।

মিনিট দশেক এমনি চলার পরে হঠাৎ পাশের দোকানগুলো দুমদাম ক'রে বন্ধ হতে লাগলো। একজন তাকে যেন ডাকলেও, ভেতরে আসুন, শিগগির

ভেতরে আস্থন। সামনে থেকে কতকগুলো ছেলে বিত্যুৎবেগে এদিকে-ওদিকে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। শুভেন্দু হতচকিতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখে দেখছে এই শশব্যস্ততা, কিন্তু কি যে ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার বুদ্ধি, তার চলৎশক্তি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও বোধ করি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

চক্ষের পলকে একটা প্রকাণ্ড মিলিটারী লরী দৈত্যের মতো এসে আচম্কা শুভেন্দুর পাশে ব্রেক কস্‌লে এবং কতকগুলো সৈন্য টুপটাপ ক'রে নেমে প'ড়ে তাকে আক্রমণ করলে। শুভেন্দু শুধু অনুভব করলে, কি যেন একটা শক্ত জিনিস তার মাথার উপর পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে যেন একটা বিত্যুৎপ্রবাহ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। তার পরে যে কি হোল, আর মনে পড়ে না।

শুভেন্দুর রক্তাক্ত দেহ মটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ওর অচৈতন্য দেহের উপর গোটা কয়েক লাঠি মেরে সৈন্যেরা আবার টুপটাপ ক'রে লরীতে উঠে প'ড়ে নির্বিকার চ'লে গেল।

রাস্তা জনশূন্য।

একটু পরে যে ছেলেগুলি গলির মধ্যে লুকিয়েছিল, তারা চুপি চুপি ফিরে এসে দেখলে আহত ভদ্রলোক অচৈতন্য। একটি একটি ক'রে দোকানগুলি সন্তর্পণে দরজা খুলতে লাগলো।

একজন দোকানদার বললে, আমি বলেছিলাম মশাই, ওঁকে দোকানে ঢুকে পড়তে। ভদ্রলোক বুঝতেই পারলেন না, হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল্ ক'রে চাইতে লাগলেন।

লোকটি হাসতে লাগলো। এমন ঘটনা প্রত্যহ কতবার সে দেখছে। মনে আর তার করুণাও জাগে না, উত্তেজনাও জাগে না। এ যেন খেলা।

এ্যাম্বুলেন্সকে তখনই ফোন করা হোল এবং দেখতে দেখতে এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী এসে হাজির হোল।

সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে যখন শুভেন্দুকে গাড়ীতে ওঠাচ্ছে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হোল ভুজঙ্গ।

—কি ব্যাপার?—সে জিজ্ঞাসা করলে।

তার পরণে পায়জামা, মাথায় লাল ফেজ। হিন্দু ব'লে চেনবারই উপায় নেই।

ছেলেরা বললে, মিলিটারীতে মেরে গেল ভদ্রলোককে।

—তাই নাকি?

আহতের মুখের দিকে চেয়ে ভুজঙ্গ চমকে উঠলো। বললে, এঁকে যে আমি চিনি।

—চেনেন? কে ইনি? কি করেন? কোথায় থাকেন?

শুভেন্দু অধ্যাপক শুনে ছেলেরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, দেখুন তো, কী অন্যায়! নিরীহ একজন ভদ্রলোককে

ভুজঙ্গ চাপা গলায় বললে, এর শোধ নাও তোমরা। যত রক্ত আমাদের ওরা ফেলবে, তার দ্বিগুণ নিজেদের রক্ত ফেলে ওদের এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। জমা-খরচে গোলযোগ যেন না হয়। কিন্তু তোমরা কি ওঁর সঙ্গে কেউ যাবে হাসপাতালে?

একজন বললে, আপনি যান না স্যার। আপনি মুসলমান, আপনার ভয় নেই। আমরা গেলে হয়তো গেটেই

ভুজঙ্গ হেসে বললে, ঠিক। আমিই যাচ্ছি। কিন্তু জমাখরচ যেন ঠিক থাকে ভাই।

ছেলেরা হেসে বললে, চেষ্টা তো করছি।

এ্যাম্বুলেন্সের সামনের সিটে বসতে বসতে ভুজঙ্গ বললে, ঠিক হ্যায়। 'Do or die',—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

ভুজঙ্গের চোখে যেন আগুন ঝকমকিয়ে উঠলো।

সেদিকে চেয়ে ছেলেরা বললে, লোকটা বোধ হয় কংগ্রেসের। তা না হোল মুসলমান হয়ে এমন কথা বলে?

দূরে আর একটা মিলিটারী লরীর শব্দ শোনা গেল। ছেলেরা বড় রাস্তায় আর দাঁড়ালো না। গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তা আবার জনশূন্য।

শুভেন্দুকে হাসপাতালে ডাক্তারের জিম্মা ক'রে দিয়ে ভুজঙ্গ বেরুলো ইলার বাসার সন্ধানে। বাড়িটা যে ঠিক কোথায় তা সে জানতো না। তার শুধু একটা আন্দাজ ছিল। সুতরাং বাড়িটা পেতে অনেক বেগ পেতে হোল।

শঙ্কর এবং ইলা কারও সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু পরস্পর পরস্পারের নাম এমন ক'রেই জানতো যে, দেখামাত্রই পরিচয় জমে উঠলো। অথচ উপলক্ষ্যটা আনন্দদায়ক নয় মোটেই।

শঙ্কর এবং ইলা উভয়েই জানতো ভুজঙ্গ গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সমস্ত দিন ভুজঙ্গের খাওয়া হয়নি। মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। তার উপর স্নান নেই। ইলার তা দৃষ্টি এড়ালো না।

সে প্রথমেই ভুজঙ্গের সঙ্গে দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে নিলে। বললে, ভুজঙ্গদা, এখন আর মিছিমিছি চা খাওয়াব না আপনাকে। আপনি স্নান ক'রে নিন। আমি ষ্টোভে ততক্ষণ দুটো ভাতে-ভাত বসিয়ে দিই। কি বলেন?

ভুজঙ্গ এই স্নেহের ডাকে বিগলিত হয়ে পড়লো। বললে, কিন্তু আমার যে বড্ড তাড়া দিদি।

—আমার দেরি হবে না। দেখুন তো। আপনি স্নান করে আসুন।

ইলা চলে গেল।

এতক্ষণে ভুজঙ্গ শুভেন্দুর খবর শঙ্করকে জানাতে সময় পেল। শুনে শঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল।

ভুজঙ্গ বললে, আপনার বাড়িটা খুঁজতে দেরি না হোলে হয় তো আরও আগে খবরটা দিতে পারতাম। এখন কি করবেন বলুন।

—এখনই একবার যেতে হয়।

—ইলাকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—ঠিকের তো কথা নয় ভুজঙ্গবাবু, তিনি যাবেনই। আপনি কি জ্ঞান হওয়া দেখে এসেছেন?

—দেখে আসিনি, তবে সঠিক জেনে এসেছি।

শঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যাই হোক, আপনি স্নান ক'রে দুটি খেয়ে নিন।

ভুজঙ্গ খাওয়ার ব্যবস্থায় খুব লজ্জা পেতে লাগলো। বললে, তার দরকার নেই শঙ্করবাবু। যদি মনে করেন, ইলাকে এখন বলা যায় তাহ'লে তাঁকে ডেকে শুভেন্দুর খবরটা দিন।

শঙ্কর ইলাকে ডাকলে এবং খবরটা বললে।

ইলা হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো না, একটা শব্দও তার মুখ থেকে বেরুলো না। কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কব বললে, ভুজঙ্গবাবু জ্ঞান হওযাব খবর নিয়ে হাসপাতাল থেকে এসেছেন। সুতরাং ভয়ের কারণ নেই। বলছিলাম, রাস্তা তো খুব নিরাপদ নয, তুমি না হয় এখন নাই গেলে।

এতক্ষণে ইলার কথা বেরুলো। বললে, না। আমি যাব। তুমি একটা ট্যাক্সি ডাকো। শিগ্‌গির।

শঙ্কর ট্যাক্সি ডাকতে বেরুলো। ইলা ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি আমাদেব সঙ্গে যাবেন?

—না। আমাব যাবার উপায নেই।

—তাহ'লে আমি চাকবটাকে ব'লে যাচ্ছি, আপনি কিন্তু না খেয়ে যাবেন না।

ভুজঙ্গ মাথা নেড়ে বললে, না দিদি। আমাব ততক্ষণ অপেক্ষা করবার সময নেই। আব একদিন এসে তোমাব হাতের রান্না চেখে যাব. শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে। কিছু মনে কোরো না।

দ্বিতীযবার অনুরোধ করার মতো মনেব অবস্থা ইলার নয। ট্যাক্সিও এসে এসে গিয়েছিল। ইলা যে কাপড়ে ছিল সেই কাপড়েই ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো। যাওযাব মুখে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, বৌদিব খবর কি?

—ভালোই।

ওদের ট্যাক্সি চলে গেল।

ওরা চলে যেতে ভুজঙ্গ মোদাব্বেরের আস্তানার দিকে চলতে আরম্ভ করলে।

সমস্ত দিন পায়ের উপর ধকল তার কম যায়নি। এখান থেকে মোদাখেরের বাসা দূরও কম নয়। কিন্তু পকেটে তার অল্প কয়েকটি মাত্র টাকা। গা-ঢাকা দেওয়া অবস্থায় টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কখন যে অকস্মাৎ টাকার দরকার হয় কেউ জানে না। সুতরাং অকারণে পা-দুটোকে একটু আরাম দেবার জন্যে ট্যাক্সি করতে তার ইচ্ছা হোল না। ঠুক্ ঠুক্ ক'রে, হেঁটেই চলতে লাগলো।

আকাশে মেঘ ক'রে এসেছে কালো হয়ে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেই নিকষকালো মেঘের দিকে চেয়ে তার চোখ দুটি যেন জুড়িয়ে গেল। মনে হোল, ভাগ্যি ট্যাক্সি করেনি। বৃষ্টি নামবে হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই। এই বৃষ্টিতে খানিকটা ভিজতে পারলে তার ভিতরটা ঠাণ্ডা হবে।

ভিতর যেন পুড়ে যাচ্ছে। নিরীহ বেচারা শুভেন্দু, অকারণে পশুগুলো তাকে মেরে গেল। শুধু শুভেন্দুই তো নয়, মার নিরীহ লোকেই বেশি খাচ্ছে। বিপদ কখন কোন দিক দিয়ে আসে তার জন্যে তারা তৈরি থাকে না। কিন্তু উপায় কি!

ভুজঙ্গ আপন মনেই ঘাড় নাড়লে। সত্যই কোনো উপায় নেই। এই নিরীহ লোকগুলিকে মার অথবা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও এখন বিপ্লব বন্ধ করা চলে না। কতক লোককে তো মরতেই হবে। স্বদেশের স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে না? আর সেই মূল্য দেবার দায় কি একা তাদেরই যারা দেশের জন্যে সর্বস্ব ছেড়ে পথে বেরিয়েছে? ছেলে-মেয়ে নিয়ে যারা সংসার পেতেছে, নিরুপদ্রবে তারা জীবন কাটাতে চায় ব'লেই কি তাদের কোনো দায় নেই?

না, না। ভুজঙ্গের বিবেক এ বিষয়ে পরিষ্কার। ইংরেজ এই যুদ্ধে বিপন্ন। এই সুযোগে ভারতে থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব ক'রে তুলতে হবে। তার জন্যে বহু লোক মরবে,—মরতে হবে। তাদের নিয়ে বিপ্লবীর অনুশোচনার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু শ্রী?

ভুজঙ্গের মনে হোল, শুভেন্দুর প্রহারে তার মনের যে স্থৈর্য নষ্ট হয়েছে, সে সম্ভবত শুধু শ্রীর জন্যেই। শ্রীর জন্যে মাঝে-মাঝেই তার দুঃখ নয়, চিন্তাও হয়

মনে হয়, আমাদের সামাজিক আবেষ্টনে মেয়েরা বুঝি পরিপূর্ণ বিপ্লবী হতে পারে না।

এই নিয়ে একদিন শ্রীর সঙ্গে তার তর্কও হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখনও শ্রীর বিয়ে হয়নি।

শ্রী জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন হ'তে পারে না? আমাদের সমাজ অন্য দেশের সমাজের থেকে পৃথক কোথায়? কোন্ দেশে আর নরনারী বিবাহ করে না, ঘর বাঁধে না, ভালোবাসো না?

ভুজঙ্গ বলেছিল, বাঁধে ঘর, ভালোওবাসে। কিন্তু ঘর বাঁধার আনন্দে এমন ক'রে ডুবে যায় কোন দেশের মেয়ে?

শ্রী হেসে বলেছিল, আপনি কি সমস্ত দেশের মেয়েদের মনের কথা জানেন?

ভুজঙ্গ উত্তর করেছিল, তা জানিনে। কিন্তু একটা কথা জানি। সে হচ্ছে এই যে, ওদের গোটা সমাজটা গ'ড়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদে। ওদের সমাজের সৌধ তাই চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

—কি রকম?

—বিবাহের কথাই ধরো। ওদের বিয়েতে গীর্জার একটা স্থান আছে বটে, কিন্তু সেটাও মূলতঃ চুক্তির জন্যেই। তুমি যতদিন আমাকে ভালোবাসবে, খেতে-পরতে দেবে, ততদিনই এই বিয়ে। এই চুক্তি যে দিন ভাঙবে, আমাদের বিয়ের বাঁধনও সেদিন ছিঁড়বে। নয় কি? এমন ক'রে ধর্ম এবং দেবতা সাক্ষী ক'রে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে কারা?

শ্রী জিজ্ঞাসা করেছিল, একে কি আপনি খারাপ মনে করেন?

—ভালো-মন্দের প্রশ্নই আমি তুলিনি। আমি শুধু বলতে চাই, এত স্নেহ, এত প্রেম, এত আনন্দ দিয়ে গড়া আমাদের এই সমাজ আমাদের মেয়েদের বাঁধছে। তার থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে কঠিন হয়।

একথা শ্রী মেনে নেয়নি। সেদিনও না, বিবাহের পরে আজও না। কোনো প্রয়োজনের মুহূর্তেই কোনো উপলক্ষ্যে সে অনুপস্থিত থাকেনি। সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত সমস্ত দুরূহ কাজেই সে বিনা দ্বিধায় ভুজঙ্গের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সবই সত্য। কিন্তু ভুজঙ্গের মন, কি জানি কেন, কিছুতেই শ্রীর সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারে না। শ্রী আশ্চর্য মেয়ে, প্রচণ্ড তার জোর। তবু তার সম্বন্ধে ভুজঙ্গের মনে অনেক ভয়, অনেক ভাবনা।

এই মুহূর্তে সে ভাবছিল, শুভেন্দুর খবরটা শ্রীকে শোনাবে কিনা। হঠাৎ শুনলে শ্রী বিপ্লবীর দৃঢ়তায় তা গ্রহণ করতে পারবে কিনা। হঠাৎ একটী লোকের উপর দৃষ্টি পড়তে তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

ওদিকের ফুটপাথ দিয়ে ময়লা হাফ-সার্ট পরা যে লোকটি চলেছে, ওকে যেন আজকের দুপুর থেকে কয়েক জায়গাতেই দেখেছে। ভুজঙ্গের মনে কেমন সন্দেহ হোল। সে পাশের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা পান খাবার জন্যে। তার দোকানের সস্তা বড় আয়নাটায় লোকটির ছায়াও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। পান সুপারী, চুণ, একটু দেরি করলে সে। ছায়া তখনও স্থির।

পানের দোকান থেকে ভুজঙ্গ চলতে লাগলো ওর দিকে না চেয়েই, এবং প্রথমেই যে গলিটা পেলে সেইটের মধ্যে ঢুকেই হন হন ক'রে চলতে লাগলো। একটু পরে পিছনে চেয়ে দেখলে, লোকটিও ফুটপাথ থেকে নেমে বেশ দ্রুত পদেই এদিকে আসছে।

আর সন্দেহ নেই। লোকটি তাকেই অনুসরণ করছে।

ভুজঙ্গ সংকীর্ণতব একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়লো। বৃষ্টিও নামলো সেই মুহূর্তে ধূলো উড়িয়ে, ঝড় নিয়ে। ছোটবার একটা অজুহাত পেলে ভুজঙ্গ। এবং পর পর আঁকা-বাঁকা কতকগুলো গলির ভিতর দিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো।

আট

বেশিক্ষণ ভুজঙ্গকে ছুটতে হোল না। কাছাকাছি দুটো মোড় ঘুরেই দেখলে একটি বাড়ির বৈঠকখানা খোলা রয়েছে। বছর তেইশ-চব্বিশের একটি ছেলে পড়ছে সেখানে। ভুজঙ্গ ঝোড়ো কাকের মতো ঝুপ ক'রে সেখানেই ঢুকে পড়লো :

—মাফ করবেন। বৃষ্টি ছাড়লেই চলে যাব।

ছেলেটি লাফিয়ে উঠলো : এঃ! ভীষণ ভিজে গেছেন দেখছি! বসুন,বসুন।

ভুজঙ্গ হেসে ফেললে। বললে, বসবো কি! আমার জামা কাপড়ের জলে আপনার মেঝে ভেসে গেল!

—আচ্ছা দাঁড়ান দেখছি। পালাবেন না যেন।

ব'লেই ছেলেটি ভিতরে চলে গেল। এবং এক মিনিটের মধ্যেই শুকনো জামা-কাপড় নিয়ে এসে বললে, আচকুন-পায়জামা-ফেজে আমি প্রথমে আপনাকে চিনতেই পারিনি। নিন, কাপড় ছাড়ুন।

ভুজঙ্গ চমকে উঠলো! তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে, এখন আমায় চিনতে পেরেছ? কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

ছেলেটি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে, আমি বিপিন,—নৃপেন-বাবুর ভাই। ছোটবেলায় দেখেছেন ব'লে চিনতে পারছেন না। নিন, কাপড় ছাড়ুন। আমাদের বাড়ীতে খদ্দরের ধুতি নেই কিন্তু।

পাখার হাওয়ায় ভিজে কাপড়ে ভুজঙ্গের শীত ক'রে এসেছিল। শুকনো জামা-কাপড় প'রে যেন বাঁচলো। কিন্তু মন তার কোনো সময়েই অসতর্ক নয়। চেয়ারটা এমন একটা কোণের দিকে টেনে নিয়ে বসলো, যেন রাস্তা থেকে দেখা না যায়। অবশ্য এই ঝড়-বৃষ্টিতে রাস্তায় তাকে খোঁজাখুঁজি কেউ করবে না নিশ্চয়। কারণ মাইনের বিনিময়ে দেশদ্রোহিতা করারও একটা সীমা আছে। তবু সতর্ক থাকতে দোষ কি?

বাইরে ঝড়বৃষ্টি যেন বেড়েই চলেছে। ভুজঙ্গ বিপিনের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে :

—নৃপেন গেল কোথায় ?

বিপিন হেসে বললে, দাদার কথা আর বলবেন না। ভোর পাঁচটার সময় স্নান ক'রে এক পেয়ালা চা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যান। ফেরেন রাত্রি বারোটার এদিকে নয়।

—বলো কি হে ! কী চাকরী করে সে ?

—চাকরী না, কণ্ট্রাক্টরী।

—কিসের কণ্ট্রাক্ট ?

বিপিন দ্বিধা করতে লাগলো। বললে, জানেন না আপনি ?

—না। তার সঙ্গে গত পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে দেখা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। শুনেছিলাম বটে অনেকদিন আগে, কি সব টুকিটাকি ব্যবসাপত্র করে সে।

—হ্যাঁ। সে অনেককাল আগের কথা। তখন উনি পাটের ফেঁসোর ব্যবসা করতেন। এখন যুদ্ধের তরকারীর কণ্ট্রাক্ট নিয়েছেন।

হায় ভগবান ! এই যুদ্ধে ইংরেজকে বিপন্ন করবার জন্যে যে—ভুজঙ্গ ফেরারী, ঝড়ের চক্রান্তে এমন বাড়ীতে সে আশ্রয় নিয়েছে, যে এই যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করছে ! সে কথা ভেবেই বোধ হয় বিপিন দাদার কাজের কথায় ইতস্তত করছিল।

কিন্তু কি আর করা যায় !

ভুজঙ্গ বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো পড। কি পড় ?

—এবার ফোর্থ ইয়ার হোল।

—বাঃ ! বেশ। আর্টস্ ?

—না, সায়েন্স। ওই আপনার চা এসে গেল।

চা মানে শুধু চা নয়। লুচি, ইলিশ মাছ ভাজা, আলুর দম, সন্দেশ,—বলতে গেলে রাত্রির আহার। সমস্ত দিন তার আহার হয়নি। বিকেলে ইলা ষ্টোভে দুটো ভাত রেঁধে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিল। 'কিন্তু দাদার আহত হওয়ার খবর পেয়ে তার সব গোলমাল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভুজঙ্গের সন্দেহ হয়,

ইলা যেন এই ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে ভুজঙ্গের উপরেই চটে গেছে। দাদাকে মারলে ইংরেজ সৈনিক, কিন্তু ও বোধ হয় এর জন্যে কংগ্রেসের অগষ্ট বিপ্লবকেই দায়ী করেছে। আশ্চর্য মানুষের মন!

কিন্তু থাক গে সে কথা এখন।

জিজ্ঞাসা করলে, এর সমস্তই খেতে হবে?

বিপিন বললে, নিশ্চয়ই। আরও আসছে।

—বলো কি হে! আমার কথা বললে বুঝি সবাইকে?

বিপিন মুখ নামিয়ে একটু হাসলে। বললে, আপনার কথা সবাইকে কি বলা যায়? শুধু বৌদিকে বলেছি।

ভুজঙ্গ থালা থেকে মুখ তুললে না। নিস্পৃহভাবে বললে, তার মানে?

বিপিন বললে, আপনি যে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, এ কথা বাংলা দেশে না জানে কে?

—ঠিক।

ভিতরের দিকের দ্বারের অন্তরালে শাড়ির খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে সেই দিকে উদ্দেশ করে ভুজঙ্গ বললে, সবই যখন জানেন তখন লজ্জা ক'রে লাভ কি বলুন বৌদি। সমস্ত দিনের পর আজ তো নিতান্ত মন্দ জুটলো না। কাল কি জুটবে কে জানে! সুতরাং কালকেরটাও খেয়ে রাখি। কিছু মনে করবেন না যেন।

এর সমস্তই হয়তো পরিহাস। কিন্তু বিপিনের বৌদির বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। এক মিনিটের মধ্যেই তিনি নিজেই একখানা থালায় খানকয়েক লুচি এবং একবাটি মাংস নিয়ে এলেন।

ছিপছিপে ছোটখাট মেয়ে। বড় বড় দুটি চোখে মাতৃত্বের কোমল ছায়া নেমেছে। গায়ে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। নিতান্তই সাদামাটা দু-চারখানা গহনা। পরনে খদ্দরের শাড়ি। খাওয়া ভুলে ভুজঙ্গকে মুহূর্তের জন্যে নারীর সেই সহজ রূপের দিকে চেয়ে থাকতে হোল।

অপরিচিত পুরুষের সেই দৃষ্টিপাতে যে-কোনো মেয়ে বিব্রত হয়ে উঠতো। কিন্তু ব্রততী নিঃসঙ্কোচে ওর প্লেটে লুচিগুলি ঢেলে দিয়ে বললে, সবগুলো খেতে হবে দাদা। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খাওয়ার সময় মেয়েদের এই আদেশের ভঙ্গি ভুজঙ্গ ভুলেই গিয়েছিল। সেই ভুলে-যাওয়া পুরোনো কথা এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তার মতো নিষ্ঠুরকেও যেন অন্যমনস্ক ক'রে দিলে। এই মেয়েটিকে যেন তার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু সেইগুলি যে কি, কিছুতেই স্মরণ করতে না পেরে সে নিঃশব্দে খেতে লাগলো।

চাকরটা উচ্ছিষ্ট থালা নিয়ে যাবার জন্যে দরজায় উঁকি মারলে। ব্রততী বললে, তুই ওপর থেকে পান-মসলা নিয়ে আয়, আমি থালা নিয়ে যাচ্ছি।

এ কথাটা এ বাড়ীতে এমন যে, শুধু চাকরটাই নয় বিপিন পর্যন্ত চমকে উঠলো, এবং তাদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে ব্রততী পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মতো বাঁ হাতে থালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

নৃপেন ভুজঙ্গের সঙ্গে পড়তো গ্রামের স্কুলে। কিন্তু প্রথমত পড়াশুনায় সে ভালো ছিল না, দ্বিতীয়তঃ তার বাবা ছিল পাঁড় মাতাল। দুঃখের সংসারে বাড়ির কর্তা মাতাল হোলে যা হয়, তাদের সংসারেও তাই হোত। খাওয়া জুটতো তো কাপড় জুটতো না, কাপড় জুটতো তো খাওয়া জুটতো না। তার উপর ছিল অশান্তি। এবং এমনি একটা পরিবেশে থেকে নৃপেনও যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে গড়ে উঠেছিল। সেই বয়সেই যত রকমের দুঃসাহসী দুষ্কার্যে সেই ছিল অগ্রণী। তার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, দ্বিধাও ছিল না। কিন্তু মনের ভিতরটি ছিল নরম।

এই ভাবে সে বোধ হয় ভুজঙ্গের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। তারপরেই তার বাপ মারা যায়। সামান্য যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর ছিল, মহাজনে তাও নেয় নীলাম ক'রে। এই অবস্থায় যখন তাদের দিন চলা ভার, সেই সময় তার মামারা এসে তাদের নিয়ে যায়।

এর পরে নৃপেন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল কি করেনি ভুজঙ্গের মনে নেই। মাঝে মাঝে কলিকাতার রাজপথে উভয়ের মধ্যে দেখা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু লেখাপড়ার আলোচনা হয়নি। নৃপেন তখন ঘুরছে, কেবল ঘুরছে, কিন্তু কোথাও ঠিক সুবিধা করতে পারছে না, এমনিতরো অবস্থা।

ভুজঙ্গ এইটুকু বুঝেছে যে, নৃপেনের অবস্থা এখন স্বচ্ছল। কিন্তু সে যে কত স্বচ্ছল, এখনও তা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু সেজন্যে ওর কোনো আগ্রহও নেই। ও কেবল বাইরের দিকে চাইছে, বৃষ্টিটা কখন থামবে, ও আবার বেরুতে পারবে। ওর মন প'ড়ে আছে মোদাব্বেরের বাড়িতে। কাল রাত্রি থেকে সেখানে ও যেতে পারেনি, সবাই খুব ভাবছে নিশ্চয়।

অথচ বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পথ-ঘাট জলে ভাসছে। বৃষ্টি যদি এখন থামেও তাহ'লেই বা অতদূর যাবে কি ক'রে? ট্রাম তো বন্ধ হয়ে গেছেই, বাসও চলছে কি না কে জানে। ট্যাক্সিও চলবে না। সামনের গলিতে যে রকম জল জমেছে, সারারাত্রিতেও ও জল সরবে বলে তো মনে হয় না।

বিপিন হেসে বললে, ভালোই হবে দাদা, আপনার কাছ থেকে কত গল্প শোনা যাবে। দাদার সঙ্গেও দেখা হবে অনেক কাল পরে।

—তাই তো দেখছি। অথচ ফিরে যাওয়ার খুবই দরকার ছিল।

ব্রততী এল। বললে, যত দরকারই থাক আজকের রাত্রে বেরুনো সম্ভব নয়। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সমস্ত দিন ঘুরেছেন, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। উপরে আপনার বিছানা হয়েছে, সেইখানে শুয়ে শুয়ে গল্প করবেন চলুন। এস ঠাকুরপো।

উপরের ঘরে খাটের উপর পরিপাটি ক'রে বিছানা পাতা। ভুজঙ্গ আরামে তাইতে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিল। কতকাল পরে সে এমন কোমল শয্যায় শুলে তা আর মনেও পড়ে না।

বাইরে কাচের শার্সীর উপর টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝোড়ো হাওয়াও দিচ্ছে খুব। কিন্তু জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা গরম।

বিপিন পাখাটা খু'লে দিলে। তারপর একখানা চেয়ার খাটের কাছে টেনে এনে বললে, বৌদির বিবাহের একটা ইতিহাস আছে, জানেন দাদা?

—কি শুনি?

বিপিন বললে, বৌদির বাবার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, অবনীকান্তবাবু, নদীয়ার রাজনৈতিক নেতা।

অয়স্কান্তবাবুর নাম কে না শুনেছে! দুর্দান্ত বিপ্লবী। ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে পালাবার সময় পুলিশের গুলীতে মারা যান।

তাঁর নাম শুনে ভুজঙ্গ চমকে লাফিয়ে উঠলো। বললে, অয়স্কান্তবাবুর মেয়ে উনি? কি আশ্চর্য!

বিপিন বললে, আশ্চর্য তো বটেই। তিনি নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, প্রচুর টাকা তিনি নানাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছেন। সম্বলের মধ্যে ছিল স্ত্রী আর এই মেয়ে। হিসাব করে দেখা গেল, মহাজনের দেনা মিটিয়ে গ্রামের ওই বাড়িখানা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তার পরে বিধবা স্ত্রীরই বা কিসে চলবে, অবিবাহিতা মেয়েরই বা কি হবে? অথচ মহাজনেও আর দেনা ফেলে রাখতে রাজি নয়। অয়স্কান্তবাবুর সত্যিকারের যাঁরা বন্ধু, তাঁদের কেউ তখন জেলে, কেউ বা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। নইলে তাঁরা হয়তো টাকাটা তুলে দেনা পরিশোধ ক'রে দিতে পারতেন। এমন সময় এমনি এক ঝড়-জলের রাত্রে একটি অতিথি এসে উপস্থিত। চেনা অতিথি। খবরের কাগজে অয়স্কান্তবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে অনেক কষ্টে এসেছেন ওঁদের খবরটা নিয়ে যেতে। থাকবার তাঁর উপায় নেই। ভোর চারটের ট্রেনেই তাঁকে পালাতে হবে। যাবার আগে তিনি বৌদির মায়ের হাতে দুশোটি টাকা দিয়ে বললেন, এর থেকে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে পাওনাদার মেটাবেন, কিছু নিজের হাতে রাখবেন। আমি আর কিছু টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করছি। যদি পাই, আর যদি ধরা না পড়ি কিংবা মারা না যাই, তাহ'লে এমনি ক'রে একদিন এসে দিয়ে যাব। ইতিমধ্যে একটি ছেলে আমি পাঠিয়ে দোব, তারই সঙ্গে ব্রততীর বিয়ে দেবেন। তাহ'লে কিছুটা সুস্থ হতে পারবেন।

ভুজঙ্গ গল্পটা যেন গিলে যাচ্ছিল। বিপিন থামতেই জিজ্ঞাসা করলে, তার পর?

বিপিন বললে, বৌদির মা কিন্তু খুব শক্ত মেয়ে ছিলেন। অতিথির কথা শুনে তিনি বললেন, আপনাদের মতো সুপাত্র নয় তো? তাহ'লে কিন্তু পাঠাবেন না। আমার মেয়ের বিয়ে না হয় সেও স্বীকার, কিন্তু যে জ্বালায় আমি আজীবন জ্বলেছি, সেই জ্বালায় ওকে আর ফেলব না। শুনে অতিথি হেসে বললেন, না, না, সে ভয় করবেন না, ভালো ছেলেই পাঠাব।

ভুজঙ্গ বললে, সেই ভালো ছেলেই বোধ করি তোমার দাদা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বৌদি সেইবার ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, আর দাদা তো জানেনই ম্যাট্রিক ফেল।

ভুজঙ্গ একটু ভেবে বললে, পিতৃকুলের স্মৃতি তোমার বৌদি এখনও ভুলতে পারেননি দেখছি। খদ্দর এখনও পরেন।

—শুধু পরেন নয়, খদ্দরই পরেন, আর কিছু নয়।

এই সময় ব্রততী শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, কে? কার কথা বলচেন?

বিপিন হেসে বললে, আপনারই নিন্দা করা হচ্ছিল।

ব্রততীর মুখে একটা লজ্জার ছায়া খেলে গেল: আমি খদ্দর পরি তারই নিন্দা? এটা কি জানেন দাদা, আমি যে খদ্দরের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি তার জন্যে নয়,—যারা আমার বাবাকে মেরেছে আমি যে তাদের বিরোধী দলে, তারই চিহ্নস্বরূপ পরি। বলুন তো, খদ্দর ছাড়া তার আর কোনো চিহ্ন আছে?

অন্যমনস্কভাবে ভুজঙ্গ বললে, আমি তো জানি না।

একটু পরে বললে, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বৌদি?

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, বৌদি নয়, আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন, আমি আপনাকে দাদা বলেছি।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, বেশ, নাম ধরেই ডাকব।

—এবাব বলুন আপনার প্রশ্নটা।

ভুজঙ্গ বললে, প্রশ্নটা আর কিছুই নয়, একে কৌতূহলও বলতে পাব।

—কি কৌতূহল?

—আচ্ছা, তুমি তো ঘোরতর স্বদেশী।

আবার বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, ঘোবতর নয়, তবে দেশকে সামান্য একটু ভালোবাসি। তার পরে?

ভুজঙ্গ বললে, কিন্তু তোমার স্বামী প্রভুশক্তির মিলিটাবী কণ্ট্রাক্টর। এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কর কেমন ক'রে?

ব্রততী হেসে উঠলো। বললে, কেমন ক'রে তা জানি না দাদা, কিন্তু এটুকু জানি যে, খুব সহজেই করি। এত সহজে যে, কারণটা পর্যন্ত বুঝতে পারি না। আমার বাবা ছিলেন বিপ্লবী, মা নিতান্তই সাধারণ মেয়ে। নিরাপদে ঘরসংসার করার বেশি আর কিছুই চাইতেন না। বলতে গেলে দুজনের পথ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ সামঞ্জস্যের কোনো অভাব তো ঘটেনি।

ভুজঙ্গ বললে, তার মানে তুমি বলতে চাও যে, সাধারণত এমনিই হয়। কালক্রমে দুজনেই পরস্পরকে সয়ে নেন। না?

—বোধ হয়। কিন্তু ওসব বাজে কথা থাক। আপনার কথা বলুন।

—আমার কি কথা তুমি শুনতে চাও?

—কি মনে হচ্ছে বলুন। ইংরেজকে সত্যি সত্যি তাড়াতে পারবেন?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, সে বিশ্বাস আছে বলেই তো এত লোক আজ ঘর ছেড়েছে, সুখ ছেড়েছে, শান্তি ছেড়েছে।

ব্রততী উত্তেজিতভাবে চেয়ারটা ভুজঙ্গের আরও কাছে সরিয়ে নিয়ে এল। বললে, কিছু মনে করবেন না দাদা, কিন্তু একথা কি আপনারা নিজেদের জোরের উপর ভরসা ক'রে বলছেন, না জাপান-জার্মানীর ভরসাও আছে?

ভুজঙ্গ বললে, সকলের উপর ভরসা ক'রেই বলছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজের উপরও আমার ভরসার অভাব নেই।

ব্রততী বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানেটা কি হোল?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তার মানে এই হোল যে, কিছুটা আমরা তাড়াব, কিছুটা জাপান-জার্মানী তাড়াবে, কিছুটা সে নিজেই যাবে।

ব্রততী যেন দমে গেল। বললে, কিন্তু এই পাঁচমিশেলী ভরসার উপর নিশ্চয় ক'রে কিছুই কি বলা যায়?

ভুজঙ্গ বললে, এর অতিরিক্ত ভরসা ইতিহাস কখনও দিয়েছে? দেওয়ালের সেই লিখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজকে এবার যেতেই হবে। কিন্তু তার পরে কি হবে জানো? যারা গত পঁচিশ বৎসর লড়ে আসছে, বুক ঠুকে তারা বলবে তারাই ইংরেজকে তাড়ালে। যারা লড়াই করেনি, তারাও হঠতে রাজি হবে না। বলবে, ইংরেজকে তাড়ানোয় কারও কৃতিত্ব নেই, তারা নিজেই গেছে। ইংরেজের শাসনকালে আজ যাদের দেখছ উদাসীন এবং হয়তো বা

ইংরেজেরই দিকে, সেদিন তারা উদাসীন থাকবে, এ মনেও করো না। তাদের দম্ভও সেদিন কিছুমাত্র কম হবে না।

বিপিন বললে. সে তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ স্বাধীনতা যেই আনুক, দেশ তো সকলের। সুতরাং তার উপর সকলের অধিকার সমান।

উত্তেজনায় ভুজঙ্গ বালিশের উপর কনুয়ের ভর দিয়ে মাথাটাকে তুলে ধরলে। তার চোখ জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো।

বললে, কে বললে দেশ সকলের, সবারই তার উপর অধিকার সমান? দেশে জন্মে যারা গাড়ি-বাড়ি, টাকা-কড়ি, ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর কিছুই ভাবলে না, শুধু দেশে জন্মেছে ব'লেই দেশের উপর তাদের সমান অধিকার? তা যদি হয় তা'হ'লে তার চেয়ে বড় দুর্দিন দেশের আর নেই। তা নয় বিপিন, ওটা গণতন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা।

বিপিন বললে. তাহলে গণতন্ত্রে সকলকে ভোটের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে কেন?

—দেওয়া হয়েছে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে দেশকে সকল মানুষ সমান ভালোবাসে। স্বাভাবিক অবস্থায় তার পরীক্ষা সম্ভব নয়। ভালোবাসা প্রমাণিত হয় তখনই যখন প্রাণ দেবার ডাক আসে। তাই বিপ্লবের পরে দেখা যায়, ক্ষমতা আসে জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত-ধনী সবাইকে ছাড়িয়ে ষ্ট্যালিন কিংবা হিটলারের হাতে। চাবুকের জোরে তারা বসিয়ে দেন যার যেথা স্থান। বিপিন, দেশ শাসনের অধিকার অর্জন করতে হয় ত্যাগের মূল্যে, সেবার মূল্যে, বুকের রক্তের মূল্যে। দেশে জন্মালেই সে অধিকার আসে না।

বিপিন বললে, কিন্তু অধিকার আর যোগ্যতা তো এক কথা নয়। ধরুন জননায়ক যদি মূর্খ, অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত হন। ধরুন যদি

—আকবর, শিবাজি বা রণজিৎ সিং হন? এর উত্তরও কি দিতে হবে? রাশিয়ায় বিদ্বের জাহাজের কিংবা জবরদস্ত এডমিনিষ্ট্রেটরের কি অভাব ছিল? তথাপি ষ্ট্যালিনের হাতে ক্ষমতা এল কেন? এসে কি কিছু খারাপ হয়েছে? আমার কি মনে হয় জানো? সার্থক শাসক হবার জন্যে দরকার কল্যাণ করার আন্তরিক ও দুর্দমনীয় ইচ্ছা এবং প্রচুর সাধারণ বুদ্ধি—আর কিছু নয়।

ব্রততী বাধা দিয়ে বললে, সে যাই হোক, এখন কি করছেন বলুন।

হেসে ভুজঙ্গ বললে, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দু'এক ঘা দিচ্ছিও তাদের। ব্যস, এই পর্যন্ত। আজ তোমাদের এখানে রাত্রি কাটালাম, কাল কোথায় কাটাব জানি না।

শুনে ব্রততীর মনটা খুব ভারী হয়ে গেল। তার বাবাও এমনি করেই বেড়াতেন। অনেক দিন পরে অন্ধকার রাত্রে হুট্ করে একবার হয়তো বাড়ি আসতেন। কয়েক ঘণ্টা গল্প-গুজব খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রাত্রের অন্ধকারেই অন্তর্হিত হতেন। এ যে কি জীবন, এর যে কত দুঃসহ দুঃখ, তার কিছু সে জানে। এবং এই সময়ে সব চেয়ে বেশি যে বস্তুটির দরকার হয়, সে হচ্ছে টাকা। সেই কথাটাই সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একখানি ভারী মোটরগাড়ি নিচে এসে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিলে। এবং তার পরেই এক জোড়া ভারী জুতোর শব্দে বাড়ি সচকিত ক'রে নৃপেন এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভুজঙ্গকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো যেন ভুজঙ্গের উপর ভেঙ্গে পড়লো :

—আরে ভুজঙ্গ যে !

ভুজঙ্গ ওর মুখের মদের গন্ধে বিব্রত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলো, ব্রততী এবং বিপিন দু'জনেই স'রে পড়েছে।

নয়

ভুজঙ্গ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, এই কয় বৎসরে নৃপেনের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। ছেলে সে চিরদিনই ডানপিটে এবং দুদান্ত, কিন্তু মদ্যপান কখনও করত না এবং একসঙ্গে বেশী কথাও কখনই কইতে পারত না। তার তখন মুখের চেয়ে হাতই চলতো বেশী।

মদের কল্যাণে কি না জানি না, ভুজঙ্গের মনে হোল ওর কণ্ঠে যেন স্বয়ং বাগ্দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে। প্রথম পোনেরো মিনিট ধ'রে ফেণিল তরঙ্গভঙ্গে সে যে কত কথা ব'লে গেল তার ইয়ত্তা নেই। তার কতক ভুজঙ্গের কানে

প্রবেশ করলো, কতক ভিড়ের মুখে প্রবেশ করার পথই পেল না। কতক প্রশ্নের সে উত্তর দিলে, কতক প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারলে না। নৃপেন তার জন্যে অবশ্য অপেক্ষাও করলে না। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তার শোনার চেয়ে বলার ঝোঁকই বেশী।

কত কথাই সে বলে গেল। তার অতীত জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

দেশ ছেড়ে কলিকাতায় এসে যখন পড়লো, তখন একেবারে নিরাশ্রয়। ফুটপাথে গাড়ীবারান্দার নিচে যত বিবিধরোগগ্রস্ত ভিখারী এবং বেওয়ারিশ ষাঁড়ের সঙ্গে রাত্রিযাপন। দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ানো,—আশ্রয়ের চেষ্টায়, চাকরীর চেষ্টায়। যেদিন এক পয়সার ছাতু জুটেছে, সেদিন তো তার রাজভোগ। বেশীর ভাগ দিনই কলের জলে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়েছে।

চাকরী যে একেবারে জোটেনি, তা নয়। মাঝে মাঝে জুটেছে। কিন্তু তারা হয়তো খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দেয়নি, নয়তো এমন অমানুষিক অত্যাচার করেছে যে মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে সে অত্যাচার সহ্য করা যায় না।

ব্যবসা করেছে কত রকমের: তরকারীর ব্যবসা, পান চালানের ব্যবসা, খবরের কাগজের হকার, সাবান বিক্রি, ট্রেনে ট্রেনে দাঁতের মাজন অম্লশূলের ঔষধ বিক্রি, পাটের ফেঁসো—কিছু আর বাকি রাখেনি। এখনও রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজের হকারদের ছুটোছুটি দেখলে তার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় তার উৎসাহ, উদ্যম এবং সহিষ্ণুতা দেখে তার উপর বিপ্লবীদলের কয়েকজনের দৃষ্টি পড়লো। তখন সে বীমার দালালি করছে। তাঁরা কিছুদিন বাজিয়ে বোধ করি দেখলেন, ছোকরার অর্থ ছাড়া সংসারে আর কিছুরই উপর দৃষ্টি নেই। তখন ব্রততীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, সেই অনিশ্চিত ভাসমান অবস্থায় বিয়ে করলে?

—করলাম। আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি মানুষ নয় ভাই, দেবতা। বলেছিলেন, টাকাকে তুমি ভালোবেসেছো নৃপেন, চিন্তা কোরো না, টাকা

তোমার কাছে না এসে পারবে না। তা মহাপুরুষের কথা মিথ্যেও তো হোল না।

নৃপেন দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে সেই অদৃশ্য মহাপুরুষেব উদ্দেশে প্রণাম জানালো।

বললে, টাকা সত্যি না এসে পারলো না। নদীর স্রোতের মতো আসছে। এত টাকা আমি কল্পনাও করিনি। এর আমি হিসাব রাখতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে কত টাকা আমার ব্যাঙ্কে আছে, সে আমি নিজেও জানি না।

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, বলো কি হে! এত টাকা আসে কি ক'রে?

—সে কি আমিই জানি রে ভাই! কিন্তু আসে, বলতে গেলে বিনা আয়াসেই আসে। আমি দুহাতে টেনে তুলতে পাবি না। তাহ'লে বলি শোনো।

নৃপেন পাশ বালিশটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বলতে লাগলো সেই আশ্চর্য ইতিহাস।

ও তখন বীমার দালালিই করছে। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যবসা করবে?

—কিসের ব্যবসা?

—ধরো ঘাসের।

—ঘাসের!

ওর বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন, তাতে অবাক হবার কি আছে? মিলিটারীর জন্যে ঘাস দরকার। যদি কর, আমি চিঠি দিয়ে দিতে পারি। দেখা করলেই কনট্রাক্ট পাবে। কিন্তু মফঃস্বলে যেতে হবে।

ওর আর সদর-মফঃস্বল কি! বললে, দিন চিঠি। আমি রাজি। কিন্তু টাকা কোথায় পাব?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, শ' পাঁচেক টাকাও যোগাড় করতে পারবে না?

—তা পারব।

—তাহ'লেই হবে।

নৃপেন তো চিঠি নিয়ে চলে গেল সেই সুদূর মফঃস্বলে। চিঠিটি দিলে একটি ভদ্রলোককে। বেঁটে-খাটো মানুষ। স্থূল দেহের উপর বিরলকেশ ছোট্ট মাথাটি। বড় বড় গোঁফ ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়েছে। চোখে বড় বড় ভাঁটার মতো চশমা।

তারই ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘাসের কনট্রাক্ট নেবেন আপনি ?

—যদি দেন দয়া ক'রে।

—বেশ। হাজার মণ ঘাস আপনি দেবেন প্রত্যহ। তার দাম একশো টাকা। সাত দিন অন্তর দাম পাবেন।

হাজার মণ ঘাস! নৃপেনের চোখ কপালে উঠলো। এত ঘাস কোথা থেকে সংগ্রহ করবে সে ? হাজার মণ ঘাস কি সোজা কথা! নৃপেন মাথা চুলকাতে লাগলো।

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, পারবেন না ?

নৃপেন বললে অ ত ঘা স !

—কোথায় পাওয়া যায় জানেন না ? যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তিনি ব'লে দেন নি কোথায় পাওয়া যায় ?

নৃপেন মাথা চুলকাতে লাগলো।

—ইনি কি আপনার আত্মীয় ?

নৃপেন মিথ্যে বললো, হ্যাঁ। খুব নিকট আত্মীয়।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি ওস্তাদ লোক, তাঁরই শিখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, আমিই শিখিয়ে দিচ্ছি শুনুন। আপনি প্রত্যহ দু'মণ ক'রে ঘাস দেবেন। সপ্তাহে আপনার সাতশো টাকার বিল হবে। তা থেকে পাঁচশো টাকা আমাকে দেবেন, দু'শো টাকা আপনি নেবেন। কি, পারবেন তো ?

এ সমস্ত বিষয়ে নৃপেনের বুদ্ধি আশ্চর্য পরিষ্কার ছিল। সে ভদ্রলোকের দুই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, পারব স্যার।

এই থেকে নৃপেনের বরাত খুলে গেল। সে আরম্ভ করলে কাজ এবং বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে লাগলো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, তারপর সেখান থেকে এখানে এলে কি ক'রে?

এক গাল হেসে নৃপেন বললে, সেই ভদ্রলোকেরই হাত ধ'রে। তিনি তাঁর সাহেবের সঙ্গে এখন এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। সুতরাং আমিও এসেছি। কিন্তু এখন প্রোমোশন হয়েছে, ঘাস থেকে তরকারীতে!

কাহিনীটা শুনতে ভুজঙ্গের খুব মজা লাগছিল। এই ইংরেজ জাত! এরা নিজের দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধেও এইভাবে সামরিক বাজেটের সদ্ব্যবহার করে! এরাও জিতবে লড়াই?

কিন্তু এদের কথা চুলোয় থাক। কথা হচ্ছে, এই যুদ্ধের যন্ত্রে এই যে দেশীয় সরকারী কর্মচারীর দল এবং দেশীয় ব্যবসায়ী তৈরী হচ্ছে, এ বিষ শেষ পর্যন্ত কতদূর যাবে, কে জানে! এই দুর্নীতি ক্ষয়রোগের মতো একদিন জাতির মেরুদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হবে না তো?

নৃপেন আপন খেয়ালেই মদের ঘোরে ব'কে চলেছে:

ঘাসে আর তরকারীর প্রভেদ অনেক। দুটো পৃথক প্রাণীর খাদ্য। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে একই। মাসে লাখ টাকার তরকারী সে সাপ্লাই করে, কিন্তু পন্থা একই। তার একই লরী, এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বার হয়ে আবার আগের দরজা দিয়ে ঢুকছে! এর থেকেই লাভের অঙ্কটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, বুঝেছি। দু'হাতে খরচ ক'রেও শেষ করতে পারছ না। না?

—এই! এই! মনের কথাটি বলেছ তুমি। দেখ ভুজঙ্গ,

হঠাৎ ব্রততী ঘরে ঢুকলো। বাধা দিয়ে বললে, উনি আর দেখবেন না। কাল ভোর হবার আগেই ওঁকে চলে যেতে হবে। সুতরাং একটু ঘুমুতে দাও।

নৃপেন তাড়াতাড়ি উঠে বললে, বাস্তবিক! Very sorry, ভুজঙ্গ, very sorry. আচ্ছা, বাই বাই!

ব্রততী স্বামীর অবস্থা দেখে হেসে ফেললে। বললে, আর একটি কাজ কর দেখি। ওঁকে হাজারখানেক টাকা দাও।

—টাকা!

—হ্যাঁ। চোরাই টাকা অনেক করেছ। তার কিছু সৎকর্মে দান কর।

নৃপেন তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলো: By all means. জানো ব্রততী, ভুজঙ্গ আমার bosom friend. আমাদের ছেলেবেলায়

ধমক দিয়ে ব্রততী বললে, ছেলেবেলার কথা পরে শুনব। তুমি টাকাটা নিয়ে এস দিকি।

—By all means.

নৃপেন তখনই গিয়ে লোহার সিন্দুক থেকে টাকাটা নিয়ে এসে ভুজঙ্গের কোলের উপর ফেলে দিলে। তারপর বাঁ হাত বুকে রেখে এবং ডান হাত সুমুখের দিকে প্রসারিত ক'রে বললে, ঈশ্বর জানেন

ব্রততী তার প্রসারিত হাতটা ধ'রে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বললে, শুধু ঈশ্বর কেন, আমিও জানি। চলো, তোমার শোবার ঘরে। ওঁকে আর বিরক্ত করা নয়।

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে দেখলো, অমন যে দুর্দান্ত নৃপেন্দ্রনাথ, ঠিক কাঁচপোকায় যেমন ক'রে তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি অবলীলাক্রমে ব্রততী তাকে টেনে নিয়ে চ'লে গেল!

ভুজঙ্গ পথশ্রমে ক্লান্ত। কিন্তু ঘুম তার আসে না! কে যেন চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।

বাইরে চেয়ে দেখলো, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। নিচে বর্ষণ-স্নাত পৃথিবী অসাড়ে পড়ে রয়েছে। সেও বোধ করি তারই মতো ক্লান্ত। তার মতো ওরও চোখে বুঝি নিদ্রা নেই।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে ভুজঙ্গ আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ব্রততী তার চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক প্রদীপ্ত মেয়ের সংস্রবে সে এসেছে, যারা তার মনে শ্রদ্ধা জাগিয়েছে। কিন্তু ব্রততীর মতো এমন বিস্ময় আর কোনো মেয়ে জাগাতে পারেনি।

অথচ কেন ?

ধরো শ্রী। রূপের দিক দিয়ে, চোখের দীপ্তির দিক দিয়ে ব্রততী তার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। অথচ শ্রী ভুজঙ্গের মনে শ্রদ্ধা যতই জাগাক, এমন বিস্ময় কিছুতেই জাগায় না। কোনো পুরুষকে এমন সহজে আদেশ করতে শ্রী বোধ হয় পারে না। সমস্ত খাবার খেয়ে নেবার জন্যে কেমন আশ্চর্য সুন্দরভাবে ব্রততী তাকে হুকুম করলে! ওইটুকু তো মানুষ, কিন্তু অবনতফণা সাপের মতো নৃপেন কেমন ক'রে তার পিছু পিছু গেল!

ভুজঙ্গের হাসি এলো।

ব্রততীর সঙ্গে নৃপেনের কি ক'রে মিলন হ'তে পারে সেই ভেবে ভুজঙ্গ প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলে, ব্রততীর একটা হুকুমে নৃপেন লোহার সিন্দুক থেকে বিনা প্রতিবাদে হাজার টাকা নিয়ে এসে ভুজঙ্গের কোলের উপর ফেলে দিলে তখন সেই মিলনের গভীরতা ভেবে ওর বিস্ময়ের আর শেষ রইলো না।

অথচ ওর মনের কোণে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম দ্বিধার অঙ্কুর খচখচ করতে লাগলো। চোখে যা সে দেখলো তাই তাদের সম্পর্কের হয়তো সবটা নয়! আরও আছে,—আরও অনেকখানি আছে। কিন্তু কি সে? কোথায় আছে তার পরিচয়? তা সে ভাবতে পারে না, বুঝতে পারে না। কেমন মনে হয়, আছে, আছে, আরও অনেক আছে।

কিন্তু চুলোয় যাক পরচর্চা। কাল সারা দিন সে পথে পথে ঘুরেছে। ভোরেরও বোধ করি আর দেরি নেই। তার পরে তাকে আরও কত ঘুরতে হবে, তাই বা কে জানে? এখন তার ঘুমের প্রয়োজন। অন্ততঃ একটুখানি ঘুমিয়ে তাকে নিতেই হবে।

পাশ বালিশটাকে দুই পায়ের মধ্যে নিয়ে সে ঘুমের চেষ্টায় পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু কোথায় ঘুম! তার বদলে

ঠুক, ঠুক, ঠুক,

ভুজঙ্গ ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো :

- কে ?

—আমি। দরজা খুলুন। ভোর হতে আর দেবি নেই, উঠুন।

ভুজঙ্গ দরজা খুলে দেখলে ব্রততী। ভোর হ'তে আর দেরিও বেশি নেই সত্যি।

ব্রততী বললে, বাথরুমে আপনার জন্যে সাবান, তোয়ালে, মাজন রয়েছে। আপনি আসতে আসতে চা হয়ে যাবে। দেরী করবেন না, যান।

আবার সেই আদেশ !

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তুমি কি সবাইকে দিনরাত্রি কেবল হুকুমই কর ?

—নইলে আপনারা কাজ করেন কই ?

—তা ঠিক !

ভুজঙ্গ হাসতে হাসতে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে দেখলে, টিপয়ের উপর একটি রাশ খাবার। ব্রততী তার বাটিতে চা ঢালছে। তার মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে তার গ্রীবার বঙ্কিমসুন্দর ভঙ্গি।

বিব্রতভাবে ভুজঙ্গ বললে, এত খাবার তো খেতে পারবো না দিদি। ফেরারী হ'লেও আমি তো মানুষ !

—না, আপনারা উট !—ব্রততী হেসে উঠলো।

—উট বলছ কেন ?

—কারণ, মরুভূমির পথে চলতে কোথায় কি খাবার পাওয়া যাবে, তার তো ঠিক নেই। তাই কুঁজে ক'রে তারা খাদ্যের সঞ্চয় রাখে। আপনারাও সেই রকম। বুঝলেন ?

প্লেটটা টেনে নিয়ে ভুজঙ্গ বললে, বুঝলাম। তোমার এই প্লেট আমি নিঃশেষ করবই, যা থাকে কপালে। কিন্তু কেন জানো ?

—কেন ?

—মরুভূমির ভয়ে নয়।

—তবে ?

—তোমার তর্জনীসঙ্কেতস্নিগ্ধ খাবার আবার কবে যে পাব সে তো জানিনে দিদি। সেই আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে যাব।

ব্রততীর ছোট্ট শরীরটা যেন কেঁপে উঠলো। চোখ জলে ভ'রে এলো। ব্যস্ত হয়ে বললে, ও কথা বলবেন না দাদা। যখন যেখানে যে ভাবেই থাকুন, মাঝে মাঝে খবর আমাকে যে-রকমে-হোক দিতেই হবে। নইলে আমি ভারী কষ্ট পাবো।

শাড়ীর আঁচলে সে চোখ মুছলো।

ভুজঙ্গ নির্নিমেষে চেয়ে দেখল :

শ্রী কাঁদে কি? কাঁদে না বোধ হয়। শ্রীকে ভুজঙ্গ কোনো দিন কাঁদতে দেখেনি। তার চোখে শুধু আগুন। কিন্তু ব্রততী কাঁদে। কী সুন্দর কাঁদে! ভুজঙ্গের এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা।

তার চা খাওয়া হয়ে যেতে ব্রততী গত রাত্রের পরিত্যক্ত আচকুন-পায়জামা নিয়ে এল এবং চায়ের পট খাবারের পাত্র নিয়ে চলে গেল। ফিরে এসে ওর পোষাক দেখে হেসে ফেললে।

বললে, চমৎকার সাজ হয়েছে! মোটেই চেনা যাচ্ছে না।

তারপর বললে, আপনার জামাটা যেমন বড়, ওর পকেটও নিশ্চয় সেই রকম।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, হাত চালাবার প্রয়োজন হয়নি কোনো দিন। তবে হওয়াই সম্ভব। কেন বল তো?

কাঁচুমাচু ক'রে ব্রততী বললে, দু'টো আম দিতাম।

ভুজঙ্গ হেসে ফেললে! বললে, সম্প্রতি আমি এক হাজারী মনসবদার। আমের অভাব ঘটবে না। তবু আজকে তুমি যা দেবে, আমি না বলব না।

—ঠিক?

—ঠিক।

—যদি আমার গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিই?

এক মুহূর্ত ভুজঙ্গ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর বললে, নোব। কিন্তু আজ নয়। প্রয়োজন হ'লে নিঃসঙ্কোচে নোব কথা দিলাম।

খুশিতে ব্রততীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। বললে, কথা দিলেন, মনে থাকে যেন।

—থাকবে। কিন্তু নৃপেন কোথায় ব্রততী? ঘুমুচ্ছে?

—হ্যাঁ। সে একটা দেখবার জিনিষ। এমন নিশ্চেতন ঘুম বড় একটা দেখা যায় না। আবার ওঠামাত্রই বম্বে মেলের এঞ্জিন। বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে চ'লে যাবেন। সেও একটা দেখবার জিনিষ।

দুজনেই হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ বললে, তাহ'লে ওর সঙ্গে আর দেখা হোল না। বোলো ওকে আমার কথা। ভারি আনন্দে কাল রাতটা কেটেছে।

—বলব। ওই আপনার বাহন এসেছেন।

ব্রততীর কথা শেষ হবার আগেই চোখ মুছতে মুছতে বিপিনচন্দ্র এসে উপস্থিত। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ব্রততী বললে, বেশ করেছিলে। এখন দাদার জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এস।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, কতদূর যাবেন?

—কতদূর?—চিন্তিতভাবে ভুজঙ্গ বললে,—বোলো এস্‌প্ল্যানেডের কাছ বরাবর। ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড কি কাছেই?

—বড় রাস্তার মোড়ে। তাহ'লেও বেশি দেরি হবে না আমার।

বিপিন চলে গেলে ভুজঙ্গ বললে, যদি কোনোদিন সময় পাই, একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দোব ব্রততী। এমন মেয়ে তুমি দেখনি।

কৌতুহলী হয়ে ব্রততী পট্ করে জিজ্ঞাসা করলে, কে মেয়ে দাদা? আমাদের হবু বৌদি নন তো?

ভুজঙ্গ হেসে ফেললে। বললে, না। তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করেন। এমন দুঃসাহসী মেয়ে কম দেখা যায়। আমরা দুজনে গা ঢাকা দিয়ে আমাদের একটি বন্ধুর বাড়িতে আছি। কিন্তু ঘটনাচক্রে দু'দিন আমি সেখান থেকে বাইরে রয়েছি।

ব্রততী ব্যস্ত হয়ে বললে, আহা! তাহ'লে তাঁরা হয়তো আপনার সম্বন্ধে কতই ভাবছেন! আপনি সব চেয়ে আগে সেইখানে যান।

—তাই যাব। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো, কাল তাঁর স্বামী মিলিটারীর আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছেন। তিনি যে কেমন রইলেন, সে খবরও নেওয়া দরকার। অথচ হাসপাতালে আমার নিজের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ব্রততী বললে, তার জন্যে কি! আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে তাঁর খবর আনিয়ে দিচ্ছি। কি তাঁর নাম?

—শুভেন্দু বাবু।

—কিন্তু খবরটা আপনাকে জানাব কোথায়?

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে ভুজঙ্গ বললে, আজ বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মাঠে হয় আমাকে, নয় আমারই মতো পোশাক-পরা একটি মুসলমান ভদ্রলোককে সে ব'সে থাকতে দেখবে। তার লাল ফেজটা মাথার বদলে থাকবে হাতের মধ্যে কোলের উপর। নাম মোদাব্বের। তাকে বললেই চলবে।

—সেই ব্যবস্থা করব।

এমন সময় বিপিন এসে জানালে, ট্যাক্সি এসেছে।

ভুজঙ্গ বললে, তোমার জন্যে একটি গুরুতর কাজের ভার দিয়ে গেলাম বিপিন। তোমার বৌদির কাছ থেকে জেনে নিও ব্যাপারটা। আচ্ছা, তাহ'লে আমি চললাম।

ব্রততী এবং বিপিন দুজনেই নত হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

ছলছল চোখে ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে আসবেন দাদা?

—তা তো বলা মুস্কিল ভাই। তবে শিগগির আসার চেষ্টা করব। সব চেয়ে মুস্কিল কি জানো, আমার ঘন ঘন আসা তোমাদের পক্ষে নিরাপদও নয়। তবে কলকাতার বাইরে যদি পালাতে না হয়, তাহ'লে এর মধ্যে একদিন এসে দেখে যাব তোমাদের। আচ্ছা ভাই।

বাইরে ট্যাক্সি ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে। ভুজঙ্গ নেমে আসতে আসতে পিছন ফিরে চেয়ে বললে, নৃপেনকে বোলো আমার কথা।

ব্রততী সাড়া দিলে না—বোধ করি সাড়া দেবার অবস্থা তার নয়, শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

দশ

উপর্‌পরি দু'রাত্রি ভুজঙ্গ অনুপস্থিত হওয়ায় শ্রী ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এবং মনের সে উদ্বেগ হালকা করবার জন্যেই সে যেন জোর ক'রেই মোদাক্কেরের পিছনে লাগলো।

চিন্তার কারণ যথেষ্টই ছিল।

ভুজঙ্গ বাংলা কংগ্রেসের একেবারে প্রথম শ্রেণীর নেতা না হ'লেও দুঃসাহসী এবং দুর্দান্ত কর্মী হিসাবে পুলিশ মহলের বিশেষ ভয়ের বস্তু। সবাই তাকে খুব ভালো ক'রেই চেনে। সম্ভবতঃ তাকে খোঁজবার জন্যে সহর তোলপাড় করছে তারা। সুতরাং মুসলমানী বেশ যতই নিখুঁত হোক, পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা প'ড়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

যদি কোনক্রমে ধরা প'ড়েই যায়, তাহ'লে কে কোথায় লুকিয়ে আছে জানবার জন্যে তার উপর যথেষ্ট অত্যাচারও হ'তে পারে। শ্রী খবর পেয়েছে এ রকম না কি হচ্ছে কিছু কিছু। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি ভয়ানক মিলিটারীর ভয়। পার্টির কাজে কাল শ্রী একবার বেরিয়েছিল বাইরে। নিজের চোখে বিশেষ কিছু অবশ্য সে দেখেনি। কারণ বড় রাস্তা যথাসম্ভব সে এড়িয়েই চলেছিল। কিন্তু শুনে যা এলো তা সাংঘাতিক।

বিদেশী সৈনিক। এ দেশের লোকদের সঙ্গে পরিচয়ই নেই তাদের। কে কি তাও জানে না। তার উপর যুদ্ধের প্রয়োজনে এদের নিম্নতম প্রবৃত্তিগুলোয় শান দিয়ে পশু ক'রে তোলা হয়েছে। সুতরাং খেলাচ্ছলে খামোকা মারছে পথচারীদের। যারা ইউরোপ বা উত্তর আফ্রিকায় জার্মানদের কাছ থেকে মার খেয়ে এখানে এসেছে বিশ্রাম নিতে, তারা পরমানন্দে জার্মানদের মারের শোধ তুলছে নির্বিচারে নিরীহ নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর।

শ্রীর ভয়, মিলিটারীর গুলীতে ভুজঙ্গ যদি মারা যায়, তাহ'লে অপূরণীয় ক্ষতি হবে এই অগষ্ট বিপ্লবের।

যদিও তেমন কিছু ঘটেছে ব'লে তার মনে হয় না,—কারণ ভুজঙ্গ নিহত, আহত বা ধৃত হ'লে, সেকথা খবরের কাগজে না বেরোক, বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হোত না,—তবু আশঙ্কার হেতুও যথেষ্ট আছে।

তাই শ্রীর মন ভিতরে ভিতরে খুবই পীড়িত হচ্ছে। তবু মোদাব্বের তার ঘরে এসে বসতেই বললে, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, রাত্রে কি ঘুম একেবারেই হচ্ছে না?

এ প্রশ্নের মোদাব্বের জবাব দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি তো কাল অনেক ঘুরলেন। কোথাও কোন খবর পেলেন না?

—না। সে সব জায়গায় তিনি যান নি।

—কোথায় তিনি যেতে পারেন, কিছু অনুমান করতে পারেন না?

—পারি। কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন?

শ্রী হেসে বললে, তা বলতে পারবে না। এইটুকু বলতে পারি, স্ত্রীলোকের পক্ষে সে সব জায়গায় যাওয়ার অসুবিধা আছে।

—আমি যেতে পারি না?

—পারেন, কিন্তু সে ঝুঁকি আপনি নিতে যাবেন কেন?

—যদি নিতে রাজি হই?

কথাটা মোদাব্বের একটু বেশি জোরের সঙ্গেই বললে যেন। শ্রী একটু বিস্মিত না হয়ে পারলে না।

ওদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে মোদাব্বেরের কোনো সংযোগ নেই। বরং লীগের প্রচারকার্যের ফলে সে মনে করে, কংগ্রেসের আন্দোলন হিন্দুর আন্দোলন, এবং এই বিপ্লব সাফল্য লাভ করলে রাষ্ট্রশাসনে হিন্দুরা প্রবল হবে। সেটা মুসলিম স্বার্থের বিরোধী। কিন্তু যুক্তি যত উগ্রই হোক, তার জোর রক্তের চেয়ে বেশি নয়। হিন্দু এবং মুসলমানের ধমনীতে একই রক্ত বইছে। ভুজঙ্গ এবং মোদাব্বের একই মৃত্তিকার উপর পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। উভয়ে উভয়ের বন্ধু। তাই রাজনীতির বাণী যত বড়ই হোক, হৃদয়ের বাণীকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি।

কিম্বা সেইটেই হয়তো মোদাব্বেরের পক্ষে তাকে আশ্রয় দেবার সবটা কারণ নয়। রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যতই আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করুন না কেন, এই দেশ যে হিন্দু এবং মুসলমান এবং খৃষ্টান এবং বৌদ্ধ সকলেরই মিলিত জন্মভূমি, এই চৈতন্য সে বোধ করি একেবারে কখনও হারায় না। তার দীপ্তি সমস্ত কুজ্ঝটিকা জাল ভেদ ক'রে হঠাৎ এক সময় হয়তো ঝিলিক দিয়ে উঠে মানুষের শুভ বুদ্ধিকে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উন্নীত করে।

মোদাব্বেরেরও কি তাই হোল?

নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রী শান্তকণ্ঠে বললে, দেখি আজকের দিনটা। তার পর প্রয়োজন হোলে আপনাকেই যেতে হবে।

—সেলাম আলেকুম!

সে কণ্ঠস্বরে তু'জনেই চমকে পিছন ফিরে দেখলে, লাল কেশ শুষ্ক মাথাটা ঘরের ভিতর চালিয়ে দিয়ে ভুজঙ্গ হাসছে।

মোদাব্বের লাফিয়ে উঠে ওকে প্রাণপণ বলে জড়িয়ে ধরে বললে, আচ্ছা ভাবিয়ে তুলেছিলে যাহোক! একটা খবর তো দিতে হয়।

ভুজঙ্গ বললে, কি ক'রে দোব? তোমার কি টেলিফোন আছে? যাই হোক, একটু চা খাওয়াও দিকি?

শ্রী চা তৈরি করতে গেল।

মোদাব্বের ভাবের আবেগে তার দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের পরিমাণটা বিস্তৃতভাবে জানাতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, একটা খুব উদ্বেগজনক খবর আছে মোদাব্বের।

মোদাব্বেরের উদ্দীপ্ত মুখখানা যেন দপ ক'রে নিভে গেল! শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি উদ্বেগজনক খবর?

ভুজঙ্গ বললে, তুমি শুভেন্দুবাবুর নাম আমার কাছে শুনেছ। শ্রীর স্বামী। কাল তুপুরে মিলিটারী তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তিনি হাসপাতালে।

মোদাব্বের ভুজঙ্গের সম্বন্ধেই এই রকম আশঙ্কা করছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ-ভাবে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, আঘাত কি খুব বেশি? এখন কেমন আছেন খবর পেয়েছ?

—আঘাত বেশি ব'লেই আমার বোধ হোল। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে খবর আর আমি আনতে পারিনি। জানোই তো, আমার পক্ষে যাওয়া নিরাপদ হোত না, শ্রীর পক্ষেও তাই। আমি তাই এখানে আর না ফিরে বরাবর গিয়েছিলাম শুভেন্দুর বোনের বাড়ি। তাঁরা তখনই ছুটলেন হাসপাতালে। আমি ফিরছিলাম এখানে। পথে পুলিশ পিছু নিয়েছে ব'লে সন্দেহ হোল। ঢুকলাম একটা গলির ভিতর, এমন সময় বৃষ্টি নামলো। পাশের একটি বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। পরে জানলাম আমারই একটি বন্ধুর বাড়ি। রাত্রিটা সেইখানে কাটিয়ে এই আসছি।

মোদাব্বের বললে, বিকেল নইলে তো হাসপাতালে যেতে দেবে না। আমার তো ছুটি ছ'টায়। কি ক'রে খবর আনা যায় বলো তো?

—তারও ব্যবস্থা করেছি। আপিসের ছুটির পর তুমি সটান চলে যাবে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। আজ তুমি অফিসে যাবে আমার মত একটা কালো আচকুন প'রে। মাথার ফেজটা দু'হাতের মধ্যে কোলের উপর নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মাঠে নিঃশব্দে ব'সে থাকবে। তোমাকে দেখে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে তোমার দিকে এগিয়ে আসবে, তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলে নাম বোলো। সে তোমাকে খবর দেবে।

শ্রীকে চায়ের পেয়ালা হাতে আসতে দেখে মোদাব্বের তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললে, ঠিক আছে, তাই হবে। আমি উঠি, অফিস আছে।

মোদাব্বের উঠে গেলে ভুজঙ্গ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, তোমরা খুব ভাবছিলে শুনলাম?

—যা মিলিটারীর উৎপাৎ! ভাবনা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

—সত্যি।—ব'লে একটা অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে ভুজঙ্গ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলো।

তারপরে নিঃশেষিত পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে দিয়ে একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে শ্রীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, একটা দুঃসংবাদ আছে শ্রী।

—কি ?

তখনই তখনই ভুজঙ্গ খবরটা দিতে পারলে না। একটু ভেবে বললে শুভেন্দুবাবু আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন।

মুহূর্তকাল শ্রীর শরীরটা যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে রইল।

ভুজঙ্গ বললে, গুলির আঘাত নয়। মনে হোল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরেছে মাথায়। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কাজেই খুব গুরুতর হবে না বলেই আশা করি।

শ্রী কথা বললে, যেন বহুদূর থেকে: তাঁর কাছে কেউ নেই বোধ করি।

—ঘটনার ঠিক পরেই আমি সেখানে পৌঁছুই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠিয়েই আমি নিজে গিয়ে ওঁর বোন আর ভগ্নিপতিকে খবর দিই। তাঁরা তখনই হাসপাতালে চলে যান।

শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে শ্রী শিথিলভাবে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ব'সে রইল। ভুজঙ্গ ওকে বিরক্ত করলে না, বরং ওকে সামলে নেবার সময় দেবার জন্যে যেন নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে ভুজঙ্গ ধীরে ধীরে বললে, আমি হাসপাতালে যেতে সাহস করিনি। তোমারও যাওয়া বোধ হয় নিরাপদ হবে না।

শ্রী বুঝলে সে কথা। ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—তবে বিকেলেই খবর পাওয়া যাবে, সে ব্যবস্থা করেছি।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, কখন এ কাণ্ড ঘটলো ?

—কাল দুপুরে।

শ্রী আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। চুপ ক'রে ব'সে রইল। খানিক পরে হঠাৎ বললে, মোদাব্বের সাহেবের স্নান হয়ে গেল বোধ করি। আপনিও স্নান ক'রে নিন না ভুজঙ্গবাবু। এক সঙ্গে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে একটা ঝামেলা চোকে। অসুবিধা হবে ?

—না, অসুবিধা কিসের ? আমি এখনই স্নান করে নিচ্ছি ।

ব'লে ভুজঙ্গ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকলো।

আহারাদির পরে মোদাব্বের চ'লে গেল অফিস। গতরাত্রে ভুজঙ্গের ঘুম হয়নি বললেই হয়। যে সময় চোখ কেবল টেনে এসেছে, ঠিক সেই সময়েই এন্তী তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। দুপুরে কাজও বিশেষ ছিল না। সুতরাং একটা লম্বা ঘুম দেবার এ সুযোগ সে ছাড়লে না। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

শ্রীও চলে এল তার শোবার ঘরে। এসে খিল বন্ধ ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়লো। বহু ভাবের শাবলো তার চিত্ত উৎক্ষিপ্ত। তার নিরীহ, নিরপরাধ স্বামীকে অকারণে মেরেছে ইংরেজের মিলিটারী। এর প্রতিশোধ সে নিচ্ছে, নেবেও। প্রয়োজন হলে সে নিজের হাতেও নেবে না হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় চিন্তা হচ্ছে হাসপাতালে কেমন আছেন তিনি, কেই বা দেখছে।

তার চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছে সেই সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন শান্ত মুখচ্ছবি। যন্ত্রণা যতই হোক, তার মুখ থেকে এতটুকু কাতরোক্তি বার হবে না। নার্সেরা তার স্বামীকে তো চেনে না। তারা তো জানে না, নিজের প্রয়োজনে কাউকে তিনি সহজে ক্লেশ দিতে চান না। নিজে উঠে কুঁজো থেকে জল ঢেলে খাবার শক্তি যদি না থাকে, তাহ'লে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও তিনি কারও কাছে এক গ্লাস জল চাইবেন না। কিন্তু নার্সেরা কি তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারবে, কখন কোন জিনিসটির তাঁর আবশ্যক হবে ?

নার্স কেন, পারবেন শঙ্কর ? পারবেন তার নিজের বোন ইলা ?

কেউ না। কারও সাধ্য নেই। এ পারে একা শ্রী, আর কেউ না।

উত্তেজনায় শ্রী উঠে বসতেই তার হাতটা গিয়ে ঠেকলো পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সেইখানটিতে যেখানে পরম স্নেহে একদিন শুভেন্দু জলপটি বেঁধে দিয়েছিল।

ওখানকার আঘাতটিকে কোনো দিনই শ্রী বিশেষ গ্রাহ্য করেনি। তার অবসরও ছিল না। ওদিকে চাবওনি কখনও। অনেকদিন পরে আজ চেয়ে দেখলো নখের প্রান্তে এখনও কালো রক্ত শক্ত হয়ে জমে রয়েছে।

অকস্মাৎ তার চোখের আগুন যেন স্তিমিত হয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ বেয়ে নামলো অশ্রুর বন্যা।

ব্যথা কি এখনও রয়েছে সেখানে?

চারটে বাজলো।

পাশের ঘরে ভুজঙ্গের নড়াচড়ার যেন শব্দ পাওয়া গেল। শ্রী এল তার ঘরে। বললে, ভাবছি হাসপাতালে যাব একবার।

ভুজঙ্গ বিস্মিত হোল। একটু বিরক্তও হোল বোধ করি। কিন্তু সে ভাব চেপে সহজ কণ্ঠে বললে, যাওয়া কি নিরাপদ হবে?

—সম্ভবত হবে না।

—তাহ'লে?—ভুজঙ্গ অপাঙ্গে চেয়ে হাসলে।—শুভেন্দুবাবুকে দেখতে হাসপাতালে যেতে পার, পুলিশের পক্ষে এমন অনুমান করা শক্ত নয়। তোমাকে যারা চেনে সাদা পোষাক-পরা এমন পুলিশ হয়তো তোমার জন্যে সেখানে অপেক্ষাও করছে। নয় কি?

শ্রী বললে, যদি করে, তাহ'লে তাদের আজ আর রক্ষা নেই। আমার হাতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

ওর দিকে চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভুজঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে রইল। কার কাছে সে যেন একটা গল্প শুনেছিল, কোনো শিকারী একটা বাঘকে মারবার পর তার বাঘিনী এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল যে, স্থানীয় লোকদের কিছুকাল বাইরে বেরুনো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

একটু ভেবে ভুজঙ্গ বললে, তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, আসলে তুমি তোমার স্বামীর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছ।

—তাও মনে করতে পারেন।

ভুজঙ্গ শুয়ে ছিল, সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, যে ছেলেরা ট্রামের তার কাটছিলো, যাদের জন্যে তোমার স্বামী মার খেলেন, তাদেরও আমি ঠিক ওই কথা বলেছিলাম: এর শোধ নাও তোমরা। যত রক্ত আমাদের ওরা ফেলবে,

তার দ্বিগুণ নিজেদের রক্ত ফেলে ওদের যেতে হবে। জমাখরচে গোলযোগ যেন না হয়। কিন্তু সেকথা তোমাকে তো বলতে পারছি না।

—কেন পারছেন না?

—তার কারণ তোমার সামনে আরও বড় কাজ রয়েছে। ব্যক্তিগত রাগ-রোষ, লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে তোমার স্থান।

শ্রী শক্ত হয়ে সামনের চেয়ারটায় বসলো: এ আপনার পুঁথি-পড়া কথা ভুজঙ্গবাবু। ব্যক্তির ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। আমি যে আমার দেশকে ভালোবাসি সেও লাভ-ক্ষতির হিসাব ক'রে নিতান্ত ব্যক্তিগত ভালোবাসাই। তার বেশী আর কিছু নয়।

ভুজঙ্গ বললে, কিন্তু তুমি গ্রেপ্তার হোলে এই আন্দোলনের কতখানি ক্ষতি হবে সেও ভাববার কথা নয় কি?

—তাও ভেবেছি। আমি গেলে কিছুই ক্ষতি হবে না। এই আন্দোলনে আমি সামান্য একজন কর্মী মাত্র। এমন অসংখ্য কর্মী আপনাদের রয়েছে। অন্যদিকে ভেবে দেখুন, আমি না গেলে কে ওঁকে দেখবে? আপনি তো জানেন কারও কাছে সেবা উনি নিতে চান না। কাউকে বলবেন না, কি ওঁর প্রয়োজন। আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না, কখন কোন জিনিসটি ওঁর দরকার। সমস্ত ভেবেই যেতে চাচ্ছি ভুজঙ্গবাবু,- উত্তেজনার বশে নয়।

ভুজঙ্গ বললে, কিন্তু তোমাকে তো হাসপাতালে থাকতে দেবে না। তা ছাড়া আঘাত গুরুতর না হোলে তাঁর বোন তাঁকে নিয়েও যেতে পারেন। আমি আজ বিকেলেই খবর পাবো, তিনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন। তুমি এই বেলাটা অপেক্ষা কর। তার পরে যদি বোঝ, তোমার যাওয়া দরকার, আমি বাধা দোব না।

এ যুক্তি মন্দ নয়।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি কাউকে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন?

—পাঠিয়েছি। মোদাব্বের ফিরলেই সব জানতে পাবে।

এর পরে শ্রী আর জেদ করলে না।

ভাবপ্রবণতায় শ্রী তাদের আন্দোলনকে নষ্ট করতে বসেছিল। ওর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে ভুজঙ্গ ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হচ্ছিল। তার মুখে এসে যাচ্ছিল একটা কথা : স্বামীর উপর এতই যদি দরদ তোমার, তাহ'লে স্বামীকে ছেড়ে এলে কেন এ পথে? সেবা কি শুধু আহত, পীড়িত, শয্যাগত স্বামীরই প্রযোজন? সুস্থ স্বামীর কি সে প্রযোজন নেই?

কিন্তু শ্রীর বেদনার্ত মুখের দিকে চেয়ে ভুজঙ্গ নিজেকে সংযত করেছিল।

সন্ধ্যার মুখে মোদাব্বের এল। খবর খারাপ নয়। আজকে শুভেন্দুকে ওরা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ইলা এসে ওঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই।

কিন্তু দুঃসংবাদের প্রথম ধাক্কাটা শ্রী এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। মোদাব্বেরের দেওযা সংবাদে তার বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং তাকে যেন কিছু লজ্জিতই মনে হোল।

মোদাব্বের চলে গেলে সে বললে, হঠাৎ কেমন একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম ভুজঙ্গবাবু। আমাকে মাপ করবেন।

ভুজঙ্গ সেকথার আর জবাব দিলে না। বললে, একটা ট্যাক্সি ক'রে শঙ্করবাবুর ওখান থেকে বরং একটু ঘুরেই এসো।

শ্রী বললে, কি ক'রে হয? তপতীদের ওখানে বাইরের ক'টি মেয়ে আসবে। তাদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

—ও পর্ব শেষ হবে ক'টায়?

—ধরুন আটটায়।

—বেশ। আমাদের পালাসিংকে ব'লে রাখছি। সে ঠিক আটটায় তপতীদের গলির মোড়ে ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকে তোমাকে শঙ্করবাবুদের বাড়ী পৌছে দেবে এবং নিয়ে আসবে।

শ্রী বললে, ভালোই তো আছেন। তাড়া কি?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তিনি ভালোই আছেন। কিন্তু একবার তাঁকে দেখে না এলে তুমি ভালো ক'রে কাজে মন দিতে পারবে না।

লজ্জিত হাস্যে শ্রী উত্তর দিলে, বিয়ে তো করেননি   আপনি কি বুঝবেন ?

—তাহ'লে তোমাকে বলি শ্রী, কাল থেকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

বিস্মিতকণ্ঠে শ্রী প্রশ্ন করলে, হঠাৎ কাল থেকে কেন ?

—কারণ কালকেই ব্রততীকে প্রথম দেখলাম।

—তিনি কে ?

—তাঁর কথা পরে বলব। কিন্তু হাসির কথাটা শোন : এতটা বয়স পর্যন্ত শুধু রাজনৈতিক সমস্যারই চুলচেরা বিচার ক'রে এসেছি। পুরুষমানুষ-মেয়েমানুষ সবাইকেই শুধু মানুষ ব'লেই দেখে এসেছি। মাঝে মাঝে সমান্তরাল চললেও কিংবা এক এক জায়গায় মিললেও তোমাদের এবং আমাদের পথ যে এক নয়, কেন এ প্রশ্ন মনে এল, তা তোমাকে বলতে পারব না। প্রশ্নটা নিতান্তই আচমকা এসেছে, কোনো বাঁধা সড়কে আসেনি। এসে পর্যন্তই তোমাদের, মানে যে-মেয়েরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে খুব সন্ত্রস্ত হয়েছি,—পুরুষের অন্ধতায় পাছে তাঁদের উপর অবিচার ক'রে বসি, সেজন্যে সতর্কও হয়েছি।

শ্রীর বিস্ময় এবং কৌতুকের আর শেষ রইল না। বললে, এসব কী গোলমেলে কথা বলছেন ভুজঙ্গবাবু ? এ রকম তো আগে বলতেন না।

—না। গোলমালটা কাল শেষ রাত্রি থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তাই তো বলছি, আজ রাত্রে শুভেন্দুবাবুকে তুমি দেখে এস।

শ্রী হেসে ফেললে। বললে, কিন্তু তার ফলে আপনার আচরণের বিশেষ যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে, তা তো মনে হয় না। যখন বুঝতেন না তখনও ছিল যে জেদ, এখনও রয়েছে সেই জেদ ! দেখতে আমাকে যেতেই হবে ?

হাইকোর্টের জজের মতো ভুজঙ্গ রায় দিলে, হ্যাঁ। এক দিনের চেষ্টায় আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, নইলে তাঁরও মন ভালো হবে না,—তোমারও না। অতএব তুমি যাও। শুভাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

এগারো

তপতীদের বাড়িতে যারা এসেছিল, তাদের মেয়ে না ব'লে অগ্নিশিখা বললেই ভালো হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে তারা এসেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বিশেষ ক'রে মেদিনীপুরে যে অত্যাচার চলছে তার বর্ণনা দিতে দিতে তারা প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিলো। সৈন্যেরা এমনিতেই পশু। তার সঙ্গে জুটেছে দেশী পুলিশ আর সাম্যবাদীর দল। রাশিয়ার মুখের দিকে চেয়ে এই মহাযুদ্ধকে তারা জনযুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করেছে এবং এর বিঘ্ন হ'তে পারে এমন কোনো কিছু তারা সহ্য করবে না, বরং সর্বপ্রকারে সেই শক্তিকে চূর্ণ করতেই দৃঢ় সংকল্প।

দেশী পুলিশের রূপ সর্বত্র এক নয়। এই কলিকাতা সহরে তারা প্রায় নিস্ক্রিয় নীতিই গ্রহণ করেছে। ইংরাজিতে Communication বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ রেল, ট্রাম, ডাক ও তার বিভাগের বিরুদ্ধেই কংগ্রেসের প্রধান অভিযান। তারা যেখানে সুবিধা পাচ্ছে সেইখানে রেললাইন তুলে ফেলছে, ট্রামের তার কাটছে। ট্রামে এবং ডাকবাক্সে আগুন দিচ্ছে, টেলিগ্রামের তার কাটছে। কলিকাতায় পুলিশ এসব দেখেও দেখছে না। কর্তৃপক্ষ তাদের উপর জবরদস্তি করতে সাহস পাচ্ছেন না।

বাইরে মিত্রপক্ষ তখন সবত্রই হারছে। জাপানীরা বর্মায় এসে পড়েছে। যে কোনো দিন তারা ভারতে এসে পড়তে পারে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গের চাল জাপানীদের হস্তগত হওয়ার ভয়ে সরিয়ে ফেলেছেন। পুলিশ জানে সেকথা। বৃটিশ রাজশক্তির উপর তারা ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। বুঝেছে, মিথ্যা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যাওয়া। এদের হাতেই হয়তো শাসনক্ষমতা আসবে। কিংবা যে বৃটিশ রাজশক্তির ভরসায় তারা স্বদেশীয়দের উপর অত্যাচার করতে সাহস পেত, পায়ের তলা থেকে সেই শক্তির দাপটা অপসৃয়মান দেখে, তাদেরও মনে হয়তো দেশপ্রীতির ছোঁয়াচ লেগেছে!

যাই হোক, তপতীদের বাড়ীর সভায় আগুনের হল্‌কা ছুটতে লাগলো। যারা বলে আর যারা শোনে সবাই উত্তেজিত। পালা সিং মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি নিয়ে চুপচাপ ব'সে। কিন্তু তারও ধৈর্য থাকছে না। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি রেখে তপতীদের বাড়ীতে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে, সভাভঙ্গের আর বিলম্ব কত।

এই রকম বারকয়েক ঘোরাঘুরি করার পরে রাত্রি নয়টায় সভা ভাঙলো। পালা সিং তার ট্যাক্সিতে, যেন যাত্রীর প্রতীক্ষায়, নিঃশব্দে গিয়ে বসলো। শ্রীও একটু পরে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে বসলো। অপাঙ্গে তার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে পালা সিংও শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

বস্তুতঃ শ্রীর মন থেকে শুভেন্দুকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহ অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। সভায় বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যা সে শুনে এলো তার পরে নীড়ের মায়া, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সমস্ত যেন সেই আগুনে বাষ্প হয়ে কোথায় উবে গেছে। তার সমগ্র সত্তা যেন একটা অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলছে।

ভুজঙ্গের নির্দেশমত ট্যাক্সি চলছে।

কিন্তু শ্রীর যেন কোনো চৈতন্যই নেই। তার মনশ্চক্ষের সামনে আহত দেশজননী যেন রক্তের সমুদ্রে ভাসছে। রক্ত, রক্ত, শুধুই রক্ত ঝলকে-ঝলকে প্রবাহিত হয়ে শুধু তার স্বদেশ নয়, শুধু এই পৃথিবী নয়, একটা শতাব্দীকে কর্দমাক্ত ক'রে তুলেছে।

সেই অবারিত সীমাহীন রক্তসমুদ্রের বাইরে আর কিছুই তার চোখে পড়ছিল না,—স্বামী না, আত্মীয়-বন্ধু না, কিছু না। সত্যি বলতে গেলে কিছুই তার অনুভূতিতে যেন দাগ কাটছিল না। তার মন যেন নির্বাত, নিস্তরঙ্গ হয়ে গেছে।

—মাঈজি!

শ্রীর সম্বিত ফিরে এল পালা সিংএর ডাকে। চেয়ে দেখলে, গাড়ী ইলাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রী দরজা খুলে নেমে পড়লো।

পান্না সিং জিজ্ঞাসা করলে, কয় বাজে ফিন আবেঙ্গে মাঈজি ?

শ্রী বিব্রতভাবে কী যেন একটু চিন্তা করার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, নেহি, তুম রহ্‌ যাও ! ম্যয় আভি লোটেঙ্গী।

ইলাদের বড় শোবার ঘরে খাটের উপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুভেন্দু শুয়ে। ইলা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চামচ ক'রে ফলের রস খাওয়াচ্ছিল।

শ্রীর পায়ের শব্দে পিছন ফিরে একবার চেয়েই সে আবার নিঃশব্দে ফলের রস খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু শুভেন্দুও ওকে দেখতে পেয়েছিল। দেখামাত্র ওর চোখ যেন আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠলো।

অস্ফুট স্বরে ইলাকে বললে, শ্রী এসেছে।

শ্রী কাছে আসতেই একখানা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু হাসলে। বললে, বেশ ঘায়েল করেছে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সুতরাং আঘাত দেখবার কোনো উপায় ছিল না।

শ্রী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে ইলাকে, জ্বর আসে না তো ?

ইলার বদলে উত্তর দিলে শুভেন্দু। বললে. কাল থেকে আর জ্বর আসে না। খুব দুর্বল, তবে ডাক্তার যে উঠতে একেবারে নিষেধ ক'রেছেন, সেটাও বাড়াবাড়ি। না ইলা ?

ইলা নার্সে'র মত গম্ভীরভাবে দাদাকে ধমক দিলে, কথা তুমি মোটে কইবে না দাদা।

শ্রী বুঝলে, আসলে ব্যাপারটা রাগের। শ্রীর উপর ইলা চটেছে। কেন ? তার দাদাকে ছেড়ে সে রাজনীতি করতে গেছে, সেই জন্যে ? কিন্তু রাজনীতি কি সে এই প্রথম করতে গেল ? শুভেন্দুকে যে সৈন্যেরা প্রহার করেছে, সেজন্যে কি সে দায়ী ? অথবা এ কি ভাজের উপর ননদের সনাতন ঈর্ষা ?

কারণ যাই হোক, অভিমানে শ্রীর বুক ভ'রে গেল। শুভেন্দুর হাতখানি তখনও তার হাতের মধ্যে।

বললে, তোমার আঘাতের কথা আমি কাল সন্ধ্যায় শুনেছি। তখনই খবর পেলাম, ইলাদের এখানে আনা হয়েছে তোমাকে। এখন তো অনেকটা ভালো দেখছি। আমার কি রাত্রে এখানে থাকা দরকার হবে ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইলা উত্তর দিলে, তোমার ভারতোদ্ধার কি একটা রাত্রিও অপেক্ষা করতে পারে না ?

শ্রী দৃপ্তকণ্ঠে বললে, না। একটা রাত্রি কেন, একটা মুহূর্তও না। আমার যে কত কাজ সে তুমি বুঝবে না। তবু প্রয়োজন থাকলে আমি রাত্রিটা এখানে থাকতে পারি। প্রয়োজন না থাকলে আমাকে অকারণ আটকিও না।

ব'লে শুভেন্দুর মুখের দিকে চাইলে। তার মুখে সেই সহজ, সুন্দর হাসি।

আস্তে আস্তে বললে, তোমার কাজ থাকলে আটকাব না। কিন্তু তেমন গুরুতর কাজ যদি না থাকে,

শুভেন্দু চুপ ক'রে গেল। বললে না, থাকো। কিন্তু এইটুকু শুনেই শ্রীর বুকে থেকে যেন প্রচণ্ড একটা বাষ্পের চাপ তার চোখের স্নায়ু শিরায় এসে ধাক্কা দিতে লাগলো।

সেই ধাক্কা সামলাবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বললে, তাহলে ট্যাক্সিটাকে বিদায় ক'রে আসি দাঁড়াও।

ট্যাক্সি বিদায় দিয়েই কিন্তু তখনই তখনই সে ফিরতে পারলো না। তার পায়ের নিচের মাটি এবং মাথার উপরের আকাশ যেন ঘুরছে। কাল সমস্ত দিন সে ভেবেছে যে, তাকে ছাড়া শুভেন্দুর চলছে না, সে ছাড়া আর কেউ শুভেন্দুকে চেনেনা, তার মনের কথা বোঝে না, তার শুভেন্দুর কাছে থাকা একান্তই আবশ্যক। এখন বুঝেছে, সেবার জন্যে তার প্রয়োজন তত বেশি নয়। তবু প্রয়োজন যে তার রয়েছে, তা শুভেন্দুর চোখের চাওয়াতেই বোঝা যায়। কিন্তু শ্রীর মন তাতে ভরে না। কেন ? কে জানে কেন ?

একটা দীর্ঘশ্বাস তার নিজেরই অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে ফিরে এসে খাটের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসলো শুভেন্দুর পা-তলার দিকে। ধীরে ধীরে ওর পায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

ইলা একবার এসে শুভেন্দুর গায়ের চাদরটা ঠিক ক'রে দিয়ে চলে গেল। শ্রীর দিকে চাইলে কিনা বোঝা গেল না।

শ্রী মাথা নিচু ক'রে পায়ে হাত বুলোচ্ছিল, হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দেখলে, শুভেন্দু একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই শুভেন্দু বললে, তোমার থাকা-খাওয়ার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—না তো।

—কিন্তু তোমার শরীর খুব খারাপ দেখাচ্ছে। খাটুনি বোধ হয় বেড়েছে খুব। না ?

—তা একটু বেড়েছে।

শুভেন্দু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললে, হুঁ।

ইলা এসে বললে, এইবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দাদা। দু' রাত্রি ঘুমোওনি। বৌদি, দু'টি খেয়ে নেবে চলো।

শ্রী ইলার দিকে চেয়ে হাতজোড় ক'রে বললে, আমি খেয়েই বেরিয়েছি ভাই।

ইলা গুম হয়ে ওর দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। তারপর বললে, রেগে বলছ না তো ?

শ্রী হেসে বললে, না। রাগের কি আছে ? তুমি নিশ্চিন্তে খেতে যাও। তোমার দাদাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি না।

এ রসিকতায় ইলা যোগ দিলে না। তেমনি গুম হয়েই বেরিয়ে গেল।

শ্রী শুভেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ঘুম হচ্ছে না কেন ? যন্ত্রণায় ?

শুভেন্দু বলতে পারত, হ্যাঁ, যন্ত্রণাতেই,—কিন্তু মাথার নয়, বুকের। কিন্তু কথায় চিরদিনই সে সংযত এবং সংক্ষিপ্ত। বললে, কি জানি কেন ? ঘুম হয়, কিন্তু অল্প।

—আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিই। তুমি একটু ঘুমবার চেষ্টা কর। কথা কোরো না।

শুভেন্দু শান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে। একটু পরেই মনে হোল সে ঘুমুচ্ছে।

শঙ্কর আর ইলা এসে দেখে অবাক। কি দিনে, কি রাত্রে শুভেন্দু চোখের পাতাটি বোঁজেনি। ঘুমুবার জন্যে সে নিজেও যে চেষ্টা করেনি তা নয়। যথেষ্টই চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতে ঘুমুতে পারেনি।

শঙ্কর ইলার দিকে চেয়ে হেসে বললে, দেখলে? বৌদি আসা-মাত্রই তোমার দাদার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে! এ কি তোমার কাজ! ঘুম পাড়াবার মালিক এসেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। গুড নাইট বৌদি! আজ আমিও একটু ঘুমুবো ভাবছি।

শ্রী হেসে উত্তর দিলে, তাহ'লে আপনার ঘুম পাড়াবার মালিকটিকেও ডেকে নিয়ে যান। নইলে মিথ্যে চেষ্টা।

—সে কি বুঝি না ভেবেছেন? কিন্তু শুভেন্দু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মালিক যে এ-ঘর থেকে নড়বেন, এমন ভরসাও দেখছি না।

ইলার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে শ্রী বললে, আমি তো রয়েছি। তোমরা আজ একটু বিশ্রাম নাওগে ভাই। আবার কাল থেকে যত খুশি রাত জাগবে।

ইলা বললে, থাক। বেশ আছি।

তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বিরক্তকণ্ঠে বললে, তোমার ঘুম এসে থাকে তো যাও না শুতে। আমি এই ঘরেই শোব।

ওর মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কর আর কথা বাড়াতে সাহস করলে না। নিঃশব্দে শুতে চ'লে গেল। চাকর এসে নিচে মেঝেয় একটা বিছানা পেতে দিলে। ইলা একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে সেইখানে বসলো।

শ্রী বললে, এ আলোটা নিভিয়ে একটা হাল্‌কা নীল আলো দাও না ভাই জ্বালিয়ে। আবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

আলমারীর ভিতর একটা নীল আলো ছিল। সেইটে বের করে ইলা ফিট ক'রে দিলে। উজ্জ্বল আলোটা দিলে নিভিয়ে।

শুভেন্দু অঘোরে তখন ঘুমুচ্ছে।

শ্রী হাসতে হাসতে এসে ইলার বিছানায় বসলো। ওর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে সস্নেহে নিয়ে বললে, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ মনে হচ্ছে। আমি জীবন-মরণের মাঝখানে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার ওপর রাগ রাখতে নেই, জানো?

ওর কণ্ঠস্বর বেদনায় গাঢ়।

ইলা চমকে উঠলো। বললে, ও কথা বোলো না।

শ্রী তেমনি গাঢ় কণ্ঠে বললে, নিষেধ কর বলব না। কিন্তু আমার ওপর রাগ রেখ না। কোনো অপরাধ আমি করিনি।

ইলার মন নরম হয়ে আসছিল। কিন্তু এই কথায় আবার শক্ত হয়ে উঠলো। বললে, অপরাধ করনি তুমি? তোমার অপরাধের সীমা নেই, জানো?

—না, জানি না। একটু স্পষ্ট ক'রে বলো।—শ্রী তখনও হাসছিল।

—স্বামীর চেয়েও তোমার দেশ বড় হোল?

—শুধু স্বামীর চেয়েও কেন, আমার নিজের চেয়েও, আমার ধর্মের চেয়েও। তুমি দেশ কাকে বলো? মাটি-জল-পাথরকে? একথা কোনো দিন তোমার মনে আসেনি যে, দেশই সব,—আমরা সেই মৃত্তিকার আত্মার অভিব্যক্তি মাত্র? আমরা আসছি যাচ্ছি, কিন্তু দেশ রয়েছে,—চিরন্তন শাশ্বত। তারই আত্মা অভিব্যক্ত হচ্ছে গাছপালা থেকে মানুষ পর্যন্ত সবারই মধ্যে?

ইলা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো। শ্রীর মাথা খারাপ হয়েছে? আবোল-তাবোল কী বকছে ও?

শ্রী বুঝলে সে কথা। বললে, তুমি অবাক হয়ে গেছ, না ইলা? অবাক হবারই কথা। দেশকে তুমি অত বড় ক'রে ভাবতে পারো না, না? কিন্তু এই যে ভারতবর্ষ, কিংবা বাংলা দেশ, কিংবা যে কোন দেশের কথাই ধরো,—তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু কেন সেই বৈশিষ্ট্য? কোথায় সেই বৈশিষ্ট্য? মানুষের মধ্যে? আমি বলব, না। আমি বলব, বৈশিষ্ট্য সেই মাটির। তার সংস্পর্শে মানুষ বদলায়। মানুষকে সে রূপ দেয়, ভাষা দেয়, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য দেয়। এই যে আমার বাংলা দেশ,—এ শুধুই আমার জননী নয়, আমার বিধাতা। এর চেয়ে বড় আমার কাছে কেউ নয়।

ইলা তথাপি বললে, কিন্তু আহত স্বামী

—হ্যাঁ, আহত স্বামী। কিন্তু গোটা বাংলা দেশ তোমাকে ঘুরতে হবে না, মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম যেতে হবে না,—এই কলকাতা শহরেই একবার খবর নিয়ে দেখ, শুধু আহত নয়, কত মেয়ের স্বামী মারা গেছে পুলিশের গুলীতে,—কত লোকের ছেলে, কত লোকের ভাই, কত লোকের বন্ধু!

ইলা বললে, মরলো তো তোমাদেরই জন্যে?

—আমাদের জন্যে?

—নিশ্চয়ই। তোমরা এই বিপ্লব আরম্ভ না করলে মরত? আমার রাগ তোমাদের ওপর। সেদিন ভুজঙ্গবাবু যখন দাদার খবর নিয়ে এলেন, আমি তো রাগে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই পারছিলাম না।

শ্রী হেসে বললে, দুর্বলের রাগের ধর্মই তাই। সবলের উপর রাগ করতেও সে সাহস পায় না। কিন্তু এর উপায় নেই ইলা,—শাস্তি শুধু কর্মীরাই পাবে না,—সবাইকেই ভাগ ক'রে নিতে হবে। অপরাধ আমাদের সবারই এবং গুরুতর। কিন্তু সে অপরাধ কি জানো? আমরা পরাধীন। কিন্তু চুপ কর। ওঁর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বোধ করি।

শুভেন্দু একটু নড়ে উঠলো। তারপরে চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে কি যেন খুঁজলে। শ্রী তার কাছে আসতেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আশ্বস্ত হয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে। ধীরে ধীরে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

শ্রী আবার মেঝের বিছানায় ফিরে আসতেই ইলা বললে, এই তোমার স্বামী। তোমাকে না দেখলে থাকতে পারেন না। ঘুমের ঘোরেও তোমাকে খুঁজছেন। অথচ এতটুকু দাবী তোমার ওপর রাখেন না। এতটুকু অভিমান নেই,—কিংবা যদি থাকেও, মনের গভীর অন্ধকারে, মুখে অভিযোগ করেন না। এঁকে ছেড়ে যেতেও তোমার ইচ্ছা হয়? তুমি কি পাষাণ, শ্রী?

এবারে শ্রীর সমস্ত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখে বেদনার ছায়া নামলো। নিঃশব্দে কতক্ষণ সে ব'সে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, এ দুঃখ যে কি সে অন্তর্যামীই জানেন। সত্যি বলতে গেলে, স্বামী তো আমি নিজে বেছে নিইনি। মহাদেবের মতো স্বামী আমি ভগবানের হাত থেকে পেয়েছি। তাঁকে ছেড়ে থাকার দুঃখ যে কত বড় তা জানি। তবু উপায় নেই।

ইলা জেদের সঙ্গে বললে, নেই কেন? রাজনীতি ছেড়ে দিলেই তো পার।

—পারি না। রাজনীতিও এক রকমের মদ। ধরলে সর্বস্বান্ত হবার আগে ছাড়া কঠিন।

শ্রী হাসলে।

সেই সময় শুভেন্দু আবার নড়ে উঠলো। শ্রী তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শুভেন্দু চোখ মেলে একবার শ্রীর দিকে, একবার ইলার দিকে চাইলে।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, জল খাবে?

শুভেন্দু ঘাড় নেড়ে জানালে, হুঁ।

কাঁচের কুঁজো থেকে জল এনে শ্রী একটু একটু ওর মুখে ঢেলে দিতে লাগলো। তারপরে তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, ঘুমোও এবার।

—তোমরা একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন? এখন তো আমি ভালোই আছি।

—কই ভালো আছ? থেকে থেকেই তো তোমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

—হুঁ। তা হোক, তোমরা ঘুমোও। রাত জেগো না ইলা।

শ্রীও বললে, তুমি বরং শুতে যাও ইলা। আমি তো রয়েছি। কাল থেকে এক ফোঁটা বিশ্রাম পাওনি তুমি।

জোর ক'রেই ইলাকে শ্রী শুতে পাঠালে। তারপর খাটের পা-তলায় টুলটিতে বসে বললে, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিই। তুমি ঘুমোও।

শুভেন্দু নিঃশব্দে হাসলে।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ কেন? ঘুমুবে না?

—ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বারে বারে। কেবলই স্বপ্ন দেখছি।

—ও কিছু নয় দুর্বলতা।

—জানি। কিন্তু কেবলই তোমার সম্বন্ধে নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখছি। তোমার কোনো ভয় নেই তো?

শ্রী হেসে জবাব দিলে, আজকে ভয় কার নেই বলতে পারো? যারা কাজ করছে তাদের তো আছেই, যারা করছে না তারাই কি নিরাপদ?

—ঠিক। আমাদের তেতলার ফ্ল্যাটের নন্দবাবুর স্ত্রী ছেলে মেয়ে একদিন অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

—কি ক'রে?

—একটা টিয়ার গ্যাস এসে পড়লো জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে। নন্দবাবুর স্ত্রী ঘুমুচ্ছিলেন, আর ছেলেমেয়েগুলো সেইখানে খেলা করছিল।

—তাহ'লেই বোঝ, নিরাপদ কেউ নয়। তুমি কার জন্তে চিন্তা কববে? এই বক্তাক্ত শতাব্দীব কোলে সমস্ত পৃথিবীই ভাসছে। কেউ বাঁচাতে পাবছে?

- ঠিক।

—ঝড়ের একটা বেগ আছে, সে সময় সমস্ত বাধাই নিস্ফল হয়। কিন্তু সেই বেগের একটা শেষ আছে। তখন সহজেই তাকে বাধা দেওয়া যায়। আমাদেব এই শতাব্দীও নিয়ে এল রক্তেব ঝড়। এখন চলেছে তাব পূর্ণ বেগ। কে দেবে বাধা? আশা এই যে, এও একদিন শেষ হবে। মানুষ তখন নিশ্চিন্তে নীড় বচনা করবে। তাব আগে কেউ আমবা নিবাপদ নই। আমাব জন্তে তুমি ভেবো না।

—না, ভাববো না।

হঠাৎ একটা কথা শ্রীর মনে পডলো। কিন্তু তা জিজ্ঞাসা কবতে তাব সঙ্কোচ হয়। একটু ইতস্ততঃ ক'বে, অনেক কুণ্ঠা-দ্বিধাব সঙ্গে শ্রী বললে, একটা কথা জিগ্যেস কবব উত্তর দেবে?

—কি কথা?

শ্রী আবার থামলো।

—বলো, কি প্রশ্ন?

—আমার ওপর তুমি রাগ করনি তো?

শুভেন্দু অবাক হয়ে চেয়ে রইল: বাগ? রাগ কবব কেন?

—তোমায় ছেড়ে আমি রাজনীতি কবছি। তোমাব কোনো শুশ্রূষা, কোনো সাহায্য, কোনো আরামে আমি আসছি না, এই জন্তে?

শুভেন্দু এবারে স্বচ্ছভাবে হাসলো: এই! না শ্রী, তুমি তো জানো, শিশুকাল থেকেই আমি স্বাবলম্বী—কারও কাছ থেকে সেবা, শুশ্রূষা বা সাহায্য

নেবার প্রশ্ন আমার মনেই আসে না। দৈহিক আরাম কখনও আমাকে প্রলুব্ধ করে না, এও তুমি দেখেছ। তবে রাগ করব কেন?

—কিন্তু দেহের উর্ধ্বে? সেখানে ক্ষোভ কোথাও জমা নেই?

—না। সেখানে সমস্ত সুস্থির, নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত। ক্রোধ-ক্ষোভ-দুঃখ-দ্বেষের তরঙ্গ সেখানে নেই। সেখানে যারা রয়েছে তারা আমারই সৃষ্টি, আমার আনন্দের সৃষ্টি। সেখানে তো ক্ষোভের ঘূর্ণি কেউ আনতে পারে না শ্রী।

এর চেয়ে প্রিয়তর কথা এক মিনিট আগেও শ্রীর কাছে কিছু ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। শ্রী যেন এতে খুসি হ'তে পারলে না। হঠাৎ তার মনে হোল, এই মানুষটির চিত্তাকাশে যে শ্রী রয়েছে সে অন্য, স্নেহ-প্রেম-রাগ-রোষে ভরা এই শ্রী, এই সত্যকার শ্রী নয়। ওখানে যেন তার স্থান হয়নি। ওখান থেকে যেন সে অনেক দূরে নির্বাসিত।

মন তার খুশি হোল না।

শুভেন্দু সেদিকে চেয়ে পুনরায় বললে, সত্যি বলছি শ্রী, তোমার ওপর বিন্দুমাত্র অভিযোগও আমার নেই। সত্যি বটে, 'তোমার এ পথ আমার পথের থেকে অনেক দূর'। কিন্তু সেটা অভিযোগের বিষয় নয়।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, কখনও তোমার ইচ্ছা হয় না এ পথ থেকে আমাকে ছিনিয়ে তোমার পথে নিয়ে আসবার?

শুভেন্দু হেসে ফেললে: না, ফুলকে তার বোঁটা থেকে ছেঁড়ার অভ্যাস আমার কখনও নেই।

মনে-মনে শ্রীর রাগই হোল। মনে হোল বলে, এমন নিষ্কলঙ্ক ভালোও ভালো নয়। কিছু কিছু বদভ্যাস মানুষের পক্ষে সময় বিশেষে স্বাস্থ্যকরই।

কিন্তু সে কথা বলতে তার সঙ্কোচ হোল। শুধু বললে, না, রাগ কোরো না। যদি অপরাধ কিছু করেই থাকি, বিশ্বাস করো, তার দায়িত্ব আমার নয়।

গভীর স্নেহে শুভেন্দু বললে, সে কথা আমি মনে প্রাণেই বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি তোমার স্ব-ধর্মের মধ্যেই রয়েছ। তাই তোমার জন্যে আমার দুঃখ নেই। যা তোমার পক্ষে সম্ভব, তাই তুমি করছ। যা সম্ভব নয়, তা

তোমার কাছ থেকে কেনই বা আমি প্রত্যাশা করব? তোমার জন্যে মনে দুর্ভাবনা মাঝে মাঝে জাগে, কিন্তু অভিযোগ কখনও জাগে না।

শ্রীর বুকের ভিতরটা কেমন হু হু ক'রে উঠলো। চোখেও ছাপিয়ে এল অশ্রুর বন্যা। ভুজঙ্গ থাকলে সবিস্ময়ে ভাবত, শ্রীও কাঁদে? শ্রীর চোখেও জল আসে তাহ'লে? এই শ্রীকে সে দেখেনি।

কিন্তু শুভেন্দু কিছুই বললে না। হয়তো তৃপ্তিতে, নয়তো শ্রান্তিতে তার চোখ বুঁজে এল।

কথা ওদের দুজনেরই শেষ হয়ে গেছে।

* * *

অনেক রাত্রে ইলা চুপি চুপি এল এ ঘরে দাদাকে দেখতে।

ঘরে নীল আলো তেমনি রহস্য বিস্তার ক'রে জ্বলছে।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে শুভেন্দু।

কিন্তু শ্রী কই?

একটু ঠাহর ক'রে ইলা দেখলে খাটের ওপাশে সেই ছোট টুলটির উপর সে ব'সে। মুখখানা শুভেন্দুর দুই পদতলের মধ্যে···

ঘুমুচ্ছে···

দ্বিতীয় খণ্ড

বারো

মহাযুদ্ধে ইংরেজ জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। অগষ্ট বিপ্লব ব্যর্থ হোল। বহু নেতা ও কর্মী ধরা পড়লেন। অনেকে গা-ঢাকা দিলেন। বহু লোক গুলীতে প্রাণ হারালো। দেশের উপর দিয়ে একটা দুর্ভিক্ষের ঝড় বয়ে গেল। তারপরে সমস্ত দেশ যেন ধুঁকছে,—প্রাণ-স্পন্দন একেবারে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিছুতে যেন আর সাড়া জাগে না।

এমনি অবস্থায় বম্বে হিন্দু কলোনীর একখানি ছোট ফ্ল্যাটে একখানি সোফায় পাশাপাশি ব'সে ভুজঙ্গ এবং শ্রী সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিল: কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যেরা ছাড়া পেয়েছেন। জওহরলাল বাইরে বেরিয়ে এসেই বাংলার দুর্ভিক্ষ ও চোরাবাজার সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন এবং সেই সঙ্গে নেতাজির আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নিঃশব্দে দু'জনে প'ড়ে যাচ্ছিল খবরের কাগজ। গেঞ্জি এবং হাফপ্যাণ্ট পরা কালো মতো একটি ছেলে সামনের টিপয়ে দুজনের চা-টোষ্ট রেখে গেল। ভুজঙ্গ চায়ে একটা চুমুক দিয়ে একখানা টোষ্ট তুলে নিলে।

চাকরটা একটু পরেই আবার ফিরে এল: মাঈজি, বাজার!

অর্থাৎ বাজার যেতে হবে। পাশের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের ক'রে শ্রী ওর হাতে দেয়।

ও চ'লে যেতে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগে বলো তো?

—কি?

—'মাঈজি' ডাক?

কুটীল ভ্রূভঙ্গি ক'রে শ্রী বললে, আবার! গায়ে গরম চা ঢেলে দোবো।

—সর্বনাশ!—ভুজঙ্গ সভয়ে দূরের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। বললে, যাক ও কথা। আজ বিকেলে কোথায় যাচ্ছি,—'Betty goes to town', না 'মুসাফির'?

শ্রী গম্ভীরভাবে বললে, কোথাও না।

—তার মানে? সমস্ত বিকেলটা এই অন্ধকার ঘরে বসে থাকবে?

—হ্যাঁ।

উদ্বিগ্নভাবে ভুজঙ্গ ওর সোফায় ফিরে এল। বললে, কি ব্যাপার? শরীর ভালো আছে তো?

এবারে শ্রী হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা তোমরা এত বোকা কেন বলতো? তোমাদের কি বিশ্বাস, নিতান্ত অসুখ না হোলে মেয়েদের সিনেমায় অরুচি হয় না?

—সেই রকমই তো শুনে এসেছি।

—শুনে এসেছ? কোথায় শুনে এসেছ?

—কংগ্রেস অফিসে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে হেসে উঠলো।

শ্রী বললে, শোনো। আজ আর সিনেমা নয়, সম্ভবত এখন কিছুদিনই আর সিনেমা নয়।

—কতদিন?

একটু ভেবে শ্রী বললে, আবার গা-ঢাকা না দেওয়া পর্যন্ত।

ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে বললে, তোমার কি বিশ্বাস আমাদের ওয়ারেণ্ট তুলে নেবে?

—তোমার কি তা মনে হয় না?

—না। কারণ, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা আর আমরা এক জাত নই। সুতরাং তাঁদের জন্যে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করেছে আমাদের জন্যে তা নাও করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, গভর্ণমেণ্ট এখন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ করতে চায়। তার জন্যে নেতৃবৃন্দের মুক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের নয়। আমাদের তারা পেলেই জেলে পুরবে, এখনও।

শ্রী দমে গেল। তার মনে ভরসা হয়েছিল, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই ছেড়ে দেবে।

আবার তারা বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করতে পারবে।

বললে, কিন্তু দেখো, কংগ্রেসের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আপোষ হয়ে যাবে। ওয়েভেল আন্তরিক চেষ্টা করবেন।

—আমার মনে হয় না।

—কেন ?

—প্রথমতঃ জিন্না কৌশলী ও কূট। তাঁর দাবী পুরোপুরি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত তিনি আপোষে সম্মত হবেন না। দ্বিতীয়তঃ, গান্ধী জাত-বিদ্রোহী, আপোষ তিনি কোনোদিন করতে পাবেন নি, এবারও পারবেন না। তৃতীয়তঃ, চার্চিল। তিনি আসলে কিছু দিতে চান না। শুধু আমেরিকাকে ভাঁওতা দিতে চান। সেবার ক্রিপ্‌স্‌কে নিয়ে যে খেলা খেলেছেন, এবার ওযেভেলকে নিয়েও তাই খেলবেন।

মাথা নেড়ে শ্রী বললে, তা হ'তে পারে। কিন্তু তুমি গান্ধী সম্বন্ধে যা বললে তা আমি স্বীকাব কবি না।

—স্বীকাব কর না যে, তিনি জাত-বিদ্রোহী ?

—সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁব বাইবের খোলস। আসলে তিনি শান্তিব দেবদূত।

—দেবদূতই তো। মানে, প্রচলিত কূটনীতিক বাষ্ট্রদূত নন। তাহ'লে স্বচ্ছন্দে বিশবাব আপোষ ক'বে বিশবার ভাঙতে পারতেন। কিন্তু দেবদূতের তো ভেজাল সহ্য হয় না। এবাও ভেজাল ছাড়া কিছু দিতে জানে না।

শ্রী তর্ক না ক'বে কি যেন ভাবতে লাগলো।

ওর দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছ ?

শ্রী তেমনিভাবে অন্যদিকে চেযেই উত্তর দিলে, ভাবছি এইভাবে আবও কতকাল অজ্ঞাতবাস করতে হবে।

—আমি তো বলি, অনন্তকাল চলুক। কাজ নেই এব শেষ হয়ে।

—অনন্তকাল পেট চালাবে কে ?

—কেন ব্রততী আর শুভেন্দুবাবু। তাঁরা তো এই মহৎ উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

—আর তুমি কি করবে?

—আমি? ভাগ্যবান লোকেরা যা ক'রে থাকে। অর্থাৎ স্যুট প'রে বেড়াব, মাঝে মাঝে সিনেমা যাব, আর—আচ্ছা, ভাগ্যবানেরা কি বিবাহ না ক'রেও স্ত্রীলাভ করে?

শ্রী তড়াক ক'রে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠলো। হাতের খবরের কাগজটা ওর মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

মণিকা এলো পরের দিন বিকেল বেলায়।

মাঝে মাঝেই আসে সে। এই তিন বছরে বম্বের অনেক বাঙালী পরিবারেব সঙ্গেই ভুজঙ্গদেব আলাপ হয়েছে। কিন্তু অন্তরঙ্গতা এদের সঙ্গেই বেশি। বলতে গেলে এখানে এসে বাঙালীদের মধ্যে মিঃ দাসের সঙ্গেই ভুজঙ্গের পরিচয় হয় সর্বাগ্রে।

মিঃ দাস এখানকাব একজন বিশিষ্ট অলঙ্কাব-ব্যবসাযী। তিন পুরুষ এইখানেই ওঁরা বসবাস করছেন। বহুকাল আগে তাঁর পিতামহ নৈহাটির কাছাকাছি কোনো পল্লী থেকে এখানে আসেন দারিদ্র্যদুঃখে পীড়িত হয়ে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায়। সামান্য কাজ নেন একটা সোনা-রূপার দোকানে। কিছুকাল পরে নিজেই তিনি একটি ছোট সোনা-রূপার দোকান খোলেন এবং আপন অধ্যবসায়ে ও সততায় সেটাকে বেশ বড় ক'রে তোলেন। তাঁর ছেলেও দোকানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ক'রে যান। মিঃ দাসের বয়স হয়েছে। এখন তিনি এখানকার অভিজাত বাঙালীদের একজন। তবু নিয়মিত দোকানে বসেন। কিন্তু পিতা পিতামহের সেই প্রাচীন চাল আর দোকানে নেই। মিঃ দাস তার বদলে সাহেবী চাল প্রবর্তন করেছেন।

তাঁরই একমাত্র কন্যা মণিকা।

মিঃ দাস নিজে বেশি দূর পড়াশুনা করতে পারেন নি। কিন্তু সে ত্রুটি পুষিয়ে নিয়েছেন নিজের সাহেবী চাল-চলনে এবং মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষায়। বছর

দুই হোল মণিকা বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ইচ্ছা আছে বিলাত যাবার। মিঃ দাসের অনিচ্ছা নেই। কিন্তু একমাত্র মেয়েকে একলা বিলাত পাঠাতে মিসেস দাস কিছুতে রাজি নন। বলেন, বিয়ে থা কর্। তারপর জামাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে যাস। বাধা দোব না।

কিন্তু জামাই আসার কোনো লক্ষণই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মণিকা ক্লাব-পার্টিতে যায়, হাসি-গল্পের ত্রুটি করে না, মিঃ দাসের মনে আশা জাগে হয় তো সামনের আঘ্রাণে পল্টু ঘোষের সঙ্গে পাকা-পাকি হয়ে যাবে। কিন্তু মিসেস দাস জানেন, ওটা কিছুই নয়। তাঁর মেয়ের মন এখনও কোথাও ঠিক বসছে না।

লম্বা ছিপ ছিপে মেয়ে মণিকা। দেহের রং শ্যামবর্ণ, স্নো-পাউডার-লিপস্টিক-রুজে আরও কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল দেখায়। সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ,—প্রজাপতির মতো সব সময়ই নাচছে, কিন্তু স্থির হয়ে বসবার যেন গা নেই।

শুধু শ্রীকে যেন ও কী চোখেই দেখেছে! সর্বত্র সে ঝকঝকে, চকচকে, মাজা-ঘষা এবং কেতাদুরস্ত। কিন্তু এখানে এলে ওর মনের সমস্ত বাঁধন-কষণ যেন ঢিলে হয়ে যায়। বলা নেই, কহা নেই, যখন তখন হুট ক'রে এসে হাজির হয়।

অসুবিধা কিছুই নেই। ছোট একখানি মোটর রয়েছে ওর নিজেরই তাঁবে। নিজেই সেটা চালায় এবং বম্বে শহরটা যেন চ'ষে বেড়ায়। এবং গাড়িটার হর্ন এবাড়িতে এমনই পরিচিত হয়ে গেছে যে, শুধু শ্রী নয় ভুজঙ্গ পর্যন্ত শোনামাত্র সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ওর আগমন সম্ভাবনায়।

মণিকা ডাকে কল্যাণীদি ব'লে। গোটা বম্বে শহরে দিদি ব'লে শ্রীকে কেউ ডাকে না। সবাই বলে মিসেস মল্লিক,—যারা বড় তারাও, যারা ছোট তারাও। অন্য কারও সঙ্গে এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ শ্রীদের ঘটেনি,—ঘটাতে চায়ওনি তারা। পুলিশের চুলিয়া যাদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়, তাদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা নিরাপদও নয়। এখানে তারা মিঃ ও মিসেস মল্লিক।

সবাই জানে, মিঃ মল্লিক কি একটা অদ্ভুত নামের বিলিতি ট্র্যাক্টর কম্পেনীর টুংরি এজেন্ট। বম্বে-প্রবাসী বাঙালীসমাজের সঙ্গে ট্র্যাক্টরের সংযোগ থাকার কথা নয়। সুতরাং কম্পেনীর নামটা অনেকেই জানবার কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যাঁরা ক'রেছিলেন, তাঁদেরও তা আর স্মরণ নেই। মোটামুটি এই পর্যন্ত সবাই বুঝে নিয়েছে যে, এজেন্সিটা নিতান্তই গৌণ। আসলে মিঃ মল্লিকের বাপের কিছু পয়সা সম্ভবত আছে। বম্বেতে ব'সে মূলত সেইটেরই তিনি সদ্ব্যবহার করছেন।

মল্লিকদম্পতি এরকম সন্দেহ সমর্থনও করে না, তার প্রতিবাদও করে না। শুধু কারও মুখে এরকম কথা শুনলে একটু ঠোঁট কুঁচকে আল্‌তো হাসে। কিন্তু এতদিনে সে পর্বও পার হয়ে গেছে। মল্লিক-দম্পতি সম্পর্কে, সত্য কথা বলতে গেলে, এখন আর কারও বিশেষ কৌতূহল নেই। তবে এও ঠিক যে, মণিকার ঘন ঘন আসা-যাওয়া এবং এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই বিষয়টিকে এমন সহজ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু সেই মণিকাই আজকে যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একেবারে শ্রীর শোবার ঘরের দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালো, সবিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে শ্রী শুধু বললে, মণিকা!

মণিকা বললে, সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—হবারই তো কথা। না পেলাম মোটরের তীক্ষ্ণ হর্ণ, না শুনলাম একতলা থেকে তোমার কলকণ্ঠ, না সিঁড়িতে দাপাদাপি। শরীর ভালো আছে তো?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মণিকা শুধু বললে, এক গ্লাস জল খাওয়াও তো কল্যাণীদি।

—শুধু জল?

—তাই দিয়ে তো আপাততঃ আতিথ্য আরম্ভ হোক। তারপরে দেখা যাবে, তোমার অদৃষ্টে কী দুর্ভোগ আছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বলো তো মণিকা? গুরুতর কিছু?

—ভীষণ। দেখছ না কি রকম ক্লান্ত ?

সত্যই সে ক্লান্ত। ঢক ঢক ক'রে একটি গ্লাস জল নিঃশেষ ক'রে গ্লাসটা ঠক ক'রে টিপয়ের উপর রেখে বললে, শোনো।

—বলো।

—মেয়েরাও যে সামান্য নয়, পৃথিবীতে 'রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধা' ছাড়াও যে তাদের অনেক কিছু করবার আছে, এ তুমি স্বীকার করো ?

—করি। তারপরে বলো।

—সেজন্যে স্থির হয়েছে, এখানে আমরা একটি 'প্রবাসী বঙ্গ-মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করব।

শ্রী যেন একটু উৎসাহিত বোধ করলে। সে কাজের মেয়ে। চিরদিন কত কাজের মধ্যে তার দিন কেটেছে। ভালো লাগে না এই নিষ্কর্ম, অলস জীবন। মণিকার প্রস্তাবে কাজের আভাস পেয়ে তার মনের ভিতরটা উসখুস ক'রে উঠলো।

কিন্তু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে সেখানে ?

—সেটা তোমরা সবাই এসে ঠিক করবে।

—রাজনীতি থাকবে ?

—না। লেডি ঘোষাল প্রেসিডেণ্ট। সভার প্রথম দিনেই তিনি প্রথম দশ হাজার টাকা দেবেন। সুতরাং রাজনীতি থাকবে না। আমাদের কাজ হবে প্রধানতঃ প্রবাসী বাঙালী মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সমাজ-সংস্কার, অধিকার প্রভৃতি নিয়ে। হয়তো একখানা ছোট সাময়িক পত্রিকাও থাকবে। আজ হর্নবি রোডে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট দেখে এলাম অফিসের জন্যে।

একটু চিন্তা ক'রে শ্রী বললে, কিন্তু এসব তো অনেক খরচের ব্যাপার কল্যাণী। দীর্ঘকাল চাঁদা দেবে কে ?

—তাও ভেবেছি। সেজন্যে ধরো সামনের পূজোয়, যদি একটা চ্যারিটি শো করা যায়। মাঝে মাঝে এ থেকে ভালো টাকাই উঠতে পারে।

রাজনীতি থাকবে না শুনে শ্রী কিন্তু ক্ষুণ্ণ হোল না। না থাকাটাই তার পক্ষে ভালো। পুলিশের দৃষ্টি পড়বে না। কিন্তু এই সব সভা-সমিতি সম্বন্ধে তার আস্থা খুব বেশী নয়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছে, সদস্যদের মধ্যে কাজের চেয়ে আড্ডা দেবার ঝোঁকই বেশি। তার উপর মেয়েদের, বিশেষ ক'রে অভিজাত মেয়েদের সমিতি আসলে শাড়ী-ব্লাউজ, গয়না-মোটরের প্রদর্শনী। যে আগুনের ভিতর দিয়ে সে চলেছে, তাতে এ সমস্ত তার কাছে নিতান্তই ছেলেমানুষী বলেই মনে হয়। এতে তার আকর্ষণের এইটুকু যে, দিনের পর দিন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্য লোকের স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করার যে গভীর ক্লান্তি, তার থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও নিষ্কৃতি পাবে।

মণিকা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, আসবে তুমি? আমাকে ওরা সম্পাদিকা করেছে। তুমি এলে তোমাতে আমাতে যুগ্ম-সম্পাদিকা হই। আমার মনে হয়, খাটলে হয়তো কিছু সত্যিকার কাজ করা যায়।

শ্রী এখনই সে সম্বন্ধে কথা দিতে পারে না। এবং ভাববার একটা সময় পাবার জন্যে বললে, ওঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে কাল তোমাকে জানাব।

বিস্ময়ে মণিকার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো: পরামর্শ? মানে চলতি ভাষায় অনুমতি?

শ্রী হেসে বললে, তাহ'লে তাই।

—তুমি হাসালে কল্যাণীদি। সমিতির সভ্য হবে কি না, সে বিষয়েও স্বামীর অনুমতি নিতে হবে?

শ্রী লজ্জিত হোল না। বললে, নেওয়াই তো উচিত। তোমার যখন বিয়ে হবে তখন বুঝবে, নেওয়াই সুবিধাও।

—তাই নাকি?—মণিকা লাফিয়ে উঠলো,—তাহ'লে তো এ সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার।

সে ছুটলো ভুজঙ্গের পড়ার ঘরে। তাকে এক রকম টানতে টানতে এ ঘরে নিয়ে এসে বললে, মিঃ মল্লিক!

—আজ্ঞে করুন।

—আমরা একটি প্রবাসী বঙ্গ-মহিলা সমিতি স্থাপন করছি।

ভুজঙ্গ বিব্রত হবার ভাণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, তাতে কি আমার সভ্য হবার কোনো উপায় আছে?

মণিকা হেসে ফেললে: না। অন্ততঃ এ জন্মে নয়।

—তাহ'লে আমি আপনাদেব সেবায় কি ভাবে লাগতে পারি বলুন।

—আপনার সহধর্মিনীকে আমাদের সমিতিতে যোগদানের অনুমতি দিয়ে।

—অনুমতি!—ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে শ্রী মুখ নিচু ক'রে হাসছে। বললে, উনি যদি অনুমতি চেয়ে থাকেন, সে ওঁর উদারতা। উনি যদি আপনাদের সমিতিতে যোগ দেন, নিজের কর্ত্তব্য-বোধেই দেবেন। এ বিষয়ে নিত্য নতুন শাড়ি সরবরাহ করা ছাড়া আমার কোনো কর্তব্য আছে ব'লে মনে করি না। অনুমতির অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, সেই দুরূহ যোগ্যতা আমার আছে কিনা। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সেইখানে ওঁকে একটু আত্মত্যাগ করতে হবে।

মণিকা জিজ্ঞাসা কবলে, তাব মানে?

—তার মানে আপনাদের সঙ্গে শাড়িতে পাল্লা দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমার নেই।

কোপকটাক্ষ হেনে মণিকা বললে, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার স্বামীর শ্রদ্ধা তো খুব প্রগাঢ় কল্যাণীদি?

শ্রী বললে, হ্যাঁ ভাই। আমার জীবনের সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ। উনি আমাদের মনে করেন, শাড়ি-বাড়ি-গাড়ির সমষ্টি।

ভুজঙ্গ বললে, সে কি অশ্রদ্ধা ক'রে? কবি বলেছেন 'হীরা-মণি-মাণিক্যের ঘটা'। সেই ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমি তোমাদের সংযুক্ত করেছি। রাগছ কেন?

—থাম।—শ্রী কড়া ধমক দিলে,—এদের সমিতিতে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে তোমার কি মত স্পষ্ট জানাও। শেষে রাত্রে ঝগড়া কোরো না।

ব'লেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—দিন ধমক।—সকিনয়ে ভুজঙ্গ বললে,—ওটা আপনাদের পেশা। ধমক না দিলে আপনাদের প্রত্যবায় হয়। কিন্তু দেখুন মিস্ দাস, আপনাদের সমিতি গঠন আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রত্যেক স্বামীরই করা উচিত।

—কেন বলুন তো?

—কিছুটা ধমকের চাপ কমে।

—এই কারণে? শুনছ কল্যাণীদি?

শ্রী খাবারের প্লেট নিয়ে উপস্থিত হোল। বললে, আমি চব্বিশ ঘণ্টাই শুনছি। তুমি শোনো।

খাবার খেতে খেতে মণিকা বললে, চলোনা একটু বেড়িয়ে আসি কল্যাণীদি। যাবে? না অনুমতি লাগবে?

শ্রী হাসলে। ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে বললে, তুমিও চলো না। দিন রাত্রি বই মুখে দিয়ে ব'সে রয়েছ। একটু ঘুরে আসবে।

—না।

—না কেন?

ভুজঙ্গ বললে, দেখলেন? আপনাদের কে অবলা বলেছেন জানি না। আমার মনে হয়, আপনারা অবলা সেজে থাকেন। আসলে

—থামুন। এবারে আমার কাছে ধমক খাবেন।—গর্জন ক'রে উঠলো মণিকা।

—কারণ Two is company, three is none. তোমরা ঘুরে এসো। আমি এই বইটা ততক্ষণে শেষ ক'রে নিই।

ব'লে বাইরের ছোট বারান্দায় যে বেতের চেয়ারটা আছে সেইখানে গিয়ে বসলো।

কিন্তু পড়তে বসা নামমাত্র। আসলে বহু চিন্তা তার মাথায় ভিড় ক'রে এলো। ঘটনার চক্রান্তে এ কী জটিল আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছে সে?

এই শ্রী। মনের অগোচরে তো কিছুই নেই। একদিন তার এবং এই শ্রীর মধ্যেই কি একটুখানি স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্য জমে উঠেনি? বাস্তবজীবনে কিছুই হয়তো নয় সেটা। কিন্তু একেবারেই কি কিছুই নয়? সত্য বটে,

এতদিন শ্রী সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জাগেনি। কর্মের ক্ষেত্রে যে মেয়েটির একদা আবির্ভাব হয়েছিল, কর্মের ক্ষেত্রে বিবাহের পরেও তার সাহচর্যের অভাব ঘটেনি। সম্ভবত সেই কারণেই শ্রীর যখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল, ভুজঙ্গের মনে হতাশার কোনো কারণ ঘটেনি। শ্রী তারই কর্মের সঙ্গিনী ছিল, তারই কর্মের সঙ্গিনী রইল। এর মধ্যে ভুজঙ্গের মতো আদর্শ-পাগল লোকের মনে হতাশার অবকাশ কোথায়?

কিন্তু আজ যখন সেই শ্রীর সঙ্গে একই ছাদের নিচে বৎসরের পর বৎসর স্বামী পরিচয়ে বাস করতে হচ্ছে, তখন এক এক সময় মনে হচ্ছে, স্বামীর ভূমিকা অভিনয়ে সবটাই হয়তো অভিনয় নয়।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি!

ভগবান রক্ষা করেছেন, শ্রী সাধারণ মেয়ে নয়। রাজনীতির একটা বড় শিক্ষা এই যে, দেহটা হয়ে যায় নিতান্ত গৌণ। রাজনীতিক্ষেত্রে পদে পদে এই দেহেরই লাঞ্ছনা, অপমান, ক্লেশ। তাই দেহটাকে তুচ্ছ করতে না শিখলে রাজনীতিচর্চা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সেই শিক্ষা পেয়েছে ভুজঙ্গ। সেই শিক্ষাই পেয়েছে তারই শিষ্যা শ্রী। দেহের উপর তাদের কারোই আকর্ষণ নেই।

কিন্তু মন?

ভুজঙ্গের মনে হচ্ছে, শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে না এলেই ভালো হোত। কিন্তু তাকে ফেলেই বা রেখে আসবে কোথায়? অন্য কোথাও কারও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রেখে আসবার সময়ই বা পেলে কই? পুলিশ হানা দিলে এমন আচম্বিতে যে ভুজঙ্গ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ভাগ্যে মোদাব্বের ছিল, তাই কোনোক্রমে সে অন্য বাড়ির ছাদ দিয়ে, গলিপথে ঘুরে ঘুরে বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

শ্রী তখন ইলাদের বাড়ীতে। হয়তো তখনও শুভেন্দুর দুই পায়ের মধ্যে মুখখানি গুঁজে পরম শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।

সে সময়, আত্মরক্ষার প্রথম প্রয়াসের সময়, শ্রীর কথা ভুজঙ্গের মনেই হয়নি। তার মনে তখন জৈবিক ধর্মে নিজকে বাঁচাবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো

ইচ্ছাই ছিল না। ইচ্ছা জাগলো তার প্রথম ভবানীপুরের রাস্তায় পান্না সিংহের আহ্বানে।

মোটরে উঠতেই পান্না সিং যখন বললে, কিধার বাবুজি? তখনও সে ভাবছে কোন দিকে যাবে। সেই সময় তার মনে পড়লো শ্রীর কথা। তাই তো, সে বেচারা তো জানে না, মোদাব্বেরের বাড়ি পুলিশে ঘেরাও ক'রেছে। হয়তো ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়বে মোদাব্বেরের বাড়ির উদ্দেশে। আর যেই ঢুকতে যাবে, পুলিশের হাতে পড়বে।

তখনই সে পান্না সিংকে বললে, কাল মাঈজিকে যেখানে ছেড়ে এসেছ সে বাড়ি তো তোমার মনে আছে। সেইখানে চলো আগে। তারপরে,—বড় বিপদ পান্না সিং। তোমাকে একটু কষ্ট দিতে হচ্ছে। এই মোটরেই আমাদের দুজনকে খড়গপুর পেরিয়ে কোথাও গিয়ে রেখে দিয়ে আসতে হবে। পারবে?

এক গাল হেসে পান্না সিং বললে, জরুর যাযেঙ্গে।

বম্বে হিন্দু কলোনীর ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে ভুজঙ্গ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল: ইলার বাড়ী ··সেখান থেকে ব্রততীর বাড়ি···তার গহনা সে নিতে পারেনি, কিন্তু টাকা কিছু নিয়েছিল···সেই সঙ্গে ছদ্মনামটাও দিয়ে এসেছিল··· ব্রততীর অশ্রুসিক্ত চোখ···বার বার মাথার দিব্যি দেওয়া, টাকার দরকার হ'লে লিখতে লজ্জা করবেন না···সেই চোখ, স্নিগ্ধ, করুণ···যেন বাংলা-দেশেরই দুটি চোখ···

তারপরে?

চলা···শুধু চলা, ঝড়ের বেগে···কিছুটা মোটরে, কিছুটা ট্রেনে···এইতো সেদিনের কথা। স্পষ্ট মনে পড়ে।

তেরো

সিঁড়ি থেকেই মণিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : মিঃ মল্লিক, আপনার জিনিস বুঝে নিন।

ভুজঙ্গ সহাস্যে বললে, বহু ধন্যবাদ। কিন্তু পালাচ্ছেন কোথায়? একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

মণিকা করযোড়ে বললে, না, ধন্যবাদ। আমার জরুরী কাজ আছে।

শ্রী ভুজঙ্গকে বললে, না, না। ওকে আর আটকিও না। ও এখন যাবে 'কার্জন ভিলা'য় বিলিয়ার্ড খেলতে। তাহ'লে তুমি পরশু আসছ, না মণিকা?

চলে যেতে যেতে মণিকা বললে, পরশু বিকেলে। নমস্কার মিঃ মল্লিক! থাকতে পারলাম না ব'লে কিছু মনে করবেন না।

মণিকা চ'লে যেতে শ্রী ঢুকলো তার শোবার ঘরে কাপড় ছাড়তে। ভুজঙ্গ গিয়ে বসলো সেই ছোট্ট বারান্দাটিতে। সন্ধ্যার পরে আলো-অন্ধকারে এই জায়গাটি ভারি মনোরম হয়। ওরই মধ্যে একটি কোণে টবে শ্রী কয়েকটি ফুলের গাছ লাগিয়েছে। ক'দিন হোল ফুল ফুটেছে। ভারি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে তার। একটু পরেই শ্রী এসে পাশের একখানা ছোট টুলের উপর বসলো।

—কতদূর গেছলে?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—সমুদ্রের ধারে।

—মণিকাকে কেমন বুঝছ?

—খাটতে পারে অবিশ্রান্ত। কিন্তু ভাবপ্রবণ। চোখে ঘোর যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সব করতে পারে। কিন্তু ঘোর কতক্ষণ থাকবে তা তো জানা নেই। বড়লোকের আদুরে মেয়ে। দেশের কথা খুব বেশি ভেবেছে ব'লে

বসে হয় না। অথচ বয়সের একটা ধর্ম আছে। কিছু করতে চায়। কিন্তু সেই করাটা প্রবাসী বঙ্গ-মহিলা সমিতির ওপরে ওঠে না।

শ্রী হাসলে।

ভুজঙ্গ বললে, এখানে এই ক'বছর তো এদের দেখলাম। দেখে এঁদের সম্বন্ধে আশার চেয়ে আমার ভয়ই জাগে বেশি।

—কেন ?

—বাংলা দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির, বাঙালী সামাজিকতা ও ভদ্রতার সুযোগ্য প্রতিনিধি এঁরা। কিন্তু বেশির ভাগই চাকুরী-সূত্রে আসায় রাজনীতিকে এঁদের এড়িয়ে চলতে হয়। তার ফলে যেখানে এঁরা স্থায়ীভাবেই বাসা বেঁধেছেন, সেখানকার মাটির সঙ্গে এঁদের সংযোগ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না।

শ্রী বললে, পারে না যে তার সমস্ত অপরাধই এঁদের নয়। বাঙালীদের সম্বন্ধে অবাঙালীদের সাধারণভাবেই কেমন একটা বিরূপতা আছে।

—আছেই তো। এবং কারণ তার যাই হোক, দিন দিন তা বেড়েই যাচ্ছে। আর যত বাড়ছে, প্রবাসী বাঙালী ততই তাদের থেকে স'রে আসছে। তার ফলে, প্রবাসে বাঙালীর যে এত দান, তাও ব্যর্থ হতে চলেছে। এর একমাত্র প্রতিকার, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতির দুঃখ-দহনে নেমে পড়া। মণিকাকে এই দিকে একটু সচেতন ক'রে তোল তুমি।

শ্রী এক মুহূর্ত ওর দিকে সকৌতুকে চেয়ে হেসে ফেললে। বললে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

—তার মানে ?

—তার মানে আমরা এখানে এসেছি গবর্ণমেণ্টের রুদ্ররোষ থেকে আত্মগোপন করবার জন্যে। তারও মধ্যে তুমি দলের লোক-সংগ্রহ করতে চাও!

কথাটা ভুজঙ্গের ঠিক খেয়াল হয়নি। হেসে বললে, ঠিক ধরেছ। আসলে ও একটা কি রকম যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ভালো মাল-মশলা দেখলেই মনটা যেন চনমন ক'রে ওঠে। যাই হোক, তুমি মিশে পড় ওদের 'বঙ্গ-মহিলা'তে

তোমার সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে এমন সঙ্গী হয়তো পাবে না। কিন্তু গেলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়।

—কাজের ?

—কাজ এখন কোথায় পাবে ? দেখছ না, সমস্ত দেশ যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পর ক্লান্তভাবে ঝিমুচ্ছে। সুবিধা হয় ক'লকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার। সেই অভাবটা কিছুদিন থেকে বড্ড অনুভব করছি।

কলিকাতার প্রসঙ্গে শ্রী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। অনেকগুলো চিন্তা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার মনের মধ্যে এলোমেলো বয়ে গেল।

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি একবার ঘুরে আসবে ক'লকাতা থেকে ?

—যাওয়া তো খুবই দরকার।

—তাহ'লে আটকাচ্ছে কোথায় ?

—আটকাচ্ছে তোমাকে নিয়ে।

—কি রকম ?

দ্বিধাভরে ভুজঙ্গ বললে, তোমাকে কার কাছে রেখে যাই ?

এবারে শ্রী উপেক্ষার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো : বলো কি ? আমাকে তুমি কী ভাবতে আরম্ভ করেছ আজকাল ? আমার জন্যে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

তারপর গম্ভীরভাবে বললে, তুমি যাও। তোমার যাওয়া দরকার। কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না সেখানকার।

সে বিষয়ে ভুজঙ্গেরও সন্দেহ নেই। বললে, দেখি কি করা যায়।

সকালের ডাকে দু'খানা চিঠি এল : একখানা শ্রীর, একখানা ভুজঙ্গের।

শুভেন্দু শ্রীকে যে চিঠি লিখেছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। ভাষা সংযত এবং নিতান্ত মামুলী। দু'চার কথায় সে নিজের কুশল জানিয়েছে, শ্রীর কুশল প্রার্থনা করেছে এবং কলিকাতা শহরের সাম্প্রতিক দুরবস্থার আভাষ দিয়েছে। কেবল একটি লাইনে শ্রীর চোখ অনেকক্ষণ আটকে রইল। সে এই : কিন্তু

ভালো লাগে না,—শড়াশুনাও না। তোমার আসার এখন বোধ করি সম্ভাবনা নেই। কি বল?

ব্রততী ভুজঙ্গকে লিখেছে একখানা বড় চিঠি। ছোট চিঠি সে লিখতে পারে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু কথা লিখতেই তার চার পৃষ্ঠা হয়ে যায়, মনে পড়ে ভুজঙ্গের ধমকের কথা। তখন লেখে: আবার বড় চিঠি হয়ে গেল। আপনি হয়তো কত রাগ করছেন। করুন গে, আমার বয়েই গেল। বিশ্বাস করুন, আমার অর্ধেক কথাও এখনও লেখা হয়নি। শুধু আপনার ধমকের ভয়ে প্রণাম জানিয়ে এইখানেই দাঁড়ি টানলাম।

একটি প্রসঙ্গ দু'জনের কেউই পারৎপক্ষে উল্লেখ করে না,—টাকার কথা। সেটা শুধু ইনশিওর যোগে চ'লে আসে। ভুজঙ্গ কিংবা শ্রী কেউই কোনোদিন টাকার প্রার্থনা জানায না,—কত টাকা প্রয়োজন তাও না। লজ্জা করে। কিন্তু ওদের একটা আন্দাজ আছে বম্বেতে দু'জন লোকের একটু স্বচ্ছলভাবে থাকতে কি রকম খরচ হয়, এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সাধ্যের সম্বন্ধেও ধারণা আছে। শুভেন্দু অবশ্য প্রতি মাসে একটা নিয়মিত টাকা নির্দিষ্ট দিনে পাঠায়। ব্রততী তা পারে না। তার টাকা অথবা দিন কোনোটাই নির্দিষ্ট নয়। কখনও হয়তো অনেক টাকা পাঠায়, কখনও নিতান্ত সামান্য। যখন যেমন পারে। এরা তাতেই চালিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে দলের লোকের কাছ থেকেও অজ্ঞাত নামে কিছু কিছু টাকা আসে। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ওদের যে সব মাসেই খুব আরামে চলে তা নয়। বাইরের চাল রাখতেই বেশি টাকা খরচ হয়। অবশিষ্টে কোনো-কোনো মাস বেশ ভালোই চলে, কোনো-কোনো মাস চলে না। তখন চাকরদের জন্যে যা-হোক ব্যবস্থা ক'রে নিজেরা বাইরে নিমন্ত্রণের অজুহাতে অনশনে বা অধাশনেই কাটিয়ে দেয়। সেদিন ভুজঙ্গের কী স্ফূর্তি!

শ্রী গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ। এক এক সময় বিরক্ত হয়ে বলে, অত হাসছ কেন? এতে স্ফূর্তি করার কি আছে?

—নেই?— ভুজঙ্গ বড় বড় চোখ ক'রে বলে,— বলো কি? বেশি দিন আরামের একঘেয়ে জীবনে আমি তো অস্বস্তি বোধ করি। চা চাইলে

চা আসবে, খাবার চাইলেই খাবার, নিত্য মধ্যাহ্ন-ভোজন,—এ কি একটা ভদ্র-লোকের জীবন! আমার তো সাত দিন একরকম চললে পেশীগুলো ঢিলে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মুখ বদলানো দরকার।

এবারে শ্রী হেসে ওঠে। বলে, না খেয়ে মুখ বদলানোটা কি রকম?

ভুজঙ্গ বলে, ওই এক রকম। ওকে রাজনৈতিক রকম বলতে পারো।

এমনি চলে ওদের,—কখনও শুক্লপক্ষ, কখনও কৃষ্ণপক্ষ।

ব্রততীর চিঠিখানা ভুজঙ্গ শ্রীর হাতে দিলে। বললে, আশ্চর্য মেয়ে এই ব্রততী! আমরা তো আছিই, তার উপর কোথায় শুভেন্দুবাবু, কোথায় ইলা, সকলের খবর নিয়মিত নেওয়া চাই।

শ্রী বললে, ওর মুস্কিল হয়েছে কি জানো: বিপ্লবীর মেয়ে,—যে বাড়িতে ও পড়েছে, সে-বাড়িতে ওর নিশ্বেস নেবার হাওয়া নেই। তবু থাকে, বাঙ্গালীর মেয়ে বলেই হাঁপানী রোগীর মতো থাকে,—কিন্তু মাঝে মাঝে নিতান্ত যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন আর পারে না। বেরিয়ে পড়ে।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তোমারই মতো।

দৃঢ় কণ্ঠে শ্রী বললে, না। আমি উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাস করি। ওকে ভালো ক'রে চিনলে বুঝতে পারতে সে আকাশ কত অবারিত।

কেন জানি না, ভুজঙ্গের মুখে শুভেন্দু সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত শুনলেই শ্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার উত্তর দেয়। ভুজঙ্গ চমকে যায়, একটু ব্যথাও পায়। কিন্তু নীরবেই সহ্য করে।

শ্রী বললে, তাঁর সঙ্গে তুমি সাধারণ মানুষের তুলনা দিও না। যিনি সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠেছেন, উনি সেই মানুষ। সে যাক। আমার মনে হয়, তোমার মধ্যে ব্রততী সেই আকাশের সন্ধান পেয়েছে যেখানে ও স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারে। তাই তোমাকে ও অমন ক'রে আঁকড়ে ধরেছে, তোমার জন্যে ও সমস্ত দিতে পারে।

তারপর একটু হেসে বললে, ও যে রকম মিষ্টি ক'রে দীর্ঘ চিঠি লেখে—যতই 'দাদা' বলুক,—তুমি ছাড়া অন্য যে কোনো লোক ভেবে বসতো, ও তোমায় ভালোবেসেছে।

ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি ছাড়া অন্য লোক' মানে?

—মানে,—শ্রী একটু চোখ নামিয়ে হেসে বললে,—অহঙ্কার কোরো না, তুমি হ'লে তপস্বী। দেশ ছাড়া তোমার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে আর কিছুই নেই। নারী-লোকের উজ্জ্বলতা তোমার চোখে নিভে গেছে। তোমার কথা তাই স্বতন্ত্র।

ভুজঙ্গ এ কথায় ভিতরে-ভিতরে খুসি হোল। কিন্তু সেকথা গোপন ক'রে বললে, অমন নিশ্চিন্ত হয়ো না কল্যাণী, 'কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে!'

মাথা নেড়ে শ্রী বললে, কেউ না জানুক, আমি জানি।

ভুজঙ্গ বললে, যাক সে কথা। কিন্তু ব্রততীর সম্বন্ধে যে কথা অন্য যে-কোনো লোক ভাবত, সে কথা তুমি ভাবো না কেন?

—মেয়ে মানুষ ব'লে। আমি বুঝতে পারি তার মনের কথা।

—হুঁ!—ব'লে ভুজঙ্গ সশব্দে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তারপর বললে,—আমাকে কোনো মেয়েই কি ভালোবাসতে পারে না শ্রী?

শ্রী হেসে উঠলো: তা কি ক'রে জানবো? কেন, দুঃখ আছে নাকি?

—আছে না?—কৃত্রিম বেদনায় কণ্ঠ কোমল ক'রে ভুজঙ্গ বললে,—মনে হয়, আমি যেন একটা মরুভূমি। যতদূর হাত বাড়াই, জলধারা যায় স'রে।

বেদনার সুস্পষ্ট কৃত্রিমতা সত্ত্বেও শ্রী কেমন যেন চমকে উঠে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে।

ভুজঙ্গ তা লক্ষ্য করলো না। জানলার বাইরে চেয়ে কি যেন খানিক ভাবলে তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আচ্ছা মনে কর যদিই কোনো মেয়ে আমাকে ভালোবেসেই ফেলে। কি হয় তাহ'লে? কল্পনা করতে পারো?

—পারি।

—বলো, কি হয় তাহ'লে।

—বলব?

—নির্ভয়ে বলতে পারো।

শ্রী একটু যেন দ্বিধা করলে, একটু কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ বললে, তুমি সে ভালোবাসা সইতে পারবে না।

—সইতে পারব না?—বিস্ময়ে ভুজঙ্গের চোখ কপালে উঠলো,—তার মানে?

—তার মানে জিগ্যেস কোরো না।

ব'লেই যেন ঝড়ের মতো শ্রী বেরিয়ে গেল।

ভুজঙ্গ ডাকলে, শোনো, শোনো।

শ্রী কিন্তু ফিরলো না।

বিকালে মণিকা এবং তার সঙ্গে স্বয়ং মিঃ দাস তাঁর হ্রস্ব, স্থূল দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। ফ্লাটে উঠেই হাঁক দিলেন, আমার কল্যাণীমা কই গো!

শ্রী এবং ভুজঙ্গ দুজনেই শশব্যস্তে এসে দাঁড়ালো: আসুন, আসুন!

বড় বসবার ঘরখানিতে ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসালো। অনুযোগ ক'রে ভুজঙ্গ বললে, এঁকে কেন কষ্ট দিলেন মিস দাস?

মণিকা উত্তর দেবার পূর্বেই মিঃ দাস বললেন, এখন কষ্ট দেওয়াই বটে মিঃ মল্লিক। কিন্তু একদিন ছিল ছিল যখন এই বম্বে শহরে কোথায় কে বাঙালী আসছেন, কোথায় উঠেছেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, সে খবর আমিই সব চেয়ে আগে রাখতাম। ওটা আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

বলেই মিঃ দাস একটা লম্বা ইতিহাস আরম্ভ করলেন। তাঁর পিতার আমলের ইতিহাস। যখন তাঁদের বাড়ী ছিল নবাগত বাঙালীর একমাত্র হোটেল। তাঁর এজেন্টের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো বাঙালী ভদ্রলোক ষ্টেশন থেকে অন্য হোটেলে গিয়ে উঠলে, শুনতে পেলেই তিনি নিজে গিয়ে হিড় হিড় করে তাঁকে বাক্স-বিছানা সমেত টেনে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে তুলতেন। সে এক দিনই গেছে।

মিঃ দাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখন বাঙালীর সংখ্যাও অসম্ভব বেড়ে গেছে। সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয়ও নেই। তখন আমরা পৃথক বাড়িতে থেকেও যেন পরিবারের মধ্যেই ছিলাম। যাওয়া-আসায়, কাজে-কর্মে সব এক,—তার মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদ ছিল না।

—এখন,—মিঃ দাস উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন,—তবু আমাদের বম্বেতে এখনও কিছুটা আগের চিহ্ন আছে। দিল্লী যান, দেখবেন বাঙালী-সমাজে বৈতনিক জাতি-ভেদ এসে গেছে : একশো টাকা মাইনের কেরাণী, দুশো টাকার কেরাণী, পাঁচশো টাকার কেরাণী, হাজার টাকার অফিসার। সব থাকে পৃথক পৃথক পাড়ায়। কে কোন্ পাড়ায় থাকে জানলেই তার জাত টের পেয়ে যাবেন। বম্বেতে এখনও ততদূর হয়নি।

ভুজঙ্গ বললে, সেই আলোচনাই আমাদের কালকে হচ্ছিল মিঃ দাস। কিন্তু এই যদি অবস্থা হয়, বাঙালীকে বাঁচাবে কে?

—কেউ বাঁচাতে পারবে না মিঃ মল্লিক, যদি বাঙালীকে বাঙালী ভালো না বাসতে পারে। আমার তো দস্তুরমত ভয় হয়, বুঝি বা আমরা ম'রে গেলে বম্বেরও সেই অবস্থাই হয়!

মণিকা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে তার বাপের কথা শুনছিল। এবার জোর ক'রে বললে, আমরা সেই জন্যেই তো সমিতি করছি বাবা। সমাজে মেয়েরাই হোল প্রাণ। মেয়েরা যদি একেই কেন্দ্র ক'রে পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে, পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশ নিতে পারে, তা'হলে, আমি মনে করি, খুব বড় একটা কাজই হবে। কি বলেন মিঃ মল্লিক?

ভুজঙ্গ বললে, প্রাণ খুলে যা করা যাবে, তাতেই বড় কাজ হবে। কিন্তু প্রাণ খুলতে পারলে তো?

মণিকা বললে, পারব না এমন আশঙ্কা করছেন কেন? জানো বাবা, মেয়েদের উপর মিঃ মল্লিক ভীষণ চটা।

মিঃ দাস হেসে বললে, তুই বললেই মেনে নোব চটা? মেয়েদের উপর চটলে যে মায়ের উপর চটতে হয়,—বোনের উপর, মেয়ের উপর চটতে হয়। মিঃ মল্লিক এখনও মেয়ের বাপ হননি বটে, কিন্তু মায়ের ছেলে তো!

মণিকা বললে, ওটা তোমার সেকেলে কথা বাবা। তখন মেয়েরা ছিল শুধু মা, বোন, মেয়ে, স্ত্রী। এ কালে মেয়েরা হয়েছে পুরুষের সমকক্ষ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং একালে পুরুষের নারী-বিদ্বেষ খুবই স্বাভাবিক।

—আচ্ছা এই যে কথা বললি মা,—মিঃ দাস যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন,—তুমি উঠো না মা কল্যাণী। ঝগড়া যখন বাধালে তখন ভালো ক'রেই মায়ে-ছেলেয় বেধে যাক।

শ্রী যাচ্ছিল অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থায়। মৃদু হেসে বললে, আপনারা যুদ্ধ আরম্ভ করুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

—দেরি কোরো না। যুদ্ধ বাসি হ'লে মিইয়ে যায়। —ব'লে মিঃ দাস মেয়ের দিকে ফিরে বললেন,—তুই বিয়ে করিস নি তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বললি। নইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথায় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস?

এই সময় শ্রী এসে মণিকার গা ঘেঁসে বসলো।

তার দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে বললে, মনে কর্ এই কল্যাণীমা চাকরীতে ঢুকছে। মিঃ মল্লিকও চাকরীতে ঢুকেছেন। ওঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা কোথায়? দু'জনে খেটে-খুটে পয়সা আনছেন, ছেলেমেয়ে এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে খরচ করছেন। হাসছিস কি? আজ না হয় ছেলেপুলে হয়নি, কিন্তু হবে তো দু'দিন পরে।

লজ্জায় শ্রীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো সে কথা শুনে। তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। চায়ের তদ্বিরের অছিলায় সে আবার বাইরে চলে গেল। তার মনে হোল, খাবার ছাড়া আর কিছু দিয়ে এই বৃদ্ধের মুখ বন্ধ করা যাবে না। বয়সের ধর্মই এই যে, একবার মুখলে আর রক্ষা নেই।

বিজয়গর্বে মিঃ দাস বলতে লাগলেন, স্ত্রী-পুরুষকে আলদা ক'রে দেখলেই ওই সব কথা মনে হয়। সে ভুল ভাঙে ঘরের দিকে চাইলেই। তখন পরিষ্কার হয়ে যায়, দুজনে মিলে তবে এক। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, একে অন্যের পরিপূরক, —তা সে সমাজব্যবস্থা যাই হোক না কেন। কেমন? স্বীকার কর কি না?

না ক'রে উপায় ছিল না। চা এসে গেছে তখন। স্বীকার না করলে তা নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুতরাং সকলে সমস্বরে বললে, করি। নিশ্চয় করি।

—পথে এস বাছাধন।—ব'লে মিঃ দাস তাঁর চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন একটা ঝাপটার সঙ্গে।

সশব্দে হ্রায়ে একটা চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে মিঃ দাস বললেন, আগামী ২৫শে তারিখে আমার মণিকার জন্মদিন। আপনাদের উভয়কেই তার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। মণিকে আপনারা ভালোবাসেন। আপনারা যে যাবেন তাতে আমার সন্দেহ নাই। এ শুধু লৌকিকতা।

বলে মিঃ দাস সশব্দে হেসে উঠলেন।

—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব। এ কি বলতে হবে?—বলে ভুজঙ্গ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মণিকার দিকে চাইলে।

আর শ্রী নিঃশব্দে পরম প্রীতিভরে মণিকাকে জড়িয়ে ধরলে।

মণিকা বললে, তোমাকে কিন্তু এ ক'য়দিন একটু খাটাব কল্যাণীদি। ২৫শের আর দেরি তো নেই।

শ্রী বললে, খুব আনন্দের সঙ্গে খাটব। আর প্রার্থনা করব, এর চেয়ে বড় আনন্দের দিন তাড়াতাড়ি এসে পড়ুক। তখন যা খাটব সে আমার মনেই আছে।

মিঃ দাস আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, সেই প্রার্থনাই কর মা। আমারও বয়স হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ওর জন্যে আমার চিন্তা হয়।

শেষ কথাগুলি এমন মৃদুস্বরে বললেন যে, সমস্ত ঘরের হাওয়া অকস্মাৎ ভারী হয়ে উঠলো। মণিকা লজ্জা পেলো। এ সমস্ত কথা বাইরের লোকের কাছে বলবার নয়। কিন্তু তার উন্মুক্তহৃদয় পিতার কাছে ঘর-বাহির নেই। অল্পদিনের পরিচিতকেও অত্যন্ত সহজে বিশ্বাস করতে এবং আপনার ভাবতে তাঁর বাধে না। পাছে আরও কিছু তিনি ব'লে ফেলেন এই ভয়ে মণিকা বললে, এইবারে ওঠো বাবা, আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে যে।

মিঃ দাস যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, আবার যেতে হবে কি রে! এখানে ব'সে গল্প করবি বলেই যে, সব জায়গা সেরে সব শেষে এখানে আসা হোল। আর তো নেমন্তন্ন করার নেই। ভুলে গেলি? বের কর ফর্দ।

হা হা ক'রে হেসে বললেন, জানেন মিঃ মল্লিক, মণি সারাদিন তার ছোট গাড়িখানা নিয়ে বম্বে সহর চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওর সব চেয়ে ভালো লাগে এইখানটা। আমার কল্যাণীমাকে ওর কী ভালোই যে লেগেছে!

মণিকা শ্রান্ত স্বরে বললে, তা হোক বাবা, আজ ওঠো। অনেক খোয়া হয়েছে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে মিঃ দাস এবারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : তাই তো রে! সন্ধ্যে হয়ে আসে। আজ উঠি মিঃ মল্লিক। সেদিন আসবেন যেন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ওরা মিঃ দাস ও মণিকাকে সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে।

ওঁরা চলে যেতে শ্রী বললে, আশ্চর্য মানুষ এই মিঃ দাস। মনটি গঙ্গাজলের মতো। আত্মপর ভেদ নেই। আমি ভাবি, এত ভালোমানুষ এত বড় কারবার চালান কি ক'রে?

ভুজঙ্গ হেসে উঠলো। বললে, আমিও ওই কথাই ভাবতাম। খবর নিয়ে জানলাম বহুলোক ওঁকে রীতিমতো ঠকিয়েছেও,—কেউ ওঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে, কেউ বা দোকানে গহনা কিনে।

—খুবই স্বাভাবিক। ওঁকে ঠকানো এত সহজ যে সে প্রলোভন সম্বরণ করাই অনেকের পক্ষে কঠিন।

—অথচ দেখ, তাতে ওঁর কারবারের কিছু ক্ষতি হয় নি। কারবার শুধু যে চলেছে তাই নয়, এত বড় জুয়েলার বম্বে সহরেও বেশি নেই।

—আমি অবাক হয়ে যাই।

—একদিন আমি আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে ওঁকে কথাটা জিগ্যেসই ক'রে বসলাম। বুঝতেই পারো, ওঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে কারও বাধে না।

—কি বললেন?

—উনি হাসলেন। বললেন, তার কারণ কি জানেন, সংসারে এখনও ভালো লোকেরাই সংখ্যায় বেশি। তা যদি না হোত, তা'হলে আমার কেন, অতি-বড় বুদ্ধিমানেরও ব্যবসা চলতো না। কিন্তু এও স্বীকার করি, এ কারবার যে কি ক'রে এত বড় হোল তা আমিও জানি না।

বললাম, সে কি ক'রে হয়? আপনিই এর প্রাণ, আপনি জানেন না?

বললেন, ওইটিই ভুল মিঃ মল্লিক। এর প্রাণ আমার পিতামহও ছিলেন না, পিতাও ছিলেন না, আমিও নই। তা যদি হোত, তাহ'লে কর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে এও উঠে যেত। আমরা শুধু কাজ ক'রে যাবার মালিক, কাজ ক'রে যাই।

একটু পরে বললেন, লোকে ভাবে আমি বুঝি খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ী। কিন্তু আমিও জানি, যাঁরা আমাকে চেনেন তাঁরাও জানেন, আমি কি। এ কথা খুবই সত্যি যে, কারবার আমার হাতে অনেক বেড়েছে। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কি ক'রে বেড়েছে, আমি উত্তর দিতে পারব না। পিছনের দিকে চেয়ে আমি সে রহস্যের কিনারা করতে পারি না। সেজন্যে ব্যবসা সম্বন্ধে কাউকে উপদেশ দিতে যাই না। যারা বয়সে ছোট, নতুন নামছে, তাদের শুধু বলি: কারো কাছে ঠকবো না এ দম্ভ ফাঁকা, কিন্তু কাউকে ঠকাবো না এ দম্ভ নিঃসঙ্কোচে যেন করতে পারো।

ভুজঙ্গ চুপ করলে। শ্রীও শুনে চুপ ক'রেই রইল।

ভুজঙ্গ বললে, টাকা আমাকে আকর্ষণ করে না। যে মানুষ টাকা করে, তারও সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই। কিন্তু এক একটা মানুষ হঠাৎ চোখে প'ড়ে যায়, আর্থিক জগতে সফল হোক না হোক, মানুষ হিসাবে যাদের এমন একটি মহিমা ফুটে ওঠে যে, শ্রদ্ধা আপনি আসে। মিঃ দাস তেমনি মানুষ। সাধারণের কাছে তাঁর যে মর্যাদা তা তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে। আমি কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করি মানুষ হিসাবে।' যদি শুনতাম, ঔদার্য্যের এবং সরলতার ফলে তাঁর কারবার উঠে গেছে, তবুও ঠিক এমনি শ্রদ্ধা করতাম। তোমাকে তিনি কল্যাণীয়া বলেন, সে শুধু মুখের সম্বোধনই নয়। তাঁর ডাকার ভঙ্গীতে, তাঁর কণ্ঠস্বরেই অন্তরের স্পর্শ পাওয়া যায়।

শ্রী শুধু বললে, সত্যি। কিন্তু মেয়েটি বাপের মন পেয়েছে, সংযম পায়নি। ওর আনন্দ হালকা হাওয়ায় প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানোতে।

প্রতিবাদ ক'রে ভুজঙ্গ বললে, তুমি মণিকার সম্বন্ধে অবিচার করলে শ্রী।

শ্রী বললে, না, না। আমি ওর সম্বন্ধে নিন্দের কিছু বলিনি। ওর মনের প্রকৃতি তাই। সেটা দোষেরও নয়, সে অপরাধও ওর নয়।

ভুজঙ্গ বললে, কিন্তু ওর মধ্যে শক্ত মেয়েও একটি আছে। কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ কম। সেই জিনিষটি আজকে লক্ষ্য ক'রে মুগ্ধ হয়েছি। ভ্রূকুটি ও হানে না। কিন্তু যখন হানে তা অমোঘ। লক্ষ্য করনি?

—করেছি। কিন্তু স্নেহার্ত পিতার কাছে মেয়ের সব অস্ত্রই অমোঘ। যখন ছেলেমেয়ের বাপ হবে, তখন বুঝবে।

শেষের কথাটা অকস্মাৎ ব'লে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে প'ড়ে গেল মিঃ দাসের কথা। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের লজ্জা যেন তার মুখে আবীর ছড়িয়ে দিলে এবং সেই দুঃসহ ধিক্কার থেকে পরিত্রাণের জন্যে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার উপায় রইল না।

ভুজঙ্গ সবটাই বুঝলে। মনে মনে একটু হাসলোও। মিনিট পোনেরো পরে যে বারান্দায় শ্রী গিয়ে বসেছিল সেইখানে গেল। সহজ কণ্ঠে বললে, ভেবেছিলাম এই সপ্তাহে একবার ক'লকাতা থেকে ঘুরে আসব। কিন্তু মণিকার জন্মতিথি না পার ক'রে যাওয়া কি ঠিক হবে? গেলে হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটকেও যেতে পারি। কি বলো তুমি?

—না। বরং ২৫শের পরেই যেও। যদি কোনো কারণে আসতে না পারো, মণিকা এবং মিঃ দাস দুজনেই দুঃখ পাবেন।

—আমিও তাই বলি। মণিকার মধ্যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে। ওঁর সম্পর্কে তুমি একটু সজাগ থেকো। ওঁকে পাওয়া গেলে খুব সুবিধা হয়।

শ্রী হাসলে। বললে, দেখব। কিন্তু আমি বলি কি, তুমি নিজেই একটু চেষ্টা কর। এ বিষয়ে তোমার হাত পাকা।

হাসলে ভুজঙ্গও। বললে, সে পুরুষের সম্বন্ধে। মেয়েদের ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে যায়। এ তিরস্কার তো তুমিও কতদিন করেছ।

—আমার সেই তিরস্কার তুমি মিথ্যা প্রমাণ করে দাও।

ভুজঙ্গ এর আর উত্তর দিলে না। শুধু বললে, মণিকাকে পেলে এখানেও আমরা কিছু কাজ করতে পারি। এ আলস্য আর ভালো লাগে না! মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ধরা দিই পুলিশের হাতে। অথচ তাও পারিনে।

ভুজঙ্গ হেসে অন্য ঘরে চ'লে গেল।

চৌদ্দ

ব্রততীর সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে তার মস্ত বড় গাড়িখানা। সেখানা যখন ইলাদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন,—ব্রততীকে চিনুক আর না চিনুক,—ইলাদের বাড়িতে তার সম্বর্ধনার অভাব ঘটলো না।

সসম্ভ্রম দ্রুততায় প্রথমে ছুটে এল শঙ্কর। কিন্তু বড় গাড়িখানা থেকে নিতান্ত একটি কুণ্ঠিতা গৃহস্থবধূকে নামতে দেখে সে পিছিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিলে ইলাকে। সে রান্নাঘরে কি একটা করছিল। যখন বাইরে এল তখন দেখলে ব্রততী বসবার ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছে।

ইলা হাতজোড় ক'রে নমস্কার করে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালে: আসুন, আসুন।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি ইলা দেবী?

—আজ্ঞে হাঁ।—বলে ব্রততীর পরিচয়ের জন্যে ইলা নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলে।

ব্রততী বললে, আমার নাম ব্রততী। কিন্তু তাতে কিছুই আপনার কাছে স্পষ্ট হোল না। না?

ব্রততী হেসে ফেললে। ইলাও।

ব্রততী বললে,—স্পষ্টতর পরিচয় হচ্ছে আমি ভুজঙ্গদা'র বোন। এবারে একটু চা খাওয়াবেন নিশ্চয়ই। না?

ভুজঙ্গের নামে ইলার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য-মেয়ে এই ব্রততী। তার চারপাশে কোথাও যেন সে কাঠিন্য রাখতে দেবে না। হাসির আগুনে গলিয়ে সব যেন তরল ক'রে দেয়!

ইলা ব্যস্ত হয়ে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়!

তার চোখের সামনে থেকে ভুজঙ্গ তখন স'রে গেছে,—জ্বলজ্বল করছে প্রকাণ্ড বড় গাড়িখানা। ইলা একরকম ছুটতে ছুটতেই ভিতরে গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

ভুজঙ্গের সম্বন্ধে ইলা কখনই খুব বেশি খবর রাখত না। তার বোন আছে কিনা, অথবা তার পরিবারে আর কে কে আছে, তা জানবার কোনো উপলক্ষ্য কখনও ঘটেনি। বাইরে থেকে সহজ বুদ্ধিতে এইটুকু সে বুঝতো যে, ভুজঙ্গের অবস্থা খুব সচ্ছল নয়। আরও পাঁচজন যারা রাজনীতি করে, তাদের মতো ও-ও ভবঘুরে বাউণ্ডুলে একজন কংগ্রেস-কর্মী। এদের সম্বন্ধে কখনই মনে মনে সে শ্রদ্ধা পোষণ করতো না। বরং ভাবতো, অকারণে অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। বিশেষ করে শুভেন্দুর আঘাতের পরে এবং অগষ্ট বিপ্লবে উত্যক্ত হয়ে সেই শ্রদ্ধার অভাব এখন রীতিমত অশ্রদ্ধায় দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ব্রততীর গাড়িখানা বুঝি সব বিপর্যস্ত করেই দেয়!

ইলা বেশ তাড়াতাড়ি করেই চা এবং কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এল। ব্রততী সাগ্রহে দু'হাত বাড়িয়ে এমন ক'রে প্লেট দুটো নিলে যেন এরই জন্যে সে অপেক্ষা করছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, ভাবি খিদে পেয়ে গিয়েছিল ইলাদি।

—অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন বুঝি?

—অনেকক্ষণ। প্রায় বারোটায়। সেই থেকে টো টো ক'রে ঘুরছি। আপনার কাছে যে আসব, তা বেরোবার সময়ই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এত দেরি হবে ভাবিনি।

একটু থেমে বললে, অথচ আশ্চর্য দেখুন এইখানেই আমার আসল কাজ। যেখানে-যেখানে ঘুরলাম, সেগুলো নিতান্তই সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা।

ব্রততী হাসলে।

এই আত্মীয়তাপরায়ণ অপরিচিতা রহস্যময়ী অসহ্য কৌতূহল সৃষ্টি ক'রে তুলছে। কে এই মেয়ে? কি প্রয়োজনে এসেছে? নাম বললে ব্রততী না? ও নাম ইলা জীবনে কখন শুনেছে ব'লেও স্মরণ হচ্ছে না। বললে ভুজঙ্গের বোন। কিন্তু সেই সুবাদে তাকে ইলাদি বলার মতো কোনো ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে না। ভুজঙ্গের সঙ্গে ইলার পরিচয় নিতান্তই মৌখিক ছিল। সে বাইরে থাকতে তার বোনের সঙ্গেও কখনও পরিচয় করিয়ে দিয়ে যায়নি।

ইলার ইচ্ছা হচ্ছিল, মেয়েটিকে সরাসরি বিদায় করে দেয়। কিন্তু ওর ওই মস্ত বড় গাড়িটাই বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ওকে নিভূর্মিকায় বিদায় করতে পারছে না।

তবু কৌতূহল দমন করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। একটু মিষ্টি ক'রে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আপনার প্রয়োজনটাই তো এখনও পর্যন্ত শুনতে পেলাম না।

ব্রততী বললে, দেখুন আমার আসল দরকারটা কিন্তু আপনার দাদার সঙ্গে। কিন্তু বিনাপরিচয়ে তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয় ব'লেই আপনার কাছে এসেছি।

ব্যাপারটা বোঝালো মনে হচ্ছে। শ্রী গা-ঢাকা দেওয়ার পর থেকে এইরকম অনেক উৎপাত, শুধু শুভেন্দু নয়, তাকেও ভোগ করতে হয়েছে। পুলিশ কত ভাবে কত রকম ক'রে যে শ্রীর ঠিকানার জন্যে ওদের উত্যক্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং সে একটু শক্ত হয়ে, তৈরি হয়ে বসলো।

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমি আপনার কি কাজে আসতে পারি বলুন!

ব্রততী জাত-বিপ্লবীর মেয়ে। বুঝতে তার কিছুই বিলম্ব হোল না। মনের হাসি মনেই চেপে বললে, কাজ কিছুই নয়। দাদার খবর অনেকদিন পাইনি। মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে আছে সেজন্যে। ভাবলাম, আপনি হয়তো খবর দিতে পারবেন।

শাণিতকণ্ঠে ইলা বললে, কিছুই খবর দিতে পারি না। আমি কি ক'রে দোব?

—শুভেন্দুদার কাছ থেকে কিছু শোনেন নি?

ইলার গা জ্বালা ক'রে উঠলো। মেয়েটা গায়ে পড়ে সকলের সঙ্গে দাদা-দিদি পাতায়। সেই জ্বালা তার সাধ্যমত সংযম ভেদ ক'রেও ফুটে উঠলো, যখন সে বললে, না। শুনিনি কিছুই।

ব্রততী বুঝলে, ও সন্দেহ করেছে তাকে। তাতে সে রাগ করল না। কারণ এরকম ক্ষেত্রে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর

থেকে ছোট্ট একখানি চিঠি বের করে ইলার হাতে দিলে। বললে, দিন দশেক আগে দাদার কাছ থেকে এই শেষ চিঠি পেয়েছি। তাতে লিখছেন, শিগগির তিনি কলকাতা আসছেন। অথচ দশ দিন হয়ে গেল। ভাবছি সেই জন্যেই।

ইলা চিঠিখানা উলটে-পালটে দেখলে। উপরে কোনো ঠিকানা নেই। ভুজঙ্গের হাতের লেখাও সে চেনে না। সুতরাং সে কি করে বিশ্বাস করে, এই একখানা চিঠির উপর?

মাথা নেড়ে সংক্ষেপে সে জানালে, ওদের কোনো খবরই সে রাখে না।

এবারে ব্রততী খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, কিন্তু খবরটা যে আমার নিতান্তই প্রয়োজন।

ইলা বললে, তা'হলে তার পরের চিঠির জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়।

ব্রততী দমে গেল। বললে, একটু দয়া যদি আপনি করেন।

তার কণ্ঠস্বর রীতিমত করুণ।

ইলা বললে, বলুন।

—আপনার দাদার সঙ্গে যদি পরিচয় করিয়ে দেন।

—বেশ। আসবেন একদিন।

ব্রততী ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, একদিন নয়, আজই, এখনই। আমার গাড়ি রয়েছে। বেশিক্ষণ লাগবে না। এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে ফের পৌঁছে দোব আপনাকে। যাবেন দয়া করে?

দাদার সঙ্গে ইলারও দেখা হয়নি অনেক দিন। শ্রীর অন্তর্ধানের পর থেকে, যদিও বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে, মনের একেবারে অতলে শুভেন্দুর যে গভীর পরিবর্তন হয়েছে, ইলা তা টের পায়। দাদাকে নিজের বাড়িতে থাকবার জন্যে বহু অনুরোধ সে করেছে। ফল হয়নি। আঘাত থেকে সেরে ওঠার পর একটা দিনও সে থাকেনি। ইলা জানে, কেন থাকেনি। শ্রীর জন্যে। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে চকিতের মতো হঠাৎ একদিন সে এসে পড়তে পারে। সেদিন ব্যর্থ হয়ে যেন সে ফিরে না যায় এইজন্যে শুভেন্দু তার নির্জন, নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে যেন শবরীর মতো প্রতীক্ষা করছে। এই কথাটা ভাবতেই ইলার সর্বাঙ্গ শ্রীর বিরুদ্ধে জ্বালা করে ওঠে।

কিন্তু মন মানে না। কেমন আছে দাদা, কি হচ্ছে তার খাওয়া-দাওয়ার, ভেবে সে যথেষ্ট যন্ত্রণা বোধ করে। তাই ব্রততী সম্বন্ধে তার মন খুব পরিষ্কার না হোলেও সে রাজি হোল।

বললে, বেশ। আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ফিরতে যেন বেশি দেরি না হয়।

ব্যস্তভাবে ব্রততী বললে, কিছু দেরি হবে না। অন্ততঃ আমার জন্যে দেরি হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি তৈরি হয়ে আসুন।

শুভেন্দুর ফ্ল্যাটে এসে কড়া নাড়তেই চাকরটা দরজা খুলে দিলে। তাকে দেখে ইলা আশ্বস্ত হোল। যাক, পালায়নি এখনও এটা। দাদার খাওয়া-দাওয়া চলছে।

কিন্তু ঘর সমস্ত অন্ধকার কেন? নেই নাকি শুভেন্দু?

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, দাদা নেই?

—আছেন। —চাকরটা হাত-ইসারায় দেখিয়ে দিলে শুভেন্দুর পড়ার ঘরটা।

কিন্তু সেটাও অন্ধকার। কোনো মানুষের অস্তিত্বের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না,—নড়া-চড়া, এমন কি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও না।

ইলা ভয়ে ভয়ে ডাকলে, দাদা!

সাড়া পাওয়া গেল: কে রে, ইলা? আয়। ডান দিকেই সুইচটা।

সুইচটা টিপে ঘরে ঢুকতেই ওরা দেখলে, একখানা ঈজি চেয়ারে অসাড় হয়ে শুভেন্দু নির্জীবের মতো পড়ে। অপরিচিতা ব্রততীকে দেখে একটু সসম্ভ্রমে ওঠবার চেষ্টা করলে।

ইলা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার জ্বর হয়নি তো?

—না, না।—শুভেন্দু বিব্রতভাবে জানালে।

কিন্তু মুখে ওর অসীম ক্লান্তি। সেদিকে চেয়ে ইলা দাদার কথায় যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত হোল। না, জ্বর নয়।

ইতিমধ্যে ব্রততী নিঃশব্দে নত হয়ে শুভেন্দুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

অপরিচিতা একটি মহিলাকে এমন নিঃসঙ্কোচে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখে শুভেন্দু বিব্রতভাবে বাধা দেবার জন্যে প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

ইলাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ভাব দমন ক'রে বললে, এঁর নাম ব্রততী। ইনি ভুজঙ্গবাবুর বোন। তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ইনিই আমাকে টেনে এনেছেন এখানে।

—ভুজঙ্গবাবুর বোন!—যেন একেই শুভেন্দু খুঁজছিল। বললে, খুব ভালো হয়েছে এসেছ। ওদের খবর কি?

ব্রততী বললে, সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে আপনার কাছে আসা। দিন দশেক আগে এই চিঠিখানা পেয়েছি। তারপরে আর কোনো চিঠি পাইনি।

ব'লে ভুজঙ্গের চিঠিখানা এগিয়ে দিলে।

শুভেন্দু চিঠিখানা পড়লে। ভুজঙ্গের হাতের লেখা তার পরিচিত। বিশেষ সই করেছে 'মল্লিকদা'। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ আর রইল না। তবু ঘা খেয়ে-খেয়ে শুভেন্দু যেন খানিকটা সেয়ানা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলে, আমার ধারণা ছিল ভুজঙ্গবাবুর কোনো সহোদরা নেই।

—আমি তাঁর সহোদরা কেন দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়াও নই।—ব্রততী হাসতে হাসতে বললে।

—তবে যে ইলা বললে,

—ঠিকই বলেছেন। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও হৃদয়ের সম্পর্কে সত্যি-কারের দাদা তিনি।

ইলার এ সমস্ত প্রসঙ্গ ভালো লাগছিল না। সে বললে, তোমরা গল্প কর। আমি একবার রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। দেখে আসি, দাদার রান্না-বাড়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে।

শুভেন্দু সহাস্যে বাধা দিয়ে বললে, না, তোমাকে আর দেখতে যেতে হবেনা। যা হচ্ছে, চমৎকার হচ্ছে।

সে নিষেধ ইলা শুনলে না। বললে, চমৎকার যা হচ্ছে তা আমিও জানি।

ব'লে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

শুভেন্দু ওর যাওয়ার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল, অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটু ভাবলে। তারপর ব্রততীর দিকে চেয়ে বললে, শ্রীর জন্যে আমার উদ্বেগ হয়। সে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। কখন কি যে ক'রে বসে তার স্থিরতা নেই। ভরসা এই যে ভুজঙ্গবাবু আছেন। তিনি ধীর, স্থির, তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

ব্রততী বললে, তাঁকে ভালো ক'রে জানবার সুযোগ আমার হয়নি। বলতে গেলে একটা রাত্রির পরিচয়। তবে আমার স্বামীর উনি বাল্যবন্ধু। তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি,

বিস্মিতভাবে শুভেন্দু বললে, মোটে একটা রাত্রির পরিচয়। আর তাই থেকে তিনি তোমার দাদা?

—একটা রাত্রি কি কম সময় শুভেন্দুদা?

—না বোন। জানবার পক্ষে একটা রাত্রিই যথেষ্ট—না জানবার পক্ষে অনন্ত কালও কিছুই নয়। আমারও জীবনে এমন ঘটেছে। আচ্ছা ব্রততী, আমি শুনেছি ভুজঙ্গবাবুদের আরও কে যেন কিছু টাকা পাঠান। সে কি তুমি?

লজ্জায় ব্রততী মুখ নামিয়ে ফেললে। বললে, কখনও কখনও খুব সামান্যই পাঠাই। আমি পাব কোথায়?

ব্রততীর গাড়িখানা শুভেন্দু দেখেনি। চোখে দেখছে, গায়ে প্রায় নিরাভরণ, অঙ্গে মোটা খদ্দরের শাড়ি। শুভেন্দুর মনে হোল, ভুজঙ্গের উপর শ্রদ্ধাবশে এই মেয়েটি হয়তো খুব কষ্ট ক'রেই কিছু কিছু টাকা পাঠায়। ওর উপর স্নেহে শুভেন্দুর মন কোমল হোল।

এমন সময় ইলা এল প্রায় চীৎকার করতে করতে। বললে, তোমাকে আর একটা মুহূর্ত্ত আমি এখানে রাখব না দাদা। চলো আমার সঙ্গে এখনই।

—কি হোল রে?—হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে শুভেন্দু।

—কি হোল?—রাগে ইলার চোখ ফেটে জল এসে গেছে। ব্রততীর দিকে চেয়ে বললে, আপনি আসুন তো একবার রান্নাঘরে। দেখে যান, চাকরটা যা রেঁধেছে, ভিখারীতেও তা খেতে পারে কি না।'

শুভেন্দুকে প্রতিবাদের সুযোগ পর্য্যন্ত না দিয়ে ইলা ব্রততীকে এক রকম টানতে টানতেই রান্নাঘরে নিয়ে গেল।

ইলা বাড়িয়ে বলেনি এতটুকু। একটা থালায় কালো মতো কী একটা রয়েছে। চাকরটা বললে, কাঁচকলার কোপ্তা। জলের মতো একটু ডাল। আর ভাত যে সিদ্ধ হয়নি তা, পুরুষে না পারলেও, মেয়েরা একবার চাইলেই টের পায়।

ইলা আবার চললো দুম দুম ক'রে পা ফেলে দাদার ঘরে।

ব্রততী বললে, আমাকে একটুখানি ছেড়ে দেবেন ইলাদি? আমার দেরি হবে না।

ইলা বললে, আমি দাদাকে নিয়ে যাব। আপনাকে এখন ছাড়তে পারি না। আমাদের পৌঁছে দিতে হবে।

– নিয়ে যাবেন দাদাকে?—ব্রততী খুশি হয়ে বললে,—নিশ্চয়ই পৌঁছে দোব। চলুন তাহ'লে।

ওরা শুভেন্দুর ঘরে ফিরে এল।

ইলা দাদার পায়ের তলায় ব'সে তীব্র কণ্ঠে বললে, তুমি ওঠো দাদা। আর আর এক ঘণ্টাও তোমাকে এখানে থাকতে দোব না। যাবো না বললে তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ব ব'লে দিচ্ছি।

শুভেন্দু এতক্ষণ হাসছিল। এইবার তার মুখের উপর দিয়ে যেন একটা বিরক্তির ছায়া খেলে গেল। কিন্তু সহজ কণ্ঠেই বললে, সুস্থ হয়ে বোস দেখি ইলা। আমার উত্তর দে ঃ এখানকার বাসা উঠিয়ে দোব?

দাও।

—চাকরটা কোথায় যাবে?

—চুলোয়।

—কিন্তু তোর বাড়িতে থাকব, শঙ্কর আমাকে কতদিন খেতে দেবে?

—চিরকাল। যতদিন তুমি থাকবে।

দুজনেই হেসে ফেললে।

শুভেন্দু বললে, যা হয় না, তা নিয়ে মিথ্যে পাগলামি করা কাজের কথা নয়।

ইলা রেগে বললে, তাহ'লে কাজের কথাটা কি?

—এখানে থাকতে হবে।

ইলা গুম হয়ে ব'সে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রততীর দিকে চেয়ে বললে, তাহ'লে আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন।

—চলুন।

ব'লে ব্রততী বারান্দা থেকে ফের শুভেন্দুর ঘরে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার রাত্রে খেতে ক'টা হয় ?

শুভেন্দু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। ব্রততীর সব কথা তাব ঠিক কানে পৌঁছায়নি। জিজ্ঞাসা করলে, কি বললে ?

ব্রততী তাব প্রশ্নের পুনাবাবৃত্তি করলে।

শুভেন্দু বললে, অভ্যেস বলে কিছু আমার নেই। কোনোদিন ন'টা হয়, কোনাদিন বা দশটাও হয়।

—আচ্ছা।

ব্রততী ইলাকে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়লো।

রাত্রি তখন ন'টা বাজেনি বোধ করি, শুভেন্দুর ফ্ল্যাটেব দরজায় ফের ধাক্কা পড়লো। চাকরটার মেজাজ আজ সন্ধ্যাবেলাতেই ইলা খারাপ করে দিয়ে গেছে। এত রাত্রে নতুন অভ্যাগতের আবির্ভাবে সে বিরক্ত হয়ে উঠলো।

চড়া মেজাজেই জিজ্ঞাসা করলে, কে ?

—দরজা খোলো।

বামা কণ্ঠস্বর। লোকটি যে বাবুর বহিন সে-বিষয়ে সন্দেহ হইল না। এবং ঠিক বাবুর খাবার সময়েই তাঁর পুনরাবির্ভাবে ভয়ে সে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে একপাশে বিরক্ত এবং বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

—বাবুর খাওয়া হয়েছে ?

ব্রততীর দু'হাতের টিফিন-ক্যারিয়ার দুটোর দিকে সকৌতূহলে চেয়ে সে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জানালে, না।

—আচ্ছা, তাহলে তুমি বাবুর খাবার জায়গাটা চটপট ক'রে দাও দেখি। কোন ঘরে খান তিনি ?

চাকরটা আঙুল দিয়ে সামনের ঘরটা দেখিয়ে ব্যস্তভাবে খাবার জায়গা ক'রে দিলে। টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে বের ক'রে থালার উপর লুচি, বাটিতে বাটিতে ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস সাজিয়ে দিয়ে চাকরটাকে ব্রততী বললে, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি বাবুকে ডেকে আনি।

সেই অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘর। ওদিকের খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঝেয়, শুভেন্দুর পায়ের কাছে। কোলের উপর তার বদ্ধাঞ্জলি। স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে শুভেন্দুর দুই চোখ মুদ্রিত। সে ধ্যানস্থ না নিদ্রিত, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ব্রততীর মনে হলো, এ নিদ্রা নয়—নিদ্রায় মানুষের মাথা এলিয়ে পড়ে।

হাতের কাছে ডান দিকে সুইচ, ব্রততীর জানা আছে। কিন্তু আলো জ্বালতে তার ইচ্ছা হোল না। হয়তো ওর ধ্যানভঙ্গ করতোও না, যদি না খাবার জুড়িয়ে যাবার ভয় থাকতো।

আস্তে আস্তে ডাকলে, দাদা!

শুভেন্দু চমকে উঠলো : কে, ইলা?

—আমি ব্রততী।

—ব্রততী? আলোটা জ্বালো। ডান দিকেই সুইচ। ব্রততী আলোটা জ্বাললে।

—ওঃ তুমি! আবার ফিরে এলে যে! কিছু খবর আছে?

—আছে। ওঘরে চলুন, খেতে খেতে শুনবেন।

—চল।

আসনে বসতে গিয়ে শুভেন্দু চমকে উঠলো : এ কি কাণ্ড!

লজ্জিত হাস্যে ব্রততী বললে, কিছুই নয়। আপনি খেতে বসুন, আমি গল্প করি।

শুভেন্দুর সমস্ত মুখ একটা অপার্থিব আনন্দে ভ'রে উঠলো। প্রতিবাদ ক'রে অথবা ভদ্রতা জানিয়ে একটা কথাও বললে না। কেবল বললে, সেই ভালো। শুধু মনে হচ্ছে, ইলাটা বড় মন-খারাপ করে গেছে। সে থাকলে তার মনটা এই খাবার দেখে খুসি হোত।

খাবারের থালাটা সে কোলের দিকে টেনে নিলে।

ব্রততী বললে, আমি বলছিলাম কি, আপনি একবার বস্বে থেকে ঘুরে আসুন না।

—কি হবে ?

—একবার দেখা তো হবে।

—তাতে লাভ কি ?

—কি তাঁরা করতে চান, ফেরবার ইচ্ছা আছে কি না, জানা তো হবে। চিঠিতে ওসব কথা তাঁরাও লিখতে পারেন না, আমরাও না।

একটু চুপ ক'রে শুভেন্দু বললে, রাজনীতিচর্চা কখনও করিনি। ও আমি বুঝিও না। তাছাড়া জানো না বোধ হয়, ওখানে ও'রা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করছেন। আমি গেলে হয়তো লজ্জা পাবেন।

ব্রততী যেন আকাশ থেকে পড়লো : স্বামী-স্ত্রী হিসাবে কেন ?

—আত্মগোপনের কৌশল হিসাবে সেইটেই সব চেয়ে উপযোগী।— জবাব দিলে শুভেন্দু। এবং ব্রততীর সংশয়-কঠিন মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বললে,—না, না। এ নিয়ে মনে কোনো প্রশ্ন এনো না। ওঁদের আমি চিনি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যা করা উচিত, তোমার দাদা তা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। কিন্তু তাঁকে তো চিনি। যা করা অনুচিত কখনও তা করবেন না।

ব্রততীর মনের দ্বিধা তথাপি যাচ্ছে না, তার দিকে চেয়ে সে কথা বুঝেই শুভেন্দু পুনরায় বললে, ব্রততী, চব্বিশ ঘণ্টা যারা আগুনের উপর দিয়ে চলে, তাদের কখনও সাধারণ সামাজিক মানুষের মাপকাঠিতে বিচার করতে যেও না,—ভুল করবে। ওরা সাধারণ এবং স্বাভাবিক জীবন যে যাপন করে না, শ্রীকে পেয়ে সেকথা আমি নিঃসংশয়ে বুঝেছি। ওদের নীতি-শাস্ত্র সর্বত্র আমাদের সঙ্গে এক নয়।

—আপনাকে আর একটু মাংস দিই।

—দাও। অনেকদিন পরে ভাল খাচ্ছি। তার মানে কিন্তু এ নয় যে, খারাপ খাওয়াটা খারাপ। প্রথম প্রথম চাকরটার খারাপ রান্নাও আমার বেশ লাগতো। মুখ বদলানো হোত কি না।

শুভেন্দু হাসতে লাগলো।

—আর একখানা মাছও আপনি খাবেন।

—না। কিন্তু তুমি কত খাবার এনেছ ব্রততী। একজন লোকের খাওয়া সম্বন্ধে তোমার আন্দাজের প্রশংসা করতে পারি না।

এবার ব্রততী হেসে ফেললে। বললে, তাই বই কি! শুধু আপনার জন্যেই এনেছি কি না!

শুভেন্দু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তবে? আর কে আছে?

—আপনার চাকরটা খাবে না?

শুভেন্দু চমকে ব্রততীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। তার পরে শান্ত কণ্ঠে বললে, ঠিক। ওর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ওই-ই আমাকে খাওয়াবে, এইটেই ভাবতে অভ্যস্ত। ওকেও যে আমার খাওয়াবার কথা সেটা মনে পড়ে না। এমনি স্বার্থপর আমরা।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ব্রততী, আমার রান্নার অবস্থা দেখেই কি এগুলো নিয়ে এলে? সত্যি বোলো।

—না দাদা, আপনাকে খাওয়াবার ইচ্ছা হোল ব'লেই নিয়ে এলাম। নইলে আপনার দুঃখ ঘোচাবার মালিক কি আমি? ইলাদিকে তো অসহায়-ভাবেই চ'লে যেতে হোল।

—ঠিক। ব্রততী, নিস্পৃহভাবে দান কোরো, কিন্তু দয়া কখনও কোরো না, মানুষ দয়া সইতে পারে না। দয়ার এপ্রান্তে রয়েছে গর্ব, ওপ্রান্তে গ্লানি।

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, কিন্তু এ দানও নয় দাদা। এ আপনি বুঝবেন না। প্রিয়জনকে সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে কি আনন্দ রয়েছে, সে শুধু মেয়েরাই জানে।

শুভেন্দু সাড়া দিলে না। বোধ করি মৌনতার দ্বারা সম্মতিই জ্ঞাপন করলে। তারপর নিঃশব্দে খেতে খেতে এক সময় বললে, জানো ব্রততী, ইলার মন শ্রীর ওপর প্রসন্ন নয়।

—কেন?

—ওর ধারণা, শ্রীর জন্যেই আমার এই কষ্ট। শ্রী রাজনীতি না করলে আমার খাওয়া-পরার কষ্ট হোত না। এই জন্যে ও একেবারে স্বদেশীর ওপরই চটে গেছে।

শুভেন্দু হাসলে। তারপর আবার বললে, অথচ শ্রী ওর বাল্যবন্ধু এবং অনেক দিন থেকেই শ্রী রাজনীতিচর্চা করছেন। ও জানতো সেকথা।

ব্রততী বললে, কিন্তু খাওয়া-পরার কষ্ট তো আপনার সত্যিই হচ্ছে দাদা।

—হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে শ্রী নন, আমি নিজেই দায়ী। কারণ সংসার চালানো সম্বন্ধে আমি শুধু অজ্ঞ নই, উদাসীনও।

—পুরুষ মানুষ তাই হয়। কিন্তু তিনি থাকলে এই অসুবিধা আপনার হোত না।

—হয়তো হোত না। তাই ব'লে স্বামীর খবরদারী করাই নারীজীবনের একমাত্র কর্তব্য ব'লে আমি মনে করি না।—শুভেন্দু উত্তেজিতভাবে বললে,—তুমি বলবে, যে-মেয়ে রাজনীতি করবে তার বিয়ে করা উচিত নয়। তার উত্তরে আমি প্রশ্ন করব, কেন নয়? বিবাহিত পুরুষের যদি দেশের প্রতি কর্তব্য থাকে, বিবাহিতা মেয়েরই বা থাকবে না কেন? এই কথাটাই ইলাকে কিছুতে বোঝাতে পারলাম না।

ব্রততী হেসে বললে, আমিও এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুভেন্দু বললে, তার কারণ আমার ব্যক্তিগত কষ্টটা তোমরা দেশের ভবিষ্যতের চেয়েও বড় ক'রে দেখছ। হয়তো যাদের ভালোবাসি তাদের এমনি হ'লে আমারও মনে তোমাদেরই মতো দুর্বলতা জাগতো, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে আমার মন পরিষ্কার। শ্রীর জন্যে আমি গৌরব বোধ করি।

—কিন্তু আপনি তো রাজনীতি চর্চা করেন না।

—তার কারণ, ও আমি পারি না। ঘরের মধ্যে বিনা পরিশ্রমে আমাকে যত দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে বলো, আমি পিছপাও নই। কিন্তু ঘুরে ঘুরে একটা কাজও করতে পারি না।

শুভেন্দু হাসতে লাগলো।

ব্রততীও হেসে বললে, অর্থাৎ কুড়েমির দ্বারা যতখানি দেশসেবা সম্ভব তা আপনি পারেন।

—ঠিক তাই। সেই কারণে যারা খেটে দেশসেবা করে, নিজের অক্ষমতার কথা বিবেচনা ক'রে তাদের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এবং নিজের সম্বন্ধে আমার কুণ্ঠাও ঠিক সেই পরিমাণ।

ব্রততী বললে, তার দরকার নেই। আপনি যা পেরেছেন, তা অনেকেই পারে না।

শুভেন্দু সবিস্ময়ে বললে, তার মানে?

—তার মানে আর একদিন বলব। অনেকক্ষণ আপনার খাওয়া হয়েছে। এখন উঠুন। চাকরটার এখনও খাওয়া হয় নি। আমাকেও বাড়ী ফিরতে হবে।

—ওঃ তাইতো! —শুভেন্দু ব্যস্তভাবে উঠে পড়লো। বললে,—তুমি যে এ বাড়িতে থাকো না সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

শেষের কথাটায় এমন চমৎকার একটি আন্তরিক বেদনার সুর ছিল যে ব্রততী অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে চাকরটাকে ডেকে বললে, ওরে বাবা, কি যেন তোর নাম, এই টিফিন-ক্যারিয়ারটা নিয়ে যা আছে তোর খাবার জন্যে একটা কিছুতে ঢেলে রাখ্—আর তাড়াতাড়ি মেজে আমাকে দে। একটু তাড়াতাড়ি করবি লক্ষ্মী বাবা। আমাকে ফিরতে হবে এখনি।

চাকরটা খুসি হয়ে চলে গেল। মনে-মনে বলতে লাগলো: সেই দিদিমণির চেয়ে এই দিদিমণি ঢের ভালো।

পনেরো

যখন ব্রততী বাড়ি ফিরলো তখনও নৃপেন ফেরেনি। এ বাড়িতে নৃপেনের জন্যে ঠাকুর-চাকর, এমন কি ব্রততীরও অপেক্ষা করার রেওয়াজ নেই। সুতরাং ব্রততী খেয়ে নিলে এবং নৃপেন তখনও আসেনি দেখে একটা শেলাই হাতে নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

নৃপেন ফিরলো যখন তখন রাত বারোটা। চোখ লাল, ঢুলঢুল করছে। পা টলছে। ব্রততী তাকে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসিয়ে তার কোট, টাই খুলে নিলে।

বিরক্ত কণ্ঠে বললে, কোনোদিন কি তুমি সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবে না যে দুটো কথা বলি?

নৃপেন টেনে টেনে বললে, বল না দুটো কথা, আমি বেশ সুস্থ আছি। কতদিন তোমার কথা শুনিনি। বল না কিছু কথা।

—বলব। হাত-মুখ ধুয়ে খাবারটা খেয়ে নাও আগে। তারপর।

—সে তো অনেক দেরি হবে।

—না, হবে না অনেক দেরি। তুমি তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে এসো। আমি এই ছোট টেবিলটায় তোমার খাবার জায়গা ক'রে দিই। ডিনার টেবিলে খাবার দরকার নেই।

—সেই ভালো।— ব'লে টলতে টলতে নৃপেন বাথরুমে গেল।

খেতে ব'সে নৃপেন বললে, বল তোমার গল্প।

—আজ একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়েছিলাম,—শুভেন্দুবাবুর বাড়ী।

—তিনি কে?

—শ্রীর স্বামী।

—আরও বিশদ ব্যাখ্যা কর।

—শ্রী হচ্ছেন সেই মেয়েটি যিনি ভুজঙ্গদা'র সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শুভেন্দুবাবুর কাছে শুনলাম, তাঁরা বম্বেতে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে রয়েছেন।

মাংসের টুকরোটা আর নৃপেনের মুখ পর্যন্ত উঠল না। বিস্ময়ে নৃপেন হাঁ ক'রে রইলো। বললে, এটা কি রকম হল? ভুজঙ্গ তো তেমন ছেলে নয়।

—শ্রীও না। শুভেন্দুবাবু বললেন, ওদের পক্ষে এইটেই নাকি গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সব চেয়ে ভালো উপায়।

নৃপেন এবার মাংসের টুকরোটা মুখের মধ্যে পুরে ব্যাপারটা পরিপাক করার চেষ্টা করতে লাগলো।

ব্রততী বললে, আশ্চর্য মানুষ দেখলাম এই শুভেন্দুদা।

নৃপেন বাধা দিয়ে বললে, দাঁড়াও দাড়াও। তিনি তোমার দাদা হ'লেন কি ক'রে?

কৃত্রিম কোপ কটাক্ষ হেনে ব্রততী বললে, তাতে তোমার অসুবিধা কি হোল?

—কিছুমাত্র না। তার পরে বল, কি রকম আশ্চর্য?

—শ্রীর জন্যে তিনি প্রতীক্ষায় রয়েছেন নিঃশব্দে, যেন রামচন্দ্রের জন্যে শবরীর প্রতীক্ষা। নিজে তিনি রাজনীতি করতে পারেন না। কিন্তু যারা পারে তাদের সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার সীমা নেই।

—অর্থাৎ তোমার মতো?

—না। আমাকে ত্যাগ করতে হয়নি কিছুই। কিন্তু তাঁর প্রাণের চেয়ে যিনি প্রিয় তাঁরই সঙ্গ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

নৃপেন হেসে বললে, সে আর বেশি কি ব্রততী। আমিও তো টাকার জন্যে তোমার সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করেছি। কতটুকু পাই তোমাকে? আমি টাকার জন্যে যা পেরেছি, তিনি দেশের জন্যে তা পারবেন, এ আর এমন কী আশ্চর্য!

ব্রততী বললে, বল কি! দেশের জন্যে আমাকে ছাড়তে তুমি পারতে?

—না। ঠিক যেমন টাকার জন্যে তিনিও শ্রীকে ছাড়তে পারতেন না। এর মধ্যে বড় কথা হচ্ছে ছাড়তে পারাটা। কে কিসের জন্যে ছাড়ছে

সেটা নয়। সুতরাং আমাকেও তুমি ছোট ভেব না, এমন কি ভুজঙ্গের চেয়েও না। প্রয়োজন হ'লে ভুজঙ্গ দেশের জন্যে যদি মানুষ খুন করতে পারেন, অর্থের জন্যে আমিও তা পারি।

নৃপেন হাসতে লাগলো।

কিন্তু ব্রততীর যেন কেমন গোলমাল লাগতে লাগলো। বললে, কিন্তু ও দুটো কি এক হোল?

—যে লোকটা মরলো, তার কাছে একই হোল। তার কাছে আমার ছোরা আর তোমার ভুজঙ্গদা র ছোরার মধ্যে তফাৎ কোথায়? দেখ, তোমার দাদারা মহাপুরুষ। তাঁদের উপর তোমার ভক্তি অক্ষয় হোক। কিন্তু আমরা, যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে ঐশ্বর্য গড়ি, আমাদের জন্যেও তার কিয়দংশ রেখো।

নৃপেন আবার তেমনি ক রে হাসতে লাগলো।

ব্রততী বললে, চেষ্টা করব। তবু জেনে রেখো, তোমরা আর তাঁরা কখনই এক নও। আমার শুভেন্দুদা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ভুজঙ্গদা সত্যিকারের ক্ষত্রিয়, তুমিও সত্যিকারের বৈশ্য। সকলের ওপরই আমার শ্রদ্ধা সমান। তব সবাই এক নও।

—সর্বনাশ কাণ্ড। তুমি না কংগ্রেসের সেবিকা? জাত মানো!

—মানি। সমাজগত নয়, ব্যক্তিগত জাতিভেদ মানি। সব মানুষ সমান নয়, সকলের ধর্মও এক নয়,—এ আমি মানি।

নৃপেনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিছু নেশায়, কিছু বা কৌতুকে তার চোখ চিকচিক করছিল।.

বললে, কিন্তু যে সম্মান পুরাকালে ব্রাহ্মণের ছিল, সে সম্মানের আসনে আজ বসেছে বৈশ্য। সামান্য কিছু কাঞ্চনমূল্যে আমি ব্যাস-বশিষ্ঠ রেখেছি অনেক, জানো?

—জানি। তোমাদের গাড়ি-বাড়ি, ভোগ-ঐশ্বর্য, সমস্ত জানি। তোমাদের শক্তি এবং অর্থ-উৎপাদনের প্রতিভাও আমি সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করি। তথাপি ব্রাহ্মণকে আশ্রয় ক'রেই বেঁচে থাকে দেহের অন্যান্য অঙ্গ।

নৃপেন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হাত ধুয়ে উঠে গেল।

ফিরে এসে বললে, তোমার ওই ব্রাহ্মণটিকে একদিন দেখতে যাব।

—চলো একদিন। এঁদের দেখা উচিত। তাতে মনের পরিসর বাড়ে। কিন্তু শুধু চোখ দিয়েই তো দেখা যায় না।

—তবে?

—মন দিয়ে দেখতে হয়।

—সে মন পাব কোথায়?

—পাবে। সে-মন তোমার আছে জানি বলেই তোমাকে নিয়ে যেতে সাহস করছি।

—আছে এখনও?

—আছে বই কি! নইলে আমাকে প্রশ্রয় দেয় কে?

নৃপেন একথায় মনে-মনে খুশিই হোল।

বললে, প্রশ্রয় দিই ব্রততী, কিন্তু শুধু ওঁদের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে ব'লেই দিই না। তোমার কোনো কাজে বাধা দিতে পারি না ব'লেও দিই।

—বাধা দিতে পার না কেন?

—তোমার সম্বন্ধে আমার একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা আছে। তোমার কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি বাধা দিতে পারি না।

ব্রততী নিজেও তা জানে। তাই বড় বড় চোখে মোহময় একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিঃশব্দে টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

নৃপেন বললে, তবু মাঝে মাঝে ভয় হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পেয়ে এই নগণ্য বৈশ্য না তোমার চোখে একদিন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

এইবারে ব্রততী দুই বাহু দিয়ে ওর গলদেশ বেষ্টন ক'রে কণ্ঠে অপরিসীম আদর মিশিয়ে বললে, ভয় নেই গো, ভয় নেই। আমার মনের আকাশে যেখানে তুমি আছ, সেখানে তুমি একেশ্বর,—সেখানে তোমার জাতি নেই, বর্ণ নেই, কিছু নেই। আপন অধিকারে তুমি একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু রাত হোল অনেক। এবারে আলো নিভিয়ে দিই?

—দাও।

ব্রততীর যখন ঘুম ভাঙলো, নৃপেন তখনও নাক ডাকাচ্ছে। এমন সাধারণতঃ হয় না।

অধিকাংশ দিন নৃপেনই আগে বেরিয়ে পড়ে। রাত্রে সে মদই থাক আর যাই করুক, কাজে তার কখনও গাফিলতি হয় না। কাজ না থাকলে হয় তো একটু বেশি ঘুমোয়। কিন্তু এতক্ষণ অবধি কখনও নয়। সে ব্রততী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওঠে, কচিৎ হয় তো মিনিট দশেক পরে।

কিন্তু আজ তার নাক ডাকানোর রকমই আলাদা যেন।

ব্রততী স্নান সেরে ফিরে এল, নৃপেনের নাক তখনও ডাকছে। রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এল, তখনও। চাকরে চা নিয়ে এল, তখনও তাই।

ব্রততী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো : শরীর ভালো আছে তো!

গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেও মমতা হোল। আহা, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, বেচারা। দিনের পর দিন সকাল ছয়টা থেকে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত ঘুরে যে লোক দৈত্যের মতো থাবায় বিশ্বের ধনভাণ্ডার থেকে টাকা লুটে আনে, সে এমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, এমন দৃশ্য দেখার অভ্যাসই ব্রততী হারিয়ে ফেলেছে।

একবার মনে হয়, আহা, ঘুমোক একটু,—পায় না তো ঘুমুতে।

পরক্ষণেই মনে হয়, শরীর ভালো আছে তো? মনে হ'তেই তার দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে, বুকের ভিতরটা দ্রুততালে বাজতে থাকে।

অবশেষে যখন আটটা বাজে তখন আর পারলে না সে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, শুনছ?

নিদ্রাজড়িত চোখ মেলে চাইলে নৃপেন। চোখ দুটো তখনও জবাফুলের মতো লাল,—কতক গতরাত্রের নেশায়, কতক ঘুমে। কিন্তু একবার চেয়েই আবার সে পাশ ফিরলে।

ব্রততী সভয়ে বললে, আটটা বাজে, আবারও পাশ ফিরছ যে!

নৃপেন নিশ্চিন্তকণ্ঠে শুধু বললে, হুঁ।

—কাজে বেরুবে না?

—না।

—কি হোল ?

—ছুটি।

ব্রততী হেসে ফেললে। তার সন্দেহ হোল, কাল নৃপেনের পানের মাত্রা বোধ হয় বেশি হয়েছে। কিন্তু নেশা কেটে গেলেই সময়ে তুলে না দেওয়ার জন্যে হয় তো বাড়িশুদ্ধ লোককে নিয়ে টানাটানি করবে।

বললে, ছুটি! তোমার আবার ছুটি কি!

নৃপেন চোখ চেয়ে হাসলে। বললে, কেন? পেয়াদার কি শ্বশুরবাড়ি থাকতে নেই ?

—পেয়াদার শ্বশুরবাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু তোমার ছুটি আছে বলে জানি না।

নৃপেন চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো। বললে, ছুটি নিলাম আজকে।

—কার কাছ থেকে?

—ভগবানের কাছ থেকে। তোমাদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে ভগবান তাঁর কাছ থেকে নয়, আমাদের বৈশ্যের যে ভগবান তাঁর কাছ থেকে।

—সে আবার কি? ভগবান কি আবার আলাদা-আলাদা আছে না কি?

—নিশ্চয়। জাত যখন আলাদা-আলাদা তখন তাদের সৃষ্টিকর্তাদেরও আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক।

—কি রকম ?

—যেমন ধরো, ব্রাহ্মণের যিনি ভগবান তিনি নিজেও নিস্ক্রিয়, ভক্তদেরও ছুটি দেন অঢেল। ক্ষত্রিয়ের ভগবান অতখানি নিস্ক্রিয় হয় তো নন, তবে তাঁরও ভক্তদের ছুটি মেলে প্রচুর। কিন্তু আমাদের যিনি ভগবান তাঁর নিজেরও যেমন অবসর নেই, ভক্তদেরও তেমন ছুটি নেই,—না previlege, না casual.

নৃপেন হাসতে লাগলো হা হা ক'রে। তারপরে ব্রততীর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু বহু কষ্টে ছুটি একদিন নিলাম। কেন জানো ?

ব্রততী কারণটা শোনবার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নাড়লে।

—ছুটি নিলাম তোমার ব্রাহ্মণ দাদার সঙ্গে দেখা করব ব'লে। কি নাম যেন বললে তাঁর ?

—শুভেন্দুদা।

—হ্যাঁ, শুভেন্দুদা। আমার তৈরি হয়ে নিতে ঘণ্টাখানেকের বেশি দেরি হবে না। তারপরেই তাঁর ওখানে যাব।

ব্রততী অকস্মাৎ বেঁকে দাঁড়ালো।

বললে, না।

—না কেন?

—তাঁর কাছে যেতে হয় শ্রদ্ধা নিয়ে। তোমাব সেখানে যাওয়া হবে না।

নৃপেন খাট থেকে নেমে দরজার কাছ বরাবর গিয়েছিল। ফিরে এসে ব্রততীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আমার মনে তাঁব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নেই তোমাকে কে বললে?

—তোমাব কথা থেকে সন্দেহ হচ্ছে।

—সেটা ভুল ব্রততী। শ্রদ্ধা না থাকলে শুধু কৌতূহল মেটাবার জন্যে নৃপেনচন্দ্র একটা দিন কাজ কামাই করে না। সত্যিই তাঁব সম্বন্ধে আমাব গভীব শ্রদ্ধা। কেন জান?

—না।

—তাঁব পাণ্ডিত্যের জন্যে নয় নিশ্চয়ই। কারণ আমাব মতো মূর্খের পক্ষে তাঁব পাণ্ডিত্য মাপা সম্ভব নয়। বলতে গেলে ও আমি বুঝিই না।

—তাহ'লে?

মুচকি হেসে নৃপেন বললে, সে আব একদিন বলব।

ব'লে সে চলে যাচ্ছিল, ব্রততী খপ্ ক'বে ওব কাপডেব খুঁট একখানা ধ'বে ফেলে বললে, না, এখনি বলতে হবে।

ওর হাত থেকে কাপড়েব খুঁটটা ছাড়াবাব কয়েকটা সকৌতুক ব্যর্থ চেষ্টার পর নৃপেন বললে, আচ্ছা, বাথরুম থেকে এসে বলব,—চা খেতে খেতে।

—না। এখনি। ব'লে তবে যেতে পাবে—ব্রততীর দুই চোখ জ্যো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

—আরেকটু পরে শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—হ্যাঁ। বোসো ফের খাটে।

নৃপেনকে খাটে গিয়ে বসতে হোল ফের। বললে, শোনো তাহলে। নিজের স্ত্রী,—যে কোনো কারণেই হোক,—দূরে, নিজের চোখের আড়ালে অন্যের সঙ্গে,—তা সে যত বড় জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষই হোক,—বাস করছে, এ সহ্য করতে পারে শুধু দু'শ্রেণীর লোক : এক, যারা নিজেরা নিষ্কলঙ্ক, আর যারা বুদ্ধিহীন। শুধু এঁদেরই কোনো কারণেই ঈর্ষা স্পর্শ করতে পারে না। এ রকম নির্বুদ্ধি হয়তো অনেক আছে, কিন্তু এ রকম নিষ্কলঙ্ক লাখেও একজন আছে কি না সন্দেহ। তুমি বলেছ, তিনি নির্বুদ্ধি নন। আমি তাই সেই দুর্লভ নিষ্কলঙ্ক পুরুষকে দেখতে যাবার জন্যে আজ কাজে গেলাম না।

ব্রততী আশ্বস্ত হয়ে ওর খুঁট ছেড়ে দিলে।

নৃপেন বাথরুম থেকে ফিরে এলে ফের জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা আমি যদি শ্রীর মতো চলে যেতাম, তুমি কি সন্দেহ করতে ?

—না বোধ হয়। কারণ আমি নির্বুদ্ধি।

নৃপেন হাসতে লাগলো। কিন্তু ব্রততী সে হাসিতে যোগ না দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

চাকর ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম এবং প্লেটে ক'রে খাবার নিয়ে এল। ব্রততী চা তৈরী করতে লাগলো। এক পেয়ালা চা। সেটি নৃপেনের দিকে এগিয়ে দিলে।

—তুমি খাবে না ?—নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে।

—না।

—চায়ে বিতৃষ্ণা ! কি ব্যাপার ?

হেসে ব্রততী বললে, খেয়েছি এক পেয়ালা। আর ইচ্ছে করছে না।

নৃপেন আর কিছু না ব'লে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলে।

একটু পরে ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, আমি তো তোমার অনুমতি না নিয়েই কত জায়গায় ঘুরি, কত লোকের সঙ্গে মিশি, তুমি রাগ কর না তো ?

নৃপেন তেমনি হেসে বললে, বলেছি তো, আমি মূর্খ। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি যা-খুশি করতে পার।

কুটিল কটাক্ষে হেসে ব্রততী বললে, আমার কিন্তু তোমাব উপর সন্দেহ হয়, মাঝে মাঝে ভয়ও করে।

—করতেই পাবে। কবাই স্বভাবিক। কাবণ তুমি তো আব আমার মতো বোকা নও। বুঝেছ, রাশ ঢিলে দেওযাব ঝুঁকি নেওযা নিরাপদ নয়। বড়-বড় কথার-বুদ্বুদ পুরুষেবাই শুধু বাশ ঢিলে দেয।

—ও। — ব্রততী হেসে উঠলো,— পুরুষেবাই বোকা, না? আব মেয়েবা সব সেয়ানা! তাই সাবাজীবন ধ'বে চোখেব জল তাদেব সাব হয়, না?

নৃপেন হেসে উত্তর দিলে, সে দোষ জলেব নয়, চোখেব। মেয়েদেব চোখ দুটোই জলময। কথায় কথায পদ্মফুলে শিশিব জমাব মতো অশ্রু জমে।

—তাই বুঝি? আব তোমাদের চোখে যে সব সময়ই বাগেব বক্ত।

— সব সময়ই নয়, মাঝে মাঝে অনুবাগও জমে।

—টেব তো পাই না।

ব'লেই ব্রততী তাড়াতাড়ি বললে, কিন্তু ঝগড়া থাক। শুভেন্দুদাব ওখানে যাওয়া ঠিক তো? তাহ'লে দেবি কোবো না, তৈবি হয়ে নাও। আমিও পাঁচ মিনিটেব মধ্যে আসছি।

ষোলো

মধ্যপথে গাড়ি থামিযে ব্রততী একটা ভালো খাবারেব দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে নিলে। ওরা যখন পৌছুলো শুভেন্দুব বাড়ি, তখন সে তাব পড়াব ঘরে একখানি ঈজি-চেয়ারে অর্ধশাযিত।

ব্রততী হেসে বললে, একটি নতুন ভদ্রলোককে নিযে এলাম। পবিচয দিতে পারব না। আপনাকে নিজেই চিনে নিতে হবে।

অন্য যে-কোনো লোকের পক্ষে ব্রততীর সলজ্জ হাস্যে, তার বলাব ভঙ্গিতে নৃপেনকে চিনে নেওয়া কঠিন হোত না। কিন্তু শুভেন্দু বিব্রত হযে উঠলো, আর সেই ভাবটা চাপবার জন্যে সসম্ভ্রমে নৃপেনকে বললে, বসুন, বসুন।

নৃপেন বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ?

—আমি ? ভালোই, মানে মন্দ নয়। আপনি কেমন আছেন ?

ব্রততী বাইরে থেকে দু' একখানা প্লেট নিয়ে এল। প্যাকেট থেকে সন্দেশ বের ক'রে প্লেটে সাজিয়ে শুভেন্দুকে দিলে। বললে, খান।

শুভেন্দু এতক্ষণ সন্তর্পণে চোরা চাউনিতে নৃপেনকে দেখছিল। তার গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, হাতে হীরার আংটি, মণিবন্ধে মূল্যবান ঘড়ি। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না যে, লক্ষ্মীর প্রসাদ এই লোকটি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছে। কিন্তু কে এই লোক ? কোথায় দেখেছে একে ?

ব্রততীর কথায় চমকে প্লেটের দিকে চেয়ে বললে, এ আবার কি ?

—দুটো সন্দেশ।—ব্রততী উত্তর দিলে।

—ওঁকে দিলে না ?

—উনি খাবেন না।

নৃপেন বিনীতভাবে বললে, আমি এইমাত্র খেয়ে বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রে শুভেন্দু বললে, না।

না-চিনতে পারার অস্থিরতায় মনে মনে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্রণা থেকে সে নিষ্কৃতি পেলে। বললে, কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

—কোথাও দেখেন নি।

—তাহ'লে ?

—তাহ'লেও চেনা উচিত ছিল।

—সেটা আমিও অনুভব করছি। তবু চিনতে পারছি না। আচ্ছা ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে কি—

—ভুজঙ্গ আমার বাল্যবন্ধু।

—তাই বলুন ! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল,

হাতজোড় ক'রে নৃপেন বললে, আপনার কিছুই মনে হয়নি শুভেন্দুবাবু,—

অথবা যদি কিছু মনে হয়েই থাকে, তা নিতান্ত এলোমেলো। আমাকে চেনার আসল রাস্তা হচ্ছে ওই দিকে।

ব'লে ব্রততীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

বললে, উনি আমারই সহধর্মিণী।

এবারে শুভেন্দু উল্লাসে করতালি দিয়ে উঠলো : এই দেখ! ওই কথাটাই কেন জানি না আমার কিছুতেই মনে আসছিল না।

—সে আমি জানি। কেন আসছিল না, তাও জানি।

—কেন বলুন তো?

—কারণ আপনার বোনের হাতে সরু দু'গাছা চুড়ি, পরণে খদ্দর, আর আমার আঙুলে হীরের আংটি, পরণে

—যা বলেছেন! হ'তে পারে ওইটেই হয়েছিল বাধা। কিন্তু যাক সে কথা। ব্রততী, কুটুমটিকে চা তো খাওয়াতে হয়। প্রথম দিন, একটু খাবারও বরং।

—দেখছি।—ব'লে ব্রততী স্বামীর দিকে একটা ঝকমকে কটাক্ষ হেনে বাইরে গেল।

নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, গান্ধীজির সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আপোষ কি হবে ব'লে মনে হয়?

শুভেন্দু অন্যমনস্কভাবে অন্য কি যেন কথা ভাবছিল। উত্তর দিলে, কি জানি। রাজনীতিটা আমি ঠিক বুঝি না। আপনার কি মনে হয়?

—হ'তে পারে ব'লেই মনে হয়। ব্যবসাসূত্রে অনেক ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। তাদের ভাব দেখে তো মনে হয়, তারা তল্পী গুটোবার আয়োজনই করছে যেন।

—তাতে কি ভারতের কল্যাণ হবে?

প্রশ্নটা এতই অস্বাভাবিক যে নৃপেন প্রথমটা চমকে উঠলো। বললে, এটা কি রকম প্রশ্ন হোল শুভেন্দুবাবু? আমি অবশ্য দেশপ্রেমিক নই। যা ক'রে খাই, তাও খুব সাধু পন্থা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারা ভারতের অকল্যাণও হ'তে পারে, এমন কথা আপনার মনে আসে কি ক'রে?

শুভেন্দু হাসলে। বললে, তার কারণ ভারত তো অখণ্ড এবং ঐক্যবদ্ধ একটি একক নয়, অনেকগুলি স্বার্থের সমষ্টি। দু'শো বৎসরের বৃটিশ রাজশক্তিকে ঘিরে বহু স্বার্থবিশিষ্ট সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পুষ্টি নিশ্চয়ই হয়েছে। ভারত তো তাদের বাদ দিয়ে নয়। কে জানে, হয়তো তারাই সংখ্যায় বেশি। ইংরেজ চ'লে গেলে তাদের নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে। তখন হয়তো তারা চীৎকার তুলবে, এ আবার কী হোল? এর চেয়ে যে ইংরেজ ছিল ভালো। এমন কি হ'তে পারে না?

—পারে। কিন্তু তাকে আপনি ভারতের অকল্যাণ মনে করবেন কেন?

—আমি মনে না করতে পারি। কিন্তু দলে যদি তারা ভারী হয়, তাহ'লে তাদের চীৎকারকে ভারতের একটা মোটা অংশের চীৎকার ব'লে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে।

যুক্তিটা নৃপেন বুঝলে। তবু বললে, তা কখনই হবে না শুভেন্দুবাবু। একথা বলতে তারা লজ্জা পাবে।

—না হ'লেই ভালো।—শুভেন্দু শান্তভাবে বললে,—কিন্তু ইতিহাসে দেখেছি কি না, মানুষ যখন স্বার্থে অন্ধ হয়, তখন লজ্জা ব'লে কিছু তার থাকে না। নির্লজ্জ মিথ্যার পিছনে জমকালো একটা তত্ত্বও খাড়া করবার মতো লোক জুটে যায়। এমন ঘটনা ইতিহাসে এত বেশিবার ঘটেছে যে, এখানেও ঘটা অসম্ভব ব'লে আমি মনে করি না। কিন্তু আপনার চা এলো না তো?

নৃপেন হেসে বললে, যাঁর উপর ভার আপনি দিয়েছেন, তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ব'লেই আমার বিশ্বাস। চা আসবেই।

এমন সময় একহাতে চা অন্য হাতে খাবার নিয়ে ব্রততী এল। তার পিছনে আর এক কাপ চা এবং আর এক প্লেট খাবার নিয়ে এল চাকরটা। শুভেন্দু লক্ষ্য করল না, কিন্তু নৃপেন দেখলে যে-খাবার তাকে দেওয়া হয়েছে, সে-খাবার ব্রততীর আনা খাবার নয়। দেরি বোধ করি সেইজন্যেই হোল।

নৃপেন পরিহাস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, খাবারের তারতম্য কেন হোল?

ব্রততী পট ক'রে জবাব দিলে, কারণ মানুষ দুটির মধ্যেও তারতম্য রয়েছে যে!—ব'লেই বেরিয়ে গেল।

নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, মানুষে-মানুষে তারতম্য থাকে কেন ?

শুভেন্দু হেসে বললে, সেকথা মানুষের সৃষ্টিকর্তাকে জিগ্যেস করবেন। তবে এটুকু বোঝা যায়, তারতম্য না থাকলে বোধকরি কাব্য, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি কিছুই গ'ড়ে উঠতো না। পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে মনে হয়, হানাহানি-কাটাকাটিরও যেন প্রয়োজন আছে। নইলে পৃথিবীটা নিতান্ত গৃহবলীভুক হয়ে উঠতো, আর তার মধ্যে থেকে মানুষ হাঁফিয়ে উঠতো। মাইকেল বলেছেন, 'মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে'। কিন্তু আমার মনে হয়, সেইটাই তার আরও বেশি শাস্তি। দিন দুই নিরবচ্ছিন্ন অমৃত হ্রদে থাকার পর নিশ্চয়ই সে মৃত্যু কামনা করে।

—অথচ অমৃত হ্রদই তো মানুষের চূড়ান্ত কাম্য।

—হ্যাঁ। তার কারণ সে জানে, অমৃত হ্রদ সত্যি সত্যি কোথাও নেই। যদি থাকতো, তাহ'লে জনদুই লোককে সেখান থেকে চীৎকার ক'রে ফিরতে দেখলে আর কেউ ওনাম মুখেও আনতো না।

ব'লে শুভেন্দু হো হো ক'রে হাসতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেল। সে এবং নৃপেন দুজনেই চেয়ে দেখলো দ্বারের কাছে বিদ্‌ঘুটে চেহারার এক কাবুলীওয়ালা, —পিঠে বোচকা, হাতে লম্বা মোটা লাঠি, অন্ধকার গোঁফ-দাড়ির ফাঁক দিয়ে মলিন দন্তপাতি আহ্লাদে বিকশিত।

—আদাবরেস্ বাবু সাব।

—কেয়া মাংতা হ্যায় ?—শুভেন্দু চীৎকার ক'রে উঠলো।

—রূপেয়া।

—রূপেয়া ? কেয়া রূপেয়া ? কিস্‌কা রূপেয়া ?

—হামকো পছন্‌তা নেহি ?

—নেহি। তুমকো হাম কোনো জনমমে নেহি দেখা। বাহার যাও। বাহার যাও ! নেহি তো

—নেহি তো পুলিশ বোলায়েঙ্গে ?

—তা পারেন ওঁরা। মুখ চোখের অবস্থা দেখছেন না ? আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন ভুজঙ্গদা।

ব'লে কাবুলীওয়ালাকে একরকম ঠেলেই ব্রততী ভিতরে নিয়ে গেল। ভুজঙ্গ পিঠের বোঁচকাটা মেঝের উপর এবং লাঠিটা দরজার পাশে ঠেসিয়ে রেখে একখানা চেয়ার টেনে গম্ভীরভাবে ব'সে দু'জনের দিকে পর্যায়ক্রমে কটমট ক'রে চাইতে লাগলো।

কিন্তু আর ওরা ভয় পেল না। বরং হো হো ক'রে হাসতে লাগলো।

নৃপেন একটা কোণে স'রে গিয়েছিল। সেইখান থেকেই বললে, কী আশ্চর্য। আমরা একেবারেই চিনতে পারিনি। কিন্তু ব্রততী, চিনলে কি ক'রে?

—সহজেই। একটা কাবুলীওয়ালা খামোকা আসবে কেন একেবারে ভিতরের দিকে? এই প্রশ্নটা যেমন মনে আসা, অমনি বুঝলাম এ ভুজঙ্গদা ছাড়া আর কেউ নয়। গলা শুনেই সন্দেহ রইলো না, এ ভুজঙ্গদাই ঠিক। তারপরে? খবর বলুন।

—ভালো। এখানকার খবর?

—এখানকার খবর আর ভালো হবে কি ক'রে? এ বাড়ি তো শ্রীহীন।

সবাই হেসে উঠলো।

ভুজঙ্গ বললে, তার মানে কি। শ্রী এ বাড়ির সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে।

—তিনি এলেন না কেন?

—একাই এলাম একবার দেখে যেতে অবস্থাটা। কিন্তু আগে একখানা সাবান দাও, স্নানটা সেরে আসি। তারপরে চা।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ব'লে শুভেন্দু পাশের ঘর থেকে সাবান, তোয়ালে, তেল এনে দিলে। ভুজঙ্গ বাথরুমে চলে গেল।

ব্রততী বললে, ভুজঙ্গদা খাওয়া-দাওয়া বরং আমার ওখানেই করবেন। আপনিও আসবেন শুভেন্দুদা। ওখানেই খাবেন।

তারপরে নৃপেনের দিকে চেয়ে বললে, আমি গাড়ী নিয়ে চললাম। বাড়ী পৌঁছে গাড়ি ফের পাঠিয়ে দোব। তুমি ওঁদের নিয়ে আসবে।

ব'লেই ব্রততী ব্যস্তভাবে চ'লে গেল।

মধ্যাহ্নে যে ভুরিভোজনের আয়োজন হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। তারপরে আরম্ভ হোল বিশ্রম্ভালাপ। খাটের উপর শুভেন্দু, ভুজঙ্গ আর নৃপেন। খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলো ব্রততী।

নৃপেন বললে, ইংরেজ তো প্রায় যাব-যাব। তোমাকে এখনও কি ওরা গ্রেপ্তার করবে বলে মনে কর ?

—করি। যাবার আগের দিনও (যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত ওরা যায়ও) পেলে আমাকে ধরবে, এমন বিশ্বাস ওদের 'পরে আমি রাখি।

—তাহ'লেই তো মুস্কিল।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। নৃপেনের মাথায় যে একটা পরিকল্পনা এসেছে, তা আর কেউ বুঝতে না পারলেও ব্রততী চট্ ক'রে বুঝে ফেললে।

বললে, তা না হোলেই বা তোমার কি সুবিধা ছিল ?

নৃপেন চিন্তিতভাবে বললে, ছিল একটু।

ব্রততী বললে, সেইটে প্রকাশ ক'রে বল দেখি।

—একটা খবরের কাগজ বের করার কথা ভাবছিলাম ক'দিন থেকে।

—খবরের কাগজ !—ভুজঙ্গ চমকে উঠলো,—সে যে অনেক টাকার ব্যাপার !

—কত টাকার ?

—দশ পোনেরো লক্ষের কম নয়।

নৃপেন বিশেষ বিচলিত হোল ব'লে মনে হোল না। বললে, তা হোক। কিন্তু তোমাকে না পেলে তো কিছুই হয় না।

—কেন ?—ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—কার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হব ? তোমাকে না পেলে আমার খবরের কাগজ বের করা হবে না।

—সর্বনাশ ! শোনো নৃপেন, তুমি মস্ত বড় ভুল করছ।

—তার মানে ?

—কাগজ এখন তোমাদেরই বের করবার কথা। কিন্তু আমাদের দিয়ে নয়।

—কেন ?

—তুমি কাগজ বের করতে চাও কিসের জন্যে ? লাভের জন্যে ? না কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ?

—আমার আর রাজনীতি কি ?

—তাহ'লে ব্যবসা ? কিন্তু সে-কাগজের লোক আমি নই।

—কেন ? তুমি ত খুব ভালো লেখ শুনেছি।

—একেবারে যে মিথ্যা শুনেছ তা হয়তো নয়। কিন্তু তাতে ব্যবসাদারের কাগজ চলে না। তোমার দরকার এমন লোকের যার মতের বালাই নেই, ন্যায়নীতিরও ঝামেলা নেই,—তুমি যা বলবে চাঁদপানা মুখ ক'রে যে তাই লিখে যাবে, আপত্তি করবে না। বুঝলে ?

—কিছুমাত্র না।

ভুজঙ্গ সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, তাহ'লে তোমাকে বুঝিয়ে দিই শোনো : মনে কর, পুলিশ একটা গুরুতর অন্যায় করেছে যার বিরুদ্ধে খুব কড়া লেখা উচিত। কিন্তু তোমার গুদামে দুশো গাঁট কাপড় চোরা-বাজারে চালান যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন অবস্থায় তুমি কি করবে ?

নৃপেন নিঃসঙ্কোচে বললে, চেপে যাব নিশ্চয়ই।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, কিন্তু আমার মতো সম্পাদক থাকলে চেপে যাওয়া চলবে না। আমি লিখবই। বাধা দিলে চাকরী ছেড়ে দোব, তাতে তোমার 'জাতীয়তাবাদী পত্রিকা'র কলঙ্ক হবে।

নৃপেন বুঝলে ব্যাপারটা। বললে, কিন্তু একটা কাগজ থাকা দরকার হে! নইলে এখনকার দিনে ব্যবসা চলে-না।

—কেন ?

—কত বড় শক্তি ! যাকে বলে Fourth State.

—কিন্তু তুমি ত বললে, তোমার কোনো রাজনীতি নেই।

—না। ব্যবসা আছে। গভর্নমেন্টের সাহায্য না পেলে ব্যবসা করা যায় না। গভর্নমেন্টকে হাতে রাখার অস্ত্র হচ্ছে খবরের কাগজ। যুদ্ধের বাজারে যারা টাকা করেছে, তারা সবাই আজ খবরের কাগজের কথা ভাবছে।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, অর্থাৎ দেশটাকে ডোবানোর জন্যে যতরকম ব্যবস্থা করা দরকার, তার ত্রুটি হচ্ছে না। সব চাবি ভুল হাতে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু জেনে রেখো, প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয়। একদিন সত্যিকার মানুষ আসবে এবং সমস্ত চাবি ছিনিয়ে নিয়ে আসল হাতে দেবে।

নৃপেন রেগে বললে, কিন্তু আমাদের হাতে এলে ভুল হাতে পড়বে কেন?

—কারণ অর্থ ছাড়া আর কিছুই তোমরা বোঝ না। কিন্তু খবরের কাগজের ব্যবসা ঠিক পাট-ধানের ব্যবসা নয়। তার আরও একটা বড় দিক আছে। দেখ, একদিন ছিল যখন আমরা সামান্য মাইনে পেতাম, তাও নিয়মিতভাবে নয়। তখন লাটসাহেবের নিমন্ত্রণও আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম। এখন যে-কোনো মন্ত্রীর যে-কোনো সেক্রেটারী নিমন্ত্রণ করলেও আমরা ছুটে যাই।

—সে অপরাধও কি আমাদের? তোমরা যাও কেন?

—না গেলে চাকরী যাবে। কাগজের যারা মালিক তারা মন্ত্রীদের চটাতে সাহস করে না। তারা ঠেলে পাঠায়। অবস্থা কোথায় নেমেছে খবর রাখো? একটা গল্প বলি শোনো: কাগজের নামটা আর করব না, কিন্তু অত্যন্ত ঢক্কানিনাদী জাতীয়তাবাদী একখানি কাগজ। পূজার আগে ঢাউশ স্পেশাল বেরুবে। প্রেস অফিসার সমস্ত দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার জন্য উঠছেন, এমন সময় সেই কাগজের একজন প্রতিনিধি হন্তদন্ত হয়ে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন। 'কী ব্যাপার?' 'সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার!' 'কী সর্বনাশ?' 'এই দেখুন!' ভদ্রলোক একখানা প্রুফশীটে আঙুল দিয়ে দেখালেন, একটা বিজ্ঞাপন। প্রেস অফিসার উল্‌টে-পাল্‌টে দেখেও বুঝতে পারলেন না, সর্বনাশটা কোথায়। বললেন, 'এ তো বিজ্ঞাপনের প্রুফ।' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এইটে?' ব'লে প্রতিনিধি একটা ছোট ছবিতে আঙুল দিলেন। সুভাষচন্দ্রের ছবি। প্রেস অফিসার এতক্ষণে বুঝলেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কোন খবর এবং ছবি ছাপা বারণ। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের ছবি নয়। প্রেস অফিসারের হাসি এল, দুঃখও হোল। মুখে বললেন, এসব বিজ্ঞাপনের ছবি ছাপতে পারেন। প্রতিনিধি বললেন, তাহ'লে যদি স্যার কাইণ্ডলি এইখানে একটা সই ক'রে দেন। প্রেস অফিসার তাই দিলেন। কিন্তু 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের

মালিক তাতেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। কে জানে, কোথায় খড়্গ ঝুলছে। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে তাঁরা নেতাজির ছবি বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপনটা ছাপলেন। তার জন্যে শারদীয় সংখ্যা বেরুতে দু'দিন দেরিই হয়ে গেল।

শুভেন্দু এতক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে ছিল। লাফিয়ে উঠে বললে, বলেন কি মশাই! এ কি সত্যি হ'তে পারে?

— পারে নয়, হয়েছে।

ভুজঙ্গ হাত জোড় করে নৃপেনকে বললে, ভগবান তোমার উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন। তুমি খবরের কাগজ করলে তার সম্পাদক পদের জন্যে আমার কথা যে ভেবেছ, তাতেই আমি কৃতার্থ। ওদিকে আর যা-খুসি কর তাতেই আমার শুভেচ্ছা পাবে।

নৃপেন চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হোল, এখন আমার ব্যাঙ্কটাকে বাঁচাই কি করে?

ভুজঙ্গ বললে, মন্ত্রীদের সব ওভার ড্রাফট দাও।

—তাতে তো আরও তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ারই ব্যবস্থা হবে।

—কেন?

—এখনকার মন্ত্রীরা কি আর তখন থাকবে? কাগজই একমাত্র বস্তু যার মারফৎ সবকালে গভর্ণমেণ্টও আমাদের হাতে থাকে, আমরাও গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকি।

হঠাৎ নৃপেন বললে, আচ্ছা তাতেই বা ঝামেলা কি? ভারতবর্ষ স্বাধীন হোলে শাসনভার তো তোমাদের হাতেই আসবে।

—আমাদের হাতে কেন?

—মানে কংগ্রেসের হাতে আর কি! আসবে না?

—নিশ্চয় আসবে।

—তাহ'লে?

—কি তাহ'লে?

—তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার গোলমাল বাধবে।—কিসে? আমি যে গবর্ণমেণ্টকে হাতে রাখতে চাই, তুমি সেই গবর্ণমেণ্টেরই দলের লোক।

মন্ত্রী হবেন তোমারই জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধবেরা,—হয়তো তুমি নিজেই হবে একজন মন্ত্রী!

ভুজঙ্গ এতক্ষণ হাসছিল, শেষের কথায় গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, অসম্ভব কিছুই নয়, কিন্তু তা হবে না।

—কেন?

—হবার নয় বলেই হবে না। মন্ত্রী হবার অন্য লোক আছে নৃপেন। তা ছাড়া ব্যাপার কি জানোনা, সেদিন হয়তো আমাদের চেয়ে ওই পুলিশই হবে মন্ত্রীদের বেশি আত্মীয়।

শুভেন্দু বললে, ইতিহাসে দেখা যায়, শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরে কর্তাদের যত সংগ্রাম করতে হয় নিজের দলের সঙ্গে তেমন আর কারও সঙ্গে নয়। দৃষ্টান্ত দেখুন ষ্ট্যালিন আর ট্রটস্কীর।

ভুজঙ্গ বললে, সত্যি। আমাদের অদৃষ্টে হয়তো ট্রটস্কীর দুঃখই জমা রয়েছে। কে জানে?

সে নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সমবেদনার সুরে নৃপেন বললে, তা কোরো না হে। যে দলের হাতে ক্ষমতা আসবে, তুমি সেই দলেই ঢুকে পোড়ো। তা'লেই বাকি জীবনটা আর দুঃখ পেতে হবে না আরামে কাটবে।

—চেষ্টা করব।

ব'লে ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হাসতে লাগলো।

অন্য সকলেও হেসে উঠলো, বাদে ব্রততী। তার মনে পড়ে গেল তার বাপের কথা। ভারতে আজ স্বাধীনতার সূর্যোদয় হ'তে চলেছে, কিন্তু তাঁদেব জীবন কেটেছে অন্ধকারে। ঝড় বাদল ছিল তাঁদের যাত্রার ক্ষণ, অরণ্য পথ। সেই পথের যারা যাত্রী, স্বাধীনতার পরেও তাদের জীবনে অন্ধকার কাটবে না, একথা ভাবতেও তার স্নেহপরায়ণ হৃদয় যেন ঝড়েব সমুদ্রের মতো তোলপাড় ক'রে উঠলো।

বললে, বসুন। আমি চা নিয়ে আসি।

সতেরো

দুদিনেই ভুজঙ্গ বুঝতে পারল, রাজনৈতিক আসামী ধরা সম্বন্ধে পুলিশের যথেষ্ট শৈথিল্য এসেছে। উনিশ শো বিয়াল্লিশের অগষ্ট বিপ্লবেই সে জাতীয় আন্দোলনে পুলিশের, বিশেষ করে নিম্নতন পুলিশ কর্মচারীদের, প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির পরিচয় পেয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রায় সুনিশ্চিত দেখে সেই সহানুভূতি যেন আরও একটু স্পষ্ট হয়েছে। বম্বে থেকে শ্রীকে চলে আসতে বলবে কি না তাই সে ভাবছে।

শুভেন্দুর ইচ্ছা আরও একটু অপেক্ষা করে দেখা। পুলিশের ভাবগতিকে বিশ্বাস কিছুই নেই। ঈশানের এক টুকরো মেঘ দেখতে-দেখতে কখন সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড় তোলে কিছুই বলা যায় না।

নিজের অতীত অভিজ্ঞতার দিকে চেয়ে ভুজঙ্গ এ যুক্তি একেবারে অস্বীকার করতে পারলে না। দেখা যাক দিন কয়েক।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তার ইচ্ছা হোলো 'গণসেবক' অফিসে যায়। গা-ঢাকা দেবার আগে পর্যন্ত এইখানেই সে চাকরী করেছে। চাকরী তার এখনও আছে, না গেছে, জানা দরকার। যদি থাকে তাহলে মাইনে বাবদ অন্ততঃ কিছু টাকা পেলেও তার ভারি উপকার হয়। ব্রততীর কল্যাণে টাকার অভাব তাকে ভোগ করতে হচ্ছে না সত্য, কিন্তু নিজের মাইনের টাকা পেলে কিছুদিন ব্রততীও বিশ্রাম পায়।

অথচ অফিসে যাওয়ার অসুবিধা আছে।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চর যে সব ঘাঁটিতে আস্তানা গাড়ে, খবরের কাগজের অফিস তার মধ্যে একটি। কিন্তু এই সব চর যে কারা জানবারও জো নেই। ভুজঙ্গ ঠিক করলে, সকালের দিকে ম্যানেজিং ডিরেকটার নৃত্যকালীবাবুর সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে। সেখানে ভয়টা কম। কারণ নৃত্যকালীবাবু

রাজনীতিক্ষেত্রেও যদিচ একজন মাতব্বর ব্যক্তি, তবু এখানে-সেখানে সুবিধামতো কিছু-কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু তিনি করবেন, এমন আশঙ্কা পুলিশের মনেও নেই।

সুতরাং সকালের দিকেই ভুজঙ্গ গিয়ে নৃত্যকালীবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হোল।

কাগজের ব্যবসায় এবং যুদ্ধের বাজারে আরও যেন কি কি উপায়ে নৃত্যকালী লক্ষ লক্ষ টাকা করেছেন ব'লে শোনা যায়। কিন্তু কি তাঁর বাড়ির, কি তাঁর নিজের সাবেক চাল এখনও অব্যাহত আছে।

তখন তিনি দাঁতন করছিলেন। সেই অবস্থাতেই ছুটে এসে ভুজঙ্গকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—বসুন, বসুন। ওরে, চা নিয়ে আয়।

আপ্যায়নের বাহুল্যে ভুজঙ্গ অভিভূত হয়ে পড়লো।

—তারপরে? কবে এলেন? কোথায় উঠেছেন? এখনও কি গা-ঢাকা অবস্থায়? তা'হলে? এখনই কাজে যোগ দিতে পারছেন না? আপনারাই হলেন বঙ্গমাতার সত্যিকারের সন্তান মশাই। আপনারা আছেন, তাই দেশ এখনো বেঁচে আছে। কি ডামাডোল যে গেল মশাই!

একগাদা প্রশ্ন বাঁধমুক্ত স্রোতোধারার মতো বেরিয়ে এল।

ভুজঙ্গ প্রশ্নধারার যথাযথ উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কাগজের খবর কি?

—ভালো,—নৃত্যকালীবাবু বললেন,—খুব ভালো। প্রচুর বিক্রি, প্রচুরতর বিজ্ঞাপন, বাজারে পড়তে পায় না, ছেপে উঠতে পারি না,—বাইরে যা শুনেছেন সবই সত্যি। কিন্তু তাতে কি?

—কেন?

—আরে মশাই, আমার আনন্দটা কোথায়?

—কেন?

– জিগ্যেস করছেন, কেন? আপনি কই?' সকালে উঠে চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে যে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় পড়তে-পড়তে চা খেতে ভুল হয়ে যেত, সে আগুনের মতো লেখা কই?

হঠাৎ নৃত্যকালীবাবু গলা খাটো ক'রে বললেন, 'গণসেবক' আমি আর পড়ি না। জানেন? ছুঁই না। ওই দেখুন, ওই কোণে প'ড়ে রয়েছে। মেয়েরা পড়ে, চাকর-বাকরে পড়ে, ব্যস। একথা কাউকে বলবার নয়, বুঝলেন ভুজঙ্গবাবু, বলবার নয়। আপনি না আসা পর্যন্ত 'গণসেবক' ওইখানেই প'ড়ে থাকবে।

এই সহৃদয় স্তুতিবাদের উত্তরে ভুজঙ্গ কি যে বলবে, ভেবে পেলে না। বললে, কিন্তু আমার তো আসার কোনো উপায়ই নেই এখন। সত্যি-সত্যি আপোষ হবে কি না, হ'লে কতদিনে হবে, কিছুই তো বুঝছি না।

—তা ঠিক।

এর পরে আরম্ভ হোল সাধারণ কুশল প্রশ্ন: নয়নবাবু ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙ্গে পড়ে আছেন; বিকাশবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক; কালীবাবু হঠাৎ কমিউনিষ্ট হয়ে গিয়ে সিভিল সাপ্লাইতে ভালো চাকরী পেয়েছেন; মেঘেন্দ্রবাবুর ডায়াবিটিস্, প্রায়ই অফিস কামাই করেন···

হঠাৎ এক সময় ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, আমার চাকরীটা কি আছে এখনও?

নৃত্যকালীবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, আছে মানে? যাবে কোথায়? দেশের কাজে গিয়েছেন আপনি, আপনার চাকরী খায় কে? বেশ বলেন আপনি!

ব'লে নৃত্যকালীবাবু হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

ভুজঙ্গ বললে, তাহ'লে মাইনে বাবদ কিছু টাকা যদি দিতেন। বুঝতেই তো পারছেন, গা-ঢাকা দিয়ে থাকার খরচ!

নৃত্যকালীবাবুর চেহারাই বদলে গেল এবার। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, এইবারে বিপদে ফেললেন ভুজঙ্গবাবু।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিঃশব্দে।

নৃত্যকালীবাবু বললেন, ছুটির নিয়ম-কানুন তো আপনি জানেন ভুজঙ্গবাবু।

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, জানে না।

—নিয়ম হচ্ছে, এক সঙ্গে এক মাসের বেশি কামাই হ'লে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে।

—ডাক্তারের সার্টিফিকেট! আমি তো

বাধা দিয়ে নৃত্যকালীবাবু বললেন, সে আমি জানি। দেশের কাজে দেশের একজন দীন সেবক হিসাবে আমিও তা বুঝি। কিন্তু অফিস তো সেকথা বুঝবে না। অফিস তো একটা যন্ত্র। না কি বলুন!

—কিন্তু আমাদের তো কখনও ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতে হয় না।

—আগে হোত না, কিন্তু এখন হয়। আমাদের নতুন ম্যানেজার সেই সব পুরোনো গদাই-লস্করী চাল একেবারে বদলে দিয়েছেন। একেবারে বিলিতি অফিস বানিয়ে তুলেছেন! তাতে ফল যে কিছু হয়নি তা নয়।

—নতুন ম্যানেজার এসেছেন না কি?

—হ্যাঁ। আপনি দেখে যাননি বুঝি? রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি on principle তাঁর কাজে interfere করি না। নইলে আপনার এই সামান্য ক'টা টাকা···আচ্ছা, আচ্ছা, এক কাজ করলে কি হয়?

—কিছু দরকার নেই,—ভুজঙ্গ বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো,—যে নিয়ম চলছে তা disturb করা ঠিক নয়। আচ্ছা, উঠি নৃত্যকালীবাবু।

ভুজঙ্গ নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল।

কর্মক্ষেত্রে ভুজঙ্গ বহুতর লোকের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু নৃত্যকালীবাবু তার কাছে চিরদিনই রহস্যময় অপার সমুদ্রবিশেষ। এই লোকটির কখনই সে কিনারা পায়নি। দেখেছে, রাজনীতি অথবা জীবিকার্জন, যে কোনো ক্ষেত্রে যখন যাকেই তিনি আশ্রয় করেছেন, তাকেই ডুবিয়েছেন। ভুজঙ্গের কাছে তিনি রাজনৈতিক ব্যারোমিটার। রাজনীতিক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে কোন্ পক্ষ জিতবে, ভুজঙ্গ তা ঠিক করে নৃত্যকালীবাবুকে দেখে। যে পক্ষে নৃত্যকালীবাবু শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষই যে হারবে, ভুজঙ্গ সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

ফেরার পথে চলতে চলতে ভুজঙ্গ আপন মনেই হাসলে। হায় বঙ্গজননী, অনন্তকাল থেকেই তোমার ভাগ্য তোমার এইসব সুসন্তানদের হাতেই। তোমার ইতিহাসের ভাঙা-গড়া, যারা বলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম-রবীন্দ্র,

বিবেকানন্দ-অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন-সুভাষের হাতে, তোমার ইতিহাস তারা জানে না। জন্মের প্রথম দিন থেকেই তোমায় রক্তগত শনি। রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে তারাই। পাশ কাটিয়ে যায়, সাধ্য কার? রামমোহন আর বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্র আর অরবিন্দ, বিবেকানন্দ আর সুভাষচন্দ্র, কাকে না নাকে-খৎ দিতে হয়েছে এদের কাছে? বাংলাদেশে বড় হওয়া যে কতবড় অপরাধ এঁদের সবাইকেই সেকথা হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হয়েছে।

নৃপেনের বাড়িতে এসে যখন সে পৌঁছুলো, তখন বেলা অনেক।

শ্রাবণের শেষের দিক। বৃষ্টি কয়েকদিন না হওয়ায় একটা বিশ্রী গুমোট পড়েছে। রোদের চেয়ে সেইটেই বেশি কষ্টকর। বস্তুতঃ রোদ বিশেষ ছিলও না। টুকরো টুকরো মেঘ রাজপথে ঘন ঘন ছায়া ফেলে যাচ্ছিল। ছিল একটা ভাপ্‌সা গরম, যে গরমে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

সেই গরমে রক্তবর্ণ মুখে এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে ব্রততীর ড্রইং রুমে যখন ভুজঙ্গ পৌঁছুলো, তখন ব্রততী সেখানে যেন চাঁদের হাট জমিয়ে বসেছে। শুভেন্দু, শঙ্কর, ইলা···শুধু নৃপেন নেই।

ভুজঙ্গকে দেখে ওরা সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠলো।

আশ্চর্য্য মেয়ে এই ব্রততী। সমস্ত সময় ও যেন জমিয়ে রাখে। পাঁচজনকে নিয়ে হৈ হৈ না করতে পারলে ওর যেন চলে না। ধনীর গৃহিণী, হাতে কাজ নেই ব'লে যেন যত অকাজ নিয়ে মাতে। ভুজঙ্গের বুঝতে বিলম্ব হোল না, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে ব্রততী এদের সবাইকেই এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং অপরাহ্নিক চা-পবের পরে সন্ধ্যার দিকে এরা ছাড়া পাবে। ওর প্রকাণ্ড গাড়ীখানি ছুটবে এঁদের পৌঁছে দিতে। এর যে কোনো আবশ্যক ছিল তা নয়। কিন্তু সকলের কাছে আবশ্যকের অর্থ তো একরকম নয়।

ভুজঙ্গের মনে পড়ে বছর পাঁচ-ছয় আগে একবার ইতিহাসের একটা সেট কিনে যখন সে মেসে ফিরেছিল, তাদের মেসের অমূল্য নামে একটি ছেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হবে ওগুলো?

তার আমকাঠের টেবিলের উপর বইগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভুজঙ্গ উত্তর দিয়েছিল, এগুলো বড় ভালো বই হে!

—কত দাম নিলে ?

—একশো কুড়ি টাকা।

বিস্ময়ে অমূল্যর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল: আপনার কি মাথা খারাপ ?

ভুজঙ্গ হো হো হেসে বলেছিল, কেন হে ?

—একশো কুড়ি টাকা দিয়ে ওগুলো কিনলেন ?

—কিনলাম বই কি !

—ওতে যে এক বিঘে জমি হোত মশাই !

অস্বীকার করবার উপায় নেই তা হোত। ভুজঙ্গ কিন্তু এ নিয়ে আর তর্ক করেনি। সে বুঝেছিল, বইগুলো কেনার আবশ্যকতা অমূল্যকে কিছুতে বোঝানো যাবে না।

আজও সেই কথাই তার মনে পড়ল। এই দুর্দিনে, যখন চাল নেই, ডাল নেই, তরি-তরকারী কয়লা-চিনি কিছুই নেই, তখন এতগুলি লোককে অকারণ ডেকে এনে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা অনেকের পক্ষেই অনাবশ্যক বোধ হবে। কিন্তু ভুজঙ্গের মনে হোল, স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে গেলে হয়তো ব্রততীর পক্ষে এইটেই একান্ত আবশ্যক। কে জানে !

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন এই রোদ্দুরে ?

—এক মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে।

শঙ্কর বললে, সন্ধ্যাবেলাই মহাপুরুষদের সঙ্গে দেখা করার প্রশস্ত সময়।

ভুজঙ্গ বললে, সকল মহাপুরুষের সঙ্গে নয়,—অন্ততঃ এঁর সঙ্গে নয়। আচ্ছা ব্রততী, তোমার ওই টি-পটে কিছু অবশিষ্ট আছে ?

ব্রততী বললে, চা আর খেতে হবে না ভুজঙ্গদা। বরং একটু সরবৎ ক'রে আনি আপনার জন্যে।

—যা আনবে কিন্তু শিগগির এনো। তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি। কিন্তু নৃপেন কোথায় গেল ? তাকে দেখছি না তো।

ব্রততী উত্তর দেবার আগেই ইলা বললে, তিনি গেছেন ব্রততীদি'র জন্যে টাকা রোজগারের ফিকিরে।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, ব্রততীদি'র জন্যে মানে ?

ইলা বললে, মানে ওঁদের কাজ ভাগ হয়ে গেছে। রোজগারের ভার পড়েছে নৃপেনবাবুর ওপর, আর খরচের ভার ব্রততীদি'র। না ব্রততীদি ?

ব্রততী হেসে বললে, তা যা বলেছ ! যার যা নেশা। ওঁর হচ্ছে টাকা রোজগারের নেশা, আর আমার খরচের। আমরা পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ বড় একটা করি না।

শুভেন্দু আর শঙ্করের দিকে চেয়ে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে করার চেয়ে বোকামি পুরুষমানুষের আছে ?

ইলা বললে, আমি জানি, আরও আছে।

সবাই ওর দিকে চাইলে। বললে, কি বলুন ?

ইলা বললে, পলিটিক্স করা।

—কি রকম ?

—বিয়ে ক'রে লোকে স্ত্রী পায়, ছেলে-মেয়ে পায়, টাকা রোজগারের একটা প্রেরণা পায়,—নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হ'লে স্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে কিছু সেবাও পায়। কিন্তু পলিটিক্স ক'রে কি পায় বলুন ?

শঙ্কর বললে, একদিকে ফুলের মালা, করতালি,—অন্যদিকে জেল, ফাঁসি, নির্বাসন।

শুভেন্দু বললে, তাও ঠিক হোল না শঙ্কর। ওঁরা কিছুই না চেয়েও একরকম সবই পান। গান্ধীজির একটা কথায় লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁর পায়ের তলায় এসে হাজির হয়, আর রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর জন্যে বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত জীর্ণ দেহে নাটুকে দল নিয়ে বেরুতে হয়। আরও কাছাকাছি দেখ, আজ যে আমরা এখানে ভূরিভোজনের প্রতীক্ষা করছি, তারও উপলক্ষ্য একজন রাজনীতিক। নয় কি না বল।

ব্রততী ভুজঙ্গের জন্যে সরবৎ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ভুজঙ্গের সামনের টিপয়ে সেটা রেখে বললে, আমার দাদার পিছনে আপনারা কেউ লাগবেন না ইলাদি। বেচারার ঘর নেই, সংসার নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই। গেরস্তর বাড়িতে ওর চেয়ে কার দাবী বেশি ?

শুভেন্দু বললে, কিন্তু তোমার দাদার দাবী যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ভাই।

—কি ক'রে?—ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে।

শুভেন্দু হেসে বললে, গৃহস্থের গৃহ পর্যন্ত দাবী করুন, আপত্তি করব না। কিন্তু গৃহিণী পর্যন্ত দাবী করলে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া বলব না?

এই কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। এই একটা কথায় শুভেন্দুর শুভ্র সুন্দর হৃদয়টি পর্যন্ত যেন উদঘাটিত হয়ে গেল।

ভুজঙ্গ হাত জোড় ক'রে বললে, আপনার গৃহিণীটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন শুভেন্দুবাবু। বিয়ে করার কি যন্ত্রণা সে আমি জানি না, আপনারা জানেন। কিন্তু পরের বৌ নিয়ে ঘর করা যে কি যন্ত্রণা সে বোধ হয় খুব কম লোকই জানে। আমার অহঙ্কার এই যে, সেই অল্পসংখ্যক হতভাগাদের আমি একজন।

ওর কথার ভঙ্গিতে আর এক প্রস্থ সবাই হেসে উঠলো। সে হাসি থামতে-না-থামতে গাড়ি-বারান্দায় নৃপেনের গাড়ি থামাব শব্দ পাওয়া গেল। এবং পর-মুহূর্তেই দুম দুম ক'রে নৃপেন এসে উপস্থিত।

অভ্যাগতদের দিকে চেয়ে হাত জোড় ক'রে বললে, আমাকে মার্জনা করবেন। কিন্তু এমনই জরুরী কাজ ছিল যে, আপনারা এসে অপেক্ষা করবেন জেনেও না বেরিয়ে পারিনি। আপনাদের যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি তো?

ইলা বললে, সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দোব কেন? আপনি তো আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নি।

নৃপেন লজ্জিত হয়ে বললে, না, তা করিনি।

—তবে? আপনি যে বাড়ির মালিক সেইটে আমাদের জানাচ্ছেন? কিন্তু দলিল দেখালেও আপনার মালিকানা আমরা স্বীকার করব না।

ব্রততী হেসে বললে, দেখাতে বলুন না দলিলটা ইলাদি। তাহ'লে উনিও আপনাদের দলে গিয়ে পড়বেন। বাড়ি আমার নামে।

—তবে ?—ইলা চোখ পাকিয়ে বললে,—বসুন এই খানে আমাদের সঙ্গে। চা খাবেন, না সরবৎ খাবেন বলুন। তারপরে খাবার জায়গা হোলে আমাদের পিছু পিছু উপরে যাবেন। বুঝলেন ?

—তথাস্তু। কেবল এই পোষাকটা ছেড়ে আসবার জন্যে আমাকে দু'মিনিট ছুটী দিন। তার আগে খাবার ডাক পড়লে যেন আমাকে ফেলেই খেতে যাবেন না।

ব'লে হাসতে হাসতে উঠে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর নৃপেন আবার সেই খবরের কাগজের প্রসঙ্গ তুললো :

—তুমি রাজি হয়ে যাও ভুজঙ্গ, একখানা কাগজ আমি বার করি।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, আমার কথা তো তোমাকে আমি পরিষ্কার ক'রেই বলেছি। তারপরেও আমাকে নিতে তোমার সাহস হয় ?

—হয়। ব্যবসাদারের দুঃসাহসের অন্ত নেই। দুটো প্রস্তাব আমার সামনে এখন রয়েছে : একটা হচ্ছে, কয়েকজন বিশিষ্ট লীগপন্থী একটা খবরের কাগজ বের করতে চান। তার খরচা তাঁরা আমাকে চালাতে বলছেন।

ভুজঙ্গ বিস্মিত হোল : তার খরচ তুমি চালাবে কেন ? লীগের কাগজ, সুতরাং হিন্দুকে গালাগালি দেবে, কংগ্রেসকেও গালাগালি দেবে। তার জন্য তুমি ঘরের কড়ি খরচ করবে কেন ?

নৃপেন একটু কুটিল হেসে বললে, কড়িটা ঠিক আমার ঘরের নয়। অর্থাৎ প্রথমে আমাকে দিতে হবে বটে, কিন্তু কণ্ট্রাক্টের মারফৎ বহুগুণিত হয়ে আমার কুটিরেই আবার তা ফিরে আসবে।

শুভেন্দু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলে, এ আপনি পারবেন ?

ভুজঙ্গ বললে, পারবে। এবারে তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা শুনি নৃপেন।

—দ্বিতীয়টা হচ্ছে,—নৃপেন বললে,—নিজেই একখানা কাগজ বের করা। কিন্তু সেটা তোমার অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করছে।

—ধর, আমি অনুগ্রহ করলাম। তার পরেও কি সমস্যা রইলো না ?

—কি সমস্যা ?

—আমি না গা-ঢাকা দিয়ে আছি ?

নৃপেন যেন লাফিয়ে উঠলো। বললে. সেটা একটা সমস্যাই নয়। ও আমি সহজেই সমাধান ক'রে নেবো। শুধু তুমি সম্পাদনভার নিতে রাজি হয়ে যাও, ব্যস্।

বিস্ময়ে ভুজঙ্গ সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, তাহ'লেই হয়ে যাবে ? আর আমাকে পুলিশে ধরবে না ? এতই সোজা ?

উপেক্ষার সঙ্গে একটা ফুঁ দিয়ে নৃপেন বললে, আবার কি ! রাজি হয়েই দেখনা। কিসের জন্যে ধরবে ? ইংরেজ আর এদেশে থাকছে না, তুমি নিশ্চয় জেনো।

—কোথা থেকে শুনলে ?

—যেখানে থেকেই শুনি। তুমি নিজেও কি বোধ করছ না ?

—করছি তো। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, তা যদি সত্যিই হয় নৃপেন, তোমার কাগজে আমি আছি।

আনন্দে নৃপেন লাফিয়ে উঠলো : ঠিক ? আমি তাহ'লে বন্দোবস্ত করি ? প্রেস একটা বিক্রি আছে। সেইটেতেই অবশ্য হবে না। আরও কতকগুলো ফ্ল্যাট মেশিন দেখতে হবে। চেষ্টা-চরিত্র করলে একটা রোটারীও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে বাড়ি। অবশ্য চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ওপর খানিকটা জায়গা আমার কেনা আছে। কিন্তু সেখানে বাড়ি তুলতে সময় নেবে, যত তাড়াতাড়িই করি। তা সে যাই হোক···অবাক হয়ে কি দেখছ ভুজঙ্গ ?

—তোমাকে। ভাবছি, তুমি কি স্বপ্ন দেখছ ?

—স্বপ্ন ? স্বপ্নও দেখি বই কি ? কিন্তু একেবারে দিবাস্বপ্ন নয় নিশ্চয়ই। এই বাড়ি স্বপ্ন নয়, ওই গাড়ি স্বপ্ন নয়। অথবা স্বপ্নও অনেক সময় সত্যি হয়, এবং যেমন ক'রে এই বাড়ি-গাড়ি সত্যি হয়েছে,—অবিশ্বাস করো না,— আমার খবরের কাগজও তেমনি ক'রে সত্যি হবে।

ভুজঙ্গ বললে, না, অবিশ্বাস করি না নৃপেন। তোমার স্বপ্ন যথার্থই সত্যি হয়, কিন্তু সেই দুঃসাধ্য প্রয়াসে তুমি নিজে মিথ্যে হয়ে যাও। আমার অবিশ্বাস সেইখানে—তোমার কাজকে নয়, তোমাকে।

নৃপেন কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে, পারলে না। বললে, কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বল ভুজঙ্গ।

—আর একদিন বলব নৃপেন। কাগজ যদি সত্যিই তুমি কর, আর আমাকে নিয়েই, তাহ'লে তোমার কথা, আমার কথা, সমস্ত কথাই স্পষ্ট হওয়া দরকার নয় কি?

সেদিন এর বেশি আর কোনো কথা হোল না।

আঠারো

পরের দিন সকালে উঠেই ভুজঙ্গ গেল মোদাব্বেরের বাড়ি, তার সঙ্গে দেখা করতে। নৃপেন তার আগেই বেরিয়ে গেছে কাজে।

ন'টা বাজতে না বাজতেই নৃপেন ব্যস্তভাবে ফিরলো। এমন সময় কখনই সে বড় একটা ফেরে না। ব্যস্তভাবে নেমে এল ব্রততী। মনে ভয়, নৃপেনের অসুখ বিসুখ করেনি তো?

তাকে দেখেই ব্যস্তভাবে নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, ভুজঙ্গ ফেরেনি?

—না তো। কেন? কি ব্যাপার?

—সে না মুদাব্বেরের ওখানে যাবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে? তুমি অমন ক'রে জিগ্যেস করছ কেন?

—সর্বনাশ হয়েছে! দাঙ্গা বেধে গেছে।

নৃপেন মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো।

—দাঙ্গা কি গো?

—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। আজ Direct Action day—শোনোনি? এরই মধ্যে যা দেখে এলাম, ভুজঙ্গকে বাঁচানো যায় কি ক'রে ভাবছি।

—তাই নাকি ?

কয়েকটি মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে মাল-সরবরাহ সম্পর্কে তার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। নৃপেন ছুটলো তাদের কাউকে টেলিফোন করতে। তারা চেষ্টা করলে ভূজঙ্গকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ফোনে কোনো সাড়াই নেই। এক্সচেঞ্জ নিঃঝুম।

অনেকক্ষণ টেলিফোনে বৃথা ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে নৃপেন ছুটলো থানায়। সেখানেও তার কিছু খাতির আছে। সেখানে গিয়ে যে অফিসারের সঙ্গে দেখা, সে ভদ্রলোক হিন্দু। নামটা নৃপেন ঠিক মনে করতে পারলে না, কিন্তু চেনা মুখ। তাকেই ঘটনাটা সে বললে।

ভদ্রলোক চিন্তিতমুখে বললেন, ওটা তো আমার এলাকা নয়, তাহ'লে যা হয় করতাম। তাঁর বাঁচবার কোনো উপায়ই চোখে পড়ছে না নৃপেনবাবু, এক, যদি মিলিটারীর সাহায্য কোনোরকমে পান।

নৃপেন বললে, সে চেষ্টাও করেছি। কয়েকজন মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে জানাও আছে। কিন্তু বার বার টেলিফোন ক'রে কোনো সাড়াই পেলাম না এক্সচেঞ্জ থেকে।

—টেলিফোন লাইন বন্ধ। সাড়া পাবেন কি ক'রে ?

—তাহ'লে ?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, সত্যি-সত্যি যদি জানা থাকে কোনো মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে,

—জানা থাকে কি মশাই, বিলক্ষণ জানা আছে। কত রাত্রে

—তাহ'লে এখানকার টেলিফোনে নাম্বারটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। পেতেও পারেন।

পারেন নয়, পাওয়াই গেল, এবং অনতিবিলম্বে। এবং একটুক্ষণ দ্বিধা ক'রে অফিসারটি নৃপেনকে সাহায্য করতে রাজিও হ'লেন। কথা হোল, উনি ওঁর জীপ নিয়ে নৃপেনের বাড়ি আসছেন। সেখান থেকে নৃপেনকে সঙ্গে ক'রে মুন্নাব্বেরের বাড়ি এবং তখনও যদি ভুজঙ্গ জীবিত থাকে, তাকে নৃপেনের বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

তখনও যদি ভুজঙ্গ জীবিত থাকে। ফেরবার পথে এই একটা কথাই নৃপেনের কানে তার হৃদপিণ্ডের তালে তালে বাজতে লাগলো।·· তখনও যদি ভুজঙ্গ বেঁচে থাকে···তখনও যদি ভুজঙ্গ বেঁচে থাকে ··

কিন্তু বেঁচে কি সে থাকবে? মুদাব্বেরের মনের কথাই বা কে জানে? তা ছাড়া যদি সে রাস্তাতেই আক্রান্ত হয়, তখন মুদাব্বেরকেই বা পাবে কোথায়?

ভাবতেও নৃপেনের মাথা ঝিম ঝিম করে।

মিলিটারী নিয়ে নৃপেন যখন গিয়ে মুদাব্বেরের বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছুলো তখন মুদাব্বেরের বাড়ির সামনে একটা ভিড় জমে গেছে। তাদের কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, কারও বা লাঠি। দোতালার দিকে চেয়ে তারা কি যেন শাসাচ্ছে আর মাঝে মাঝে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি তুলছে। পিছনে যে জীপ এসে দাঁড়িয়েছে, উত্তেজনায় তারা টের পায়নি।

জীপ হর্ণ দিলে।

নৈঃশব্দ্যের বহুতর রূপ আছে। একটি নতুন ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে নৃপেনের পরিচয় হোল। চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যেখানে একটা মারমুখী উত্তেজিত জনতা আস্ফালন করছে। সেই ভীতিজনক আস্ফালনও যেন নিস্তব্ধতার অতলতায় ছোট ছোট নুড়ির মতো টুপ টুপ ক'রে প'ড়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

আর একটা হর্ণ দিতে জনতা পিছু ফিরে চেয়েই চমকে উঠলো। সশস্ত্র সৈন্য তাদের দিকে রাইফল উঁচিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের জিপ।

মুহূর্ত মধ্যে দু'পাশের সরু গলি দিয়ে, পাশের বাড়ির পাঁচিল টপকে কে যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তার পাত্তা পাওয়া গেল না। যেখানে দুশো লোক রক্তের উন্মাদনায় বীভৎস চীৎকার করছিল, কতকগুলো ইট-পাথর ছাড়া সেখানে আর কিছুরই চিহ্ন রইলো না।

জীপখানা মুদাব্বেরের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। ভারী ভারী লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে দরজাটা ওরা প্রায় ভেঙেই এনেছিল। নৃপেনকে দেখে মুদাব্বের নিচে এসে দরজা খুলে দিলে।

কী চেহারা হয়েছে তার? চোখের মধ্যে মিশে রয়েছে কী কঠিন পৌরুষের সঙ্গে কী লজ্জা এবং হতাশা!

নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, ভুজঙ্গ আছে?

মুদাব্বেরের কথা বলবার শক্তি নেই। এই কয়টা ঘণ্টা তার স্নায়ুর উপর দিয়ে প্রচণ্ড টান গিয়েছে। শুধু আঙুল দিয়ে দোতলা দেখালে।

জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে নৃপেন দোতলায় ছুটলো।

—ভুজঙ্গ! ভুজঙ্গ!

সাড়া নেই। সামনের ঘরে ঢুকে দেখে ভুজঙ্গ দুই হাত মুঠিবদ্ধ ক'রে স্তব্ধভাবে ব'সে।

তার হাতে একটা টান দিয়ে নৃপেন বললে, আমি মিলিটারী নিয়ে এসেছি। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। শিগগির ওঠো।

ভুজঙ্গ প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর দিকে চাইলে। পরমুহূর্তেই ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে এল।

বললে, না। আমি এবং মুদাব্বের এইখানে এদের হাতে মরতে চাই। আমার দেশের উন্মাদদের হাত থেকে কোথায় পালিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারি বলো? তার চেয়ে এইখানেই ওরা আমাদের মারুক।

ভুজঙ্গ গুম হয়ে বসে রইল।

নিচে মিলিটারী তাড়া দিচ্ছে। বলছে, আর দেরি করলে ওরা জিপ নিয়ে চ'লে যাবে।

নৃপেন বাস্তববাদী ব্যবসায়ী। সে জানে, বেঁচে থাকলে তর্ক ক'রে সমাধান করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা করলে, মুদাব্বেরেরও কি এখানে জীবনের ভয় আছে?

ভুজঙ্গ বললে, আছে। কারণ ও কাফেরকে আশ্রয় দিয়েছে।

নৃপেন বললে, তাহ'লে তুমিও চলো মুদাব্বের আমার বাড়ি।

মুদাব্বের হাসলেঃ না, তুমি ভুজঙ্গকে নিয়ে যাও। এরা আর যাই করুক, আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে না। তা ছাড়া আমার ছেলে-মেয়ে রয়েছে।

—আমার বাড়িতে জায়গার অভাব হবে না। সব শুদ্ধ আমার ওখানে যেতে পার।

নিচে আবার অস্থির ভাবে জিপের হর্ণ বেজে উঠলো।

মুদাব্বের বললে, তুমি আর দেরি কোরো না নৃপেন। আমি বলছি, আমার যাবার দরকার হবে না। তুমি ভুজঙ্গকে নিয়ে এখুনি যাও।

—ওঠো ভুজঙ্গ।

—না।

নৃপেন আর তর্ক করলে না। চক্ষের পলকে ভুজঙ্গকে পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে এসে জিপের উপর ফেললে। কমাণ্ডাণ্টকে চোখের ইসারায় বললে, চলো।

সমস্ত দিন ভুজঙ্গ যেন সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে লাগলো। ওর বুকের মধ্যে যে কি ঝড় বইছে, কেউ তার পরিপূর্ণ হিসাব রাখে না। কিন্তু ঝড় যে প্রচণ্ড, তা যে ওর সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের মহীরুহকে, এবং সেই সঙ্গে তারই ছায়ায় প্রবর্ধমান ওর সমগ্র সত্তাকেও, নাড়া দিয়ে তোলপাড় ক'রে তুলছে, তা বুঝতে কারও বিলম্ব হয় না।

নৃপেন ব'লে গেছে, কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে,—ওকে যেন একা থাকতে দেয়। ব্রততী সেজন্যে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। ওর মনে আরও কেমন একটা ভয় এসেছে, ভুজঙ্গ হয়তো সুযোগ পেলে টপ ক'রে পালিয়েও যেতে পারে। কোথায়? যে-মৃত্যু হাতছানি দিয়ে মানুষকে ফুসলে নিয়ে যায় তার কাছে, সেইখানে!

ঘটনাটা অনেক দিন আগেকার। তখনও ব্রততীর বিয়ে হয়নি। ওদের পাড়ায় একটি ছেলে ছিল হারাধন। হারাধন তখন কলেজে পড়তো। হঠাৎ একদিন সে কলেজ থেকে চলে এল। বললে হষ্টেলে সে আর থাকতে

পারছে না। যথনই একা থাকে, তথনই তার সদ্যমৃতা পিতামহী তাঁকে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করে।

হারাধনের বাবা ডাক্তার মানুষ। এ সব কথা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, ওর পড়াশুনা ভালো লাগছে না, তাই এই সব আজগুবি কাহিনী বানাচ্ছে। কিন্তু ওর মা দেখেছিলেন, ব্রততীও দেখেছিল, ওর চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ছেলেটিকে ওর মা সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। কিন্তু এক ফুরসুতে সত্য সত্যই সে আত্মহত্যা ক'রে বসলো,—গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে।

সেই দৃষ্টি ব্রততী এখনও ভুলতে পারে না। ভুজঙ্গের চোখেও যেন সেই দৃষ্টি ও দেখছে। ভুজঙ্গের সম্বন্ধে ভয়েব ওর অন্ত নেই। এ সব লোককে এমনিতেই মৃত্যু ডাকে। এখন তো কথাই নেই। আড়ে-আড়ে চেয়ে দেখছে, ওর চোখেও সেই হাবাধনেব দৃষ্টি যা বুকেব ভিতর পর্যন্ত ঠাণ্ডায় বরফের মতো জমিয়ে দেয়।

ভুজঙ্গের সম্বন্ধে তাই যেন ও আরও সতর্ক থাকে!

সন্ধ্যা বেলায় নৃপেনের গাড়ীতে নৃপেন শুভেন্দুকে নিয়ে এলো। তা ছাড়া শুভেন্দুব আসবার উপায় ছিল না। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। বড়-বড় অফিস নিজেদের ট্রাকে কর্মচারীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে, পুলিশের সাহায্যে। কিন্তু অফিসের যাওয়া-আসাব সময়টুকু ছাড়া অন্য সব সময় পুলিশ একেবারেই নিষ্ক্রিয়।

ওরা যখন ভুজঙ্গের ঘরে এলো, ভুজঙ্গ তখন জানালাব গবাদে ধ'রে নিঃশব্দে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে। ওদের ডাক শুনে সে যেন প্রথমটা চমকে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে এসে খাটের উপর বসলো।

শুভেন্দু বললে, অগষ্ট বিপ্লব দেখলাম, বোমার ভয়ে ক'লকাতা জনশূন্য হ'তে দেখলাম, দুর্ভিক্ষ দেখলাম, কিন্তু শহবেব এমন ভয়ঙ্কর কদর্য রূপ আর কখনও দেখিনি। মাইকেল নরকের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে আসবার সময় মনে হচ্ছিল, আমরা যেন মারা গেছি এবং মৃত্যুর পরে সেই নরকের পথ দিয়ে চলেছি, না নৃপেনবাবু?

নৃপেন হাসলে। বললে, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছিল না।

—তবে ?

—মনে হচ্ছিল, গান্ধীজি এতদিন আমাদের যে-রাজনীতি শিখিয়েছেন সেটা বাস্তব রাজনীতিই নয়। জিন্নার কল্যাণে আমরা সত্যিকার রাজনীতির রূপ দেখলাম, - যার একহাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে ডমরু, আর পায়ে মৃত্যুর জিঞ্জির। তুমি কথা বলছ না যে ভুজঙ্গ ?

ভুজঙ্গ উত্তরে কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক শব্দ উঠলো। ভুজঙ্গ ছুটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলে, ওপাশের ফুটপাথে একটা লোক রক্তাক্ত কলেবরে চিৎ হয়ে প'ড়ে ছটফট করছে। পাশেই একটা লোক শান্তভাবে ছোরাটা কলের জলে ধুচ্ছে। ধোয়া হয়ে গেলে সে মৃতের পানে আর একবার চেয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার রিভলবার আছে নৃপেন ?

—কী সর্বনাশ !—বিস্ময়ের সঙ্গে নৃপেন বললে,—রিভলবার নিয়ে তুমিও বেরুবে না কি ?

—জানি না কি করব। কিন্তু মনে হচ্ছে, মাত্র দুটো পথই আমাদের সামনে খোলা,—হয় মারা, নয় আত্মহত্যা করা। ওরা আমাকে মারতো যদি আমি বেঁচে যেতাম নৃপেন, কেন যে আমাকে বাঁচালে !

নৃপেন হেসে বললে, তার কারণ ও দু'য়ের চেয়ে ভালো তৃতীয় একটা পথ আছে, যাতে মরাও যায়, মারাও যায়।

—কি পথ ?

নৃপেন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, খবরের কাগজ বের করা।

শুভেন্দু এবং ভুজঙ্গ দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলো।

ভুজঙ্গ বললে, যা বলেছ ! তিলে তিলে আত্মহত্যার এমন মহৌষধ আর নেই। তুমি কি ও মতলব এখনও ছাড়োনি ?

—না। বরং আরও জোর করেই ধরেছি। প্রেসটা কেনার বায়নাপত্র আজ হয়ে গেল। এই সপ্তাহেই কেনা সম্পূর্ণ হবে। বাড়ি তো তৈরিই রয়েছে। আসছে সপ্তাহ থেকে তোমার কাজ আরম্ভ হবে।

ভুজঙ্গ বললে, এখন কি কাজ হবে, না লোকজন পাওয়া যাবে? দাঙ্গা একটু শান্ত হোক তবে তো।

নৃপেন বললে, এই দেখ! চিরকাল রাজনৈতিক নাম-সংকীর্তন ক'রে এলে। বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে তো পরিচয় নেই। এ কি কখনও থামবে? যতদিন না ভারতের একটা ব্যবস্থা হয় ও এখন লেগেই রইল,—কখনও জোরে চলবে, কখনও আস্তে,—কখনও থামবে, কখনও বাধবে,—বর্ষার বৃষ্টির মতো। তার জন্যে কাজ বন্ধ থাকবে?

—কিন্তু এখন কি লোকজন পাওয়া যাবে?

—কেন যাবে না? কাজ না করলে লোকে খাবে কি? ভুজঙ্গ, এই যে এক ইক-মিক কুকার পেটের মধ্যে বসানো রয়েছে, এরই জন্যে মানুষের নিশ্চিন্তে শোক করবারও সময় নেই। বেরুতেই হবে, খাটতেই হবে। সেজন্যে তুমি ভেবো না, শুধু নিজে তৈরি হয়ে নাও।

ভুজঙ্গ বললে, আমার আর কি বলো, আমি তৈরিই আছি।

তারপর শুভেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীর চিঠি পেয়েছেন?

শুভেন্দু বললে, না। আমি তো আপনার কাছ থেকেই খবর নিতে এলাম।

ভুজঙ্গ বললে, আমিও কোনো খবর পাইনি। আমি ভাবছি শুভেন্দুবাবু, শ্রী আর সেখানে থেকেই বা কি করবে? এই দাঙ্গার ডামাডোলে অন্ততঃ বিয়াল্লিশের বিপ্লবীরা খানিকটা নিরাপদ হয়েছে। না কি বলেন?

নৃপেন বললে, নিঃসন্দেহে। তাঁকে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম ক'রে দিন। বোধ হয় টেলিগ্রাফ-মণিঅর্ডারে কিছু টাকা পাঠানোও দরকার হবে।

ব'লে ব্রততীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

ব্রততী বললে, হবে বোধ হয়। শ'খানেক দাও না পাঠিয়ে।

—তাই হবে।—নৃপেন বললে।

শুভেন্দু বললে, ও টাকাটা আপনাকে পাঠাতে হবে না নৃপেনবাবু। আমার কাছে রয়েছে কিছু টাকা। আমিই কালকে পাঠিয়ে দোব'খন।

—তাই দেবেন।—নৃপেন বললে,—কিন্তু এসে উঠবেন কোথায়? আপনার ওখানে ওঠা এখনও বোধ হয় নিরাপদ হবে না।

শুভেন্দু বললে, আমার বোনের ওখানে উঠতে পারেন।

—সেই ভালো।—নৃপেন বললে।

—হ্যাঁ। কিন্তু আসেন যদি ওঠবার জায়গার অভাব হবে না। অন্ত কোথাও অসুবিধা থাকলে আমাদের বাড়ি তো রয়েইছে। কিছুদিন অন্ততঃ এখানে বেশ থাকতে পারবেন।—ব্রততী বললে।

সুতরাং এ সমস্যার সমাধান হোল। স্থির হোল ভুজঙ্গের ছদ্মনামে কালই ওর কাছে চিঠি এবং টেলিগ্রাফ-মণিঅর্ডার দুই-ই যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। রাস্তা নিরাপদ নয়। শুভেন্দুকে যেতে হবে। নৃপেন তার শোফারকে ডেকে শুভেন্দুকে পৌঁছে দেবার হুকুম দিলে।

যথাসময়ে শুভেন্দুকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি ফিরে এল এবং তার কিছু পরেই ট্যাক্সিতে ক'রে ফিরে এল শুভেন্দু।

ওরা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কী ব্যাপার শুভেন্দুবাবু? ফিরে এলেন যে!

শুভেন্দু নিঃশব্দে ওদের হাতে একখানা খামের চিঠি দিলে। ভুজঙ্গ এক নিশ্বাসে চিঠিখানা প'ড়ে ব্রততীর হাতে দিলে। বললে, আশ্চর্য!

নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, খারাপ খবর কিছু?

ভুজঙ্গ বললে, শ্রী পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করছে।

—কেন?

—তার মনে হয়েছে, গান্ধীজি প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মেনে চলাই সত্যাগ্রহীর কর্তব্য। আত্মসমর্পণ না করায় তার মনে অনুশোচনার আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। এবং তার দাহ এমনই প্রবল যে, আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব হোল না।

সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভুজঙ্গ তিক্ত কণ্ঠে বললে, তুমি ঠিকই বলেছ নৃপেন, রাজনীতির নামে আমরা আসলে একটা বৈষ্ণবের আখড়া গ'ড়ে তুলেছি। জিন্নার

ধাক্কায় মানুষ যদি হ'তে পারি ভালোই, নইলে আমাদের হাতে স্বাধীনতাও নিরাপদ নয়।

শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললে, ভালোই হয়েছে শুভেন্দুবাবু, আপনার কিছু টাকা বেঁচে গেল। আপনার স্ত্রীর আরও আগেই জেলে যাওয়া উচিত ছিল।

ব্রততী নিঃশব্দে শুভেন্দুর পাশে এসে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে বললে, আপনি বরং একবার বম্বে থেকে ঘুরেই আসুন না।

শুকনো হেসে শুভেন্দু বললে, কি হবে?

ভুজঙ্গের রাগ তখনও থামেনি। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, কিছু হবে না। তা ছাড়া শ্রী বাংলার রাজনৈতিক বন্দিনী। তাকে দু'চার দিনের মধ্যে এখানেই নিয়ে আসবে।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে জানতে পারা যাবে?

ভুজঙ্গ উত্তর দিলে, খবরের কাগজে বেরুবে সে খবর। তখন একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে কোন জেলে রাখলে তাকে। শুভেন্দুবাবুর খরচ ক'রে বম্বে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। খবর যদি নিতেই হয়, সেখানে আমার জানা অনেক লোক আছেন। তাঁদের চিঠি দিয়ে খবর আনা যাবে।

তার পর শুভেন্দুকে বললে, এই রাত্রে ফিরে গিয়ে আর কাজ নেই। রাস্তা তো ভালো নয়।

না, না, ফিরে আমাকে যেতেই হবে ভুজঙ্গবাবু। আমি চললাম। কাল সকালে আসব বরং।

শুভেন্দু চলে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, তাহলে চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

ব্রততী সাগ্রহে বললে, সেই ভালো ভুজঙ্গদা। আপনিও যান ওঁর সঙ্গে। শুধু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি যা-প্রাণ আপনাদের দু'জনকে দুটো ডাল-ভাত খাইয়ে দিই।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, সেটা মন্দ বলোনি। শুভেন্দুবাবুর আশ্রমটা খাওয়া-দাওয়ার পক্ষে খুব লোভনীয় স্থান নয়। কিন্তু দেরি কোরো না। তোমার শোফারটা পালালো কি না দেখ নৃপেন। গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না বোধ হয়।

—দেখছি আমি।—বলে নৃপেন গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেল।

তারপরে সেই জনহীন ভয়ঙ্কর পথ। পথে পথে বীভৎস মৃতদেহ। গ্যাস-লাইট জ্বলছে না। রাস্তার দোকানগুলো বন্ধ। সুতরাং অন্ধকার নিস্তব্ধ পথ। গাড়ির হেড্‌লাইটে মৃতদেহ বাঁচিয়ে ওদের গাড়ি কোনোমতে চলছে।

বাড়ি এসে রাস্তার মোড়েই শুভেন্দু গাড়ি ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু ভুজঙ্গ শোফারকে অপেক্ষা করতে বললে। অনিশ্চিত, অস্বাভাবিক আবহাওয়া। হঠাৎ গাড়ি ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

শোফারকে বললে, এইখানে একটু অপেক্ষা কর তুমি।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে শুভেন্দুর চাকর দরজা খুলে দিয়ে বারান্দার আলোটা জেলে দিলে। ওরা শুভেন্দুর শোবার ঘরে এসেই থমকে গেল। খাটের উপর কে একটি মেয়ে পিছন-ফিরে শুয়ে। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। আলো জ্বলছে ঘরে।

শুভেন্দু ঘরের ভিতর একটি পা বাড়িয়েছিল মাত্র। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে ভুজঙ্গের হাত ধ'রে অন্য ঘরে নিয়ে এল।

ভুজঙ্গ ভয় পেয়ে গেল। বললে, কি ব্যাপার!

বিভ্রান্ত শুভেন্দু শিথিলকণ্ঠে বললে, কে একটি মেয়ে আমার খাটে ঘুমুচ্ছে।

—মেয়ে! কে মেয়ে!

হাতের তালু উল্টে শুভেন্দু বললে, কি জানি।

—চেনেন না?

—না বোধ হয়।

শুভেন্দু তার চাকরটাকে ডাকলে, ভজু!

—কি হুজুর!

—উ কোন হ্যায়?—শুভেন্দু ইঙ্গিতে তার ঘরটা দেখালে।

চাকরটা থতমত ভাবে হিন্দিতে যা বললে, তার অর্থ হচ্ছে, সে জানে না। তার বিশ্বাস বাবু হয়তো চেনেন। মা জী ঘণ্টাভোর এসেছেন, স্নান ক'রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাবুর খাটে ঘুমিয়েছেন।

আশ্চর্য!

ভুজঙ্গ চাকরটাকে বললে, আচ্ছা ঠিক হ্যায়। তুম্ যাও।

ব'লে শুভেন্দুর কাছ থেকে একটা তালা চেয়ে নিয়ে সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললে, হয়তো দাঙ্গায় বিব্রত কোনো ভদ্রমহিলা। অল্প-চেনাও হ'তে পারেন। যাই হোক, রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তার চেয়ে এইখানে মেঝেয় কিছু পেতে আমরা শুয়ে পড়ি আসুন। কি বলেন? তার আগে শোফারটাকে যেতে বলুন।

বিস্ময়ে শুভেন্দুর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। সে শুধু নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

উনিশ

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত যে, শুভেন্দু এবং ভুজঙ্গ কেউই অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতে পারলোনা। অথচ উভয়েই এ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতেও সঙ্কোচ বোধ করে।

এর উপর ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গ ওঠে 'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লা হো আকবরের'। কোথাও হয় তো একটা সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করছে, কিংবা করতে উদ্যত হয়েছে, অথবা হয়তো কিছুই নয়,—মিথ্যা আশঙ্কায় দুর্বল, ভীরু জনতা ভয়েই ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ করছে পুলিশ এবং মিলিটারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। সেই আশঙ্কা তরঙ্গে তরঙ্গে সংক্রমিত হচ্ছে মহল্লার পর মহল্লায়,—একবার উত্তর থেকে দক্ষিণে আর একবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলীর শব্দ শীর্ণ, তীক্ষ্ণ শীস্ দিয়ে যাচ্ছে যেন কানের পাশ দিয়ে। থেকে থেকে প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটছে। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ওদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটা নিঃসাড় ভারে ভারী হয়ে ওঠে।

এমন রাত্রে ঘুম আসে না এমনিতেই।

পাড়ার ছেলেরা বোধ হয় ছাদে পাহারা দিচ্ছে। পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর তাদের বাঁশীর শব্দে সঙ্কেত ধ্বনিত হচ্ছে। বাঁশীর শব্দ থামতেই পাওয়া যাচ্ছে ভারী মিলিটারী লরীর আওয়াজ।

তথাপি ওরা গল্প করতে পারে না, শুধু ঘুমের ভান ক'রে নিঃশব্দে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। এমনি ক'রে ভোরের দিকে কখন এক সময় ওরা ঘুমিয়ে গেছে। চারিদিকে রোদ উঠলেও ভাঙে না সে ঘুম।

এক সময় শুভেন্দুর মনে হোল নি.শব্দপদসঞ্চারে দরজা ঠেলে কে যেন ওদের ঘরে ঢুকলো। চাকর নয় নিশ্চয়ই। বাবু ঘুমিয়ে থাকলে সে এমন ক'রে ঘরে ঢুকবে না। কে তবে? সেই মেয়েটি? সেই মেয়েটি কি, যে তাদের বিনা অনুমতিতে তাদের গৃহে রাত্রিযাপন করছে?

ঘুম ফিকা হয়ে এলেও শুভেন্দু ভয়ে চোখ মেলল না। যেমন চোখ বন্ধ ক'রে প'ড়ে ছিল, তেমনি রইল।

মেয়েটি যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে দোর ভেজিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। বাইরে প্রশ্ন শোনা গেল: বাবুরা কখন এলেন কাল রাত্রে?

বিস্ময় চাকরটারও কম হয়নি। সে বিড় বিড় ক'রে কি যেন উত্তর দিলে। কিন্তু তা শোনবার ধৈর্য শুভেন্দুর নেই। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দোর খুলে বাইরে এ'লা:

—এ কি তুমি!

এবং তার প্রায় পিঠ পিঠ ভুজঙ্গের কণ্ঠে: তুমি!

—হ্যাঁ আমি। অবাক হবার কি আছে?

—তুমি না পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছ?

শ্রী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, করতাম। কিন্তু তোমরা তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসো দিকি। চা হয়ে এসেছে। খেতে খেতে সে গল্প করা যাবে।

শুভেন্দু এবং ভুজঙ্গ দেখলে, শ্রীর গা-ধোয়া হয়ে গেছে। সদ্য-সাবান দেওয়া অনাবৃত বাহুযুগল যেন ঝক ঝক করছে। মুখখানি কিন্তু শীর্ণ। দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের ক্লান্তি যায়নি একেবারে।

ওরা মুখ ধুয়ে আসতেই শ্রী চা এবং খাবার দিলে। তারপর নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে অদূরে বসলো।

ভুজঙ্গ বললে, এতদিনে আপনার বাড়ির শ্রী ফিরলো শুভেন্দুবাবু।

শুভেন্দু হাসলে যার মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি। শ্রীর দিকে চেয়ে বললে, কী ব্যাপার বলতো? আমরা তো প্রতীক্ষা করছিলাম, দিন কয়েকের মধ্যে তুমি পুলিশ পাহারায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসছ।

শ্রী বললে, সেই রকমই ব্যাপার। মণিকা বাধা দিলে।

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করবার জন্যে শ্রী ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে বললে, আসলে ব্যাপারটা কি হোল জানো, তুমি চ'লে আসার পরেই কেমন যেন মনটা অসাড় হয়ে এল। বোধ করি নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যেই। কিছুই ভালো লাগে না,—এমন কি মণিকাদের সঙ্গও না। অবস্থাটা এমনই দুঃসহ হয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে যে, মনে হোল এর চেয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করাই ভালো। এবং সেজন্যে মনঃস্থির করেই ফেললাম। তোমায় লিখে দিলাম চিঠি। বাকি রইলো বাসার বিলিব্যবস্থা। তার জন্যেই দরকার হোল মণিকার। তাকে সমস্ত কথা বলতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিশ্বাসই করতে পারলে না যে, আমারা স্বামী-স্ত্রী নই।

শ্রী হাসলে। ওর কপোলে লজ্জার ছোপ লাগলো। তারপর বলতে লাগলো, শেষে যখন বিশ্বাস হোল তখন বললে, কিন্তু মিঃ মল্লিক এখানে নেই, এ অবস্থায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা ঠিক হবে না। বরং তুমি কলকাতায় চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করো। তারপরে যদি আত্মসমর্পণ করাই ঠিক কর, সেখানেও করতে পারো। ব'লে এক রকম জোর ক'রেই এখানে পাঠিয়ে দিলে।

ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বললে, ভালোই করেছ। আত্মসমর্পণ করারও বিস্তর ঝামেলা আছেঃ আমাদের বাসা খানাতল্লাস করতো, যাঁদের সঙ্গে মিশেছি তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করতো, মণিকা নিজেই সব চেয়ে বিব্রত হতেন। তা, এখন কি করবে স্থির করেছ?

শ্রী শান্ত কণ্ঠে বললে, তুমি যা হুকুম করবে।

কঠিন স্বরে ভুজঙ্গ উত্তর দিলে, সে কথা বলছ কেন? আমার হুকুমের অপেক্ষা না ক'রেই তো তুমি ধরা দিতে যাচ্ছিলে।

ভুজঙ্গের মুখের ভাব দেখে শ্রী দমে গেল। বললে, কেন যাচ্ছিলাম তাও তো বললাম। আমি সুস্থ ছিলাম না।

ভুজঙ্গ কুটিল হাস্যে বললে, শ্রী, তুমি ছেলেমানুষ নও। দু'দিনে যার মন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার রাজনীতি করা উচিত নয়। ছেড়ে দাও এ পথ।

শ্রী জবাব দিলে না। সমস্ত ঘর কেমন একটা ভারী নিস্তব্ধতায় থমথম করতে লাগলো।

নতমুখে শ্রী নিঃশব্দে ব'সে রইলো। ধীরে ধীরে ম্লান মুখে ভুজঙ্গের দিকে চাইলে। হাত জোড় ক'রে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে মাপ করো।

ভুজঙ্গ একটা কথাও বললে না। কঠোর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্রীর এমন লজ্জাহত করুণ মুখ শুভেন্দু কখনও দেখেনি। শ্রীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মন বলিষ্ঠ। উদ্ধত হয়তো সে নয়, কিন্তু শান্ত এবং স্পষ্ট। সেই সঙ্গে নিজের অধিকার এবং মর্যাদা সম্বন্ধেও সকল সময় সে সচেতন। তার চোখ মুখে এই দীনতা নিতান্তই অভূতপূর্ব। ও অবাক হয়ে চেয়ে আছে শ্রীর দিকে।

আপনার অজ্ঞাতসারেই শ্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুভেন্দুর দিকে চাইতেই যেন আরও লজ্জা পেয়ে গেল। সুদীর্ঘকাল শুভেন্দুর সঙ্গ সে পায়নি। ভুজঙ্গ এবং তার মধ্যে আর কেউ এতদিন ছিল না। আজ, এই মুহূর্তে, যখন সে ভুজঙ্গের সঙ্গে কথা কইছিল, শুভেন্দুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সে একেবারেই সচেতন ছিল না। এখন সেইটে টের পেয়েই সে যেন লজ্জা পেল আরও বেশি।

তার প্রথম প্রকাশ হ'ল হাস্যে। একরকমের অকারণ অর্থহীন, আশ্চর্য হাসি। যেন ফুঁ দিয়ে কাছাকাছি একটুখানি জায়গায় ময়লা সরিয়ে দিলে।

বললে, চা খাবে আর একটু?

শুভেন্দু সংক্ষেপে বললে, না।

—খাও না। আমারও ইচ্ছা করছে।—আলস্য ভেঙে উঠতে উঠতে শ্রী অপাঙ্গে চেয়ে আবার তেমনি অর্থহীন হাসলে।

চা সে তৈরি করবেই। সুতরাং শুভেন্দু নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরে শ্রী দু'হাতে দুবাটি চা নিয়ে ফিরে এলো, শুভেন্দু তখনও নীরব। অনেক দিন পরে দেখা। শ্রী ধীরে ধীরে নানা কুশলপ্রশ্নে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই শুভেন্দুই একটু আগে শ্রীর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র ঘুম ভেঙে ধড়মড় ক'রে উঠে সাগ্রহে ছুটে বাইরে গিয়েছিল। অকস্মাৎ কী যে তার হোল, মন কেন যে এমন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল যে, বহুদিন পরে ফিরে-আসা শ্রীর উষ্ণ আলাপনেও তা গল্‌ছে না!

শ্রী বিস্মিত হোল, বিরক্তও হোল।

জিজ্ঞাসা করলে, অমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন? কী হয়েছে?

—কিছুই হয়নি।

—তবে?

একটু ভেবে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, ভুজঙ্গবাবু রেগে চ'লে গেলেন?

—যেতে পারেন। তাতে তোমার বিরক্তির কি আছে?

—কিছুই নেই।

—তবে?

শুভেন্দু উত্তর দিলে না।

শ্রী গম্ভীর ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলো: তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি না। পরিষ্কার ক'রে বললে হয়তো বুঝতে পারতাম। কিন্তু যাক সে কথা। তোমাকে পরিষ্কার ক'রে একটা কথা জানানো দরকার। জানিয়েছি অনেক বার। তবু আর একবার জানাচ্ছি। আমি শুধুই তোমার স্ত্রী নই, আর একটা রাজনৈতিক সত্বাও আমার আছে। যেখানে তুমি এবং আমি, সেখানে আমাদের কাছে আর কেউ নেই। কিন্তু সেইটেই আমার সমস্ত পৃথিবী নয়। তার বাইরে আরও যে স্থান আছে, সেখানে আমি ভুজঙ্গবাবু এবং

বাধা দিয়ে শুভেন্দু বললে, এবারে দেখলাম ভুজঙ্গবাবুকে তুমি 'তুমি' বল,—'আপনি' নয়।

হঠাৎ এক ঝলক রক্ত শ্রীর মুখে যেন আবির মাখিয়ে দিলে। কয়েক মুহূর্ত সে যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললে। তারপর বললে, বুঝতেই পারছ, যে ভাবে ছিলাম বম্বেতে, তাতে ওছাড়া উপায় ছিল না।

—ঠিক কথা।

শুভেন্দু বললে, ভুজঙ্গবাবুর তোমার ওপর প্রভাব দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি।

শ্রী মাথা নিচু ক'রে কি যেন একটু ভাবলে। তারপর মুখ তুলে হেসে, চোখে একটা বিলোপ কটাক্ষ টেনে বললে, তুমি 'জেলাস' হচ্ছ না কি?

শুভেন্দুও হেসে জবাব দিলে, একটু। বেশ লাগছে।

শ্রী বললে, রক্ষে কর! রামের কাছে সীতাকে যেমন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, আমাকেও তেমনি কিছু করতে হবে না কি?

শুভেন্দু লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রীর হাতদুটো চেপে ধরলে। বললে, ছিঃ ছিঃ! আমাকে অত নিচু তুমি ভেব না।

ব'লে শ্রীর অবনত মুখখানি নিজের দিকে তুলে ধরতেই শ্রী অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো শুভেন্দুর উপর এবং তার বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কেন, কে জানে?

মনে হোল, রাজপথে যত আবিলতা জমেছিল, একটা প্রবল বর্ষণে তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কেন কাঁদে শ্রী, শুভেন্দু জানে না। কিন্তু তারও চোখ শুষ্ক নয়।

এমন সময় সিঁড়িতে পরিচিত পদধ্বনি বেজে উঠলো।

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ভুজঙ্গ চীৎকার ক'রে বললে, নৃপেনকে একটা টেলিফোন করতে গিয়েছিলাম। সে যথারীতি বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ব্রততী আসছে।

ঘরে ঢুকেই ভুজঙ্গ দেখলে শ্রীর মুখ ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মতো থমথম করছে। বুঝলে, একটু আগেই এক পশলা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেন দেখেও দেখলে

না। ঠোঁটের কোণে হয়তো একটু হাসি ঝিলিক মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে কিছুই নয়।

অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে শ্রীকে বললে, ব্রততীকে তুমি বোধ হয় দেখনি কখন। এখুনি আসছে সে।

মুহূর্তে শ্রী উঠে দাঁড়ালো, যেন কিছুই হয়নি,—যেন একটু আগেকার কান্নাটা নিতান্তই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। ভুজঙ্গ দেখে খুশি হোল হয়তো যে, বিপ্লবী রাজনীতিতে চিত্তজয়ের যে শিক্ষা, শ্রীর জীবনে তা ব্যর্থ হয়নি।

উৎসাহের সঙ্গে শ্রী বললে, এখুনি আসছেন?

—হ্যাঁ, টেলিফোন করেছিলাম।

মেঝের উপর রাত্রের পরিত্যক্ত শয্যা তখনও রয়েছে। শ্রী তাড়াতাড়ি চাকরটাকে দিয়ে সেগুলো যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে যে সামান্য আসবাব পত্র ছিল, সেগুলো নিজেই একরকম গোছ-গাছ ক'রে ফেললে। এবং তিনজনে নিশ্চিন্তে ব'সে ব্রততীর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু প্রতীক্ষা যে বেশিক্ষণ করতে হবে না, ভুজঙ্গ এবং শুভেন্দু উভয়েই তা জানতো। শ্রী এসেছে, এ খবর শোনার পর ব্রততী এক মিনিটেও অপেক্ষা করবে না। রূপসজ্জার বালাই তার নেই। হাতে কাজ যদি কিছু থাকেও সমস্ত ফেলে রেখে সে মোটরে বেরিয়ে পড়বে।

হোলও তাই। ব্রততী অল্প পরেই এসে উপস্থিত হোল এবং শ্রীর দু'খানি হাত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধ'রে কী যে বলবে ভেবে পেল না।

শ্রী বললে, আপনার কথা এত শুনেছি! আপনাকে দেখবার জন্যে কী যে আগ্রহ ছিল!

আনন্দে ব্রততী যেন এলিয়ে পড়লো। গদগদ কণ্ঠে বললে, ছাই শুনেছেন আমার কথা। আপনাদের পায়ের তলায় বসবার যোগ্যতা নেই আমার।

সবিনয় মধুমিষ্ট ভদ্রতার কথা শ্রীর ঠিক আসে না। উত্তরে জুৎসই কি বলা যায় ভেবে ঠিক করবার আগেই ব্রততী বললে, আপনি পুলিশের কাছে ধরা দিচ্ছেন শুনে আমাদের কী যে ভাবনা হয়েছিল, বলবার নয়। বুদ্ধি ক'রে শেষ পর্যন্ত ধরা যে দেননি ভালোই করেছেন।

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, নৃপেনবাবু এলেন না ?

—তিনি ?—ব্রততী খিল খিল করে হেসে উঠলো,—এখন তাঁর মাথায় চেপেছে কাগজের বাতিক। সম্ভবতঃ আজই প্রেস কেনা হয়ে যাবে। আজকে খাওয়া দাওয়া কোথায় হবে,—হবেই কি না,—কেউ জানে না। এই রকম চলবে প্রথম সংখ্যা কাগজ না বেরুনো পর্যন্ত। খাওয়া-দাওয়া, দিন-রাত্তির কিছুরই হুঁস থাকবে না এই ক'দিন।

শ্রী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কাগজ বের করছেন নাকি ? কী কাগজ ?

ব্রততী বললে, শোনেন নি এখনও ? দৈনিক কাগজ, আট পৃষ্ঠার, না ভুজঙ্গদা ?

ভুজঙ্গ বললে, হ্যাঁ। প্রথম শ্রেণীর কাগজ।

শ্রী ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমিও আছ নাকি তার মধ্যে ?

ব্রততী হেসে বললে, বাঃ ! তাও জানেন না ? কাল রাত্তির থেকে এখন পর্যন্ত কি গল্প করলেন তাহলে ? উনিই তো সম্পাদক !

শুভেন্দু বললে, এখানে কাগজের শ্রেণীবিভাগ পৃষ্ঠা হিসাবে হয়, না ভুজঙ্গবাবু ?

ভুজঙ্গ সহাস্যে জবাব দিলে, হ্যাঁ। অনেক পৃষ্ঠা থাকবে, তাতে ছোট-ছোট ঘেঁসাঘেসি করে অপাঠ্য-কুপাঠ্য-দুষ্পাঠ্য বহু রচনা থাকবে, সামান্য খবরকে লোমহর্ষণ করবার জন্যে বড় বড় দুকলাম-তিনকলাম শিরোনামা থাকবে আর থাকবে অর্থহীন সম্পাদকীয় অগ্ন্যুদ্গার। এর নাম প্রথম শ্রেণীর কাগজ। তাতে মেয়েদের জন্যে রন্ধন প্রণালী থাকবে যা অনুসরণ করে রান্না করা যায় না। শিশুদের জন্য এমন সব জিনিস থাকবে যা গল্পও নয়, সত্যিও নয় বুঝলেন ?

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, ভুজঙ্গবাবু সম্পাদক হবেন কি ক'রে ? ওঁর নামে তো ওয়ারেণ্ট রয়েছে।

ব্রততী গর্বিত হাস্যে জানালো, সে ব্যবস্থা উনি করবেন।

কারও বুঝতে কষ্ট হোল না, 'উনি' মানে নৃপেন। আর গর্বিত হাস্য থেকে বোঝা গেল, গবর্নমেণ্টের দরবারে নৃপেনের অপ্রতিহত প্রভাব। যার নামে

ওয়ারেণ্ট আছে তাকে সে ছাড়িয়ে দিতে পারে, আর যার নামে ওয়ারেণ্ট নেই তাকে হয়তো ধরিয়েও দিতে পারে।

শ্রী একটু বিস্মিতই হোল। সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলে, কী করেন নৃপেনবাবু?

—ব্যবসা।—ব্রততী জবাব দিলে এবং এবারে স্বরটা একটু যেন আড়ষ্টই বোধ হোল।

ব্যবসা! তা থেকেই গবর্ণমেণ্টের কাছে এমন অপ্রতিহত প্রভাব! শ্রী যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার অবস্থা দেখে ভুজঙ্গ এবং শুভেন্দু দুজনেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। সামরিক ঠিকদারী ব্যাপারটায় নৃপেন নিজে কিছুমাত্র লজ্জা অথবা সঙ্কোচ বোধ করে না। কিন্তু ব্রততীর কুণ্ঠা কাটেনি এখনও। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীব জেরায় ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে সে হয়তো লজ্জা বোধ করবে।

সেই সঙ্কট থেকে তাকে পরিত্রাণের জন্যে ভুজঙ্গ তাড়াতাড়ি বললে, কবে পর্যন্ত অফিস বসবে ব'লে মনে কর?

ব্রততী জবাব দিলে, ওঁর সম্বন্ধে মনে করার কোনো সূত্র নেই। হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেস ব'সে যাবে। আমি ঠিক জানি না, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, অন্য লোকের যে কাজ সাত দিন লাগে, ওঁর তা একদিনের বেশি লাগে না।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, দৈত্যবিশেষ!

ব্রততীও হেসে বললে, তা বলতে পারেন। কাজে পাগল। কাজ পেলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

কথাটা যে সত্য, নৃপেনের কাজ করবার শক্তি এবং আগ্রহ দেখে ভুজঙ্গ এবং শুভেন্দু কারও সে নিয়ে সন্দেহ নেই। শ্রী নৃপেনকে চোখে দেখেনি কখনও। সে নিঃশব্দে কল্পনা করতে লাগলো, নৃপেনবাবু লোকটি কি রকম হ'তে পারে: প্রকাণ্ড লম্বা, প্রচুর মোটা, বাঘের মতো প্রকাণ্ড থাবা…

কিন্তু এই দাঙ্গা।

ভুজঙ্গ কথাটা বলামাত্র সকলেই চিন্তিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, এই দাঙ্গা।

তা ছাড়া এবিষয়ে কারও বলবার কিছু ছিল না। মানুষের সৃষ্টি এই দাঙ্গা দেখতে দেখতে আর মানুষের হাতে রইলো না, বোধ করি ভগবানের হাতেও না। শয়তান নিজে এসে এর ভার নিয়েছে। কারও হাতে এর প্রতিকারের কোনো পন্থা নেই। সবাই বলছে: তাইতো, হ্যাঁ এই দাঙ্গা। আর তারপর অসহায় ভাবে একটা ঢোঁক গিলছে!

ভুজঙ্গ বললে, এর মধ্যে কাগজ বেরুবে কি করে?

নৃপেন বললে, যেমন ক'রে সব কাগজ বেরুচ্ছে তেমনি ক'রে।

— তাদের অনেক দিনের কাগজ, একটা ছক বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তবু অনেক অসুবিধার মধ্যেই বার করছে। আমরা নতুন কাগজ বার করতে যাচ্ছি।

—সুতরাং আমাদের আরও অসুবিধার মধ্যে বার করতে হবে। এই পর্যন্ত আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত ভুজঙ্গ। কিন্তু দাঙ্গার মধ্যে কাগজ বার করা সম্ভব হবে না, এ আমি মানব না। দাঙ্গা কবে থামবে ব'লে আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। নির্দিষ্ট দিনে কাগজ বার করতেই হবে।

ভুজঙ্গ বুঝলে, কোনো বাধাই এ মানবে না। এর প্রকৃতিই তা নয়। সুতরাং চুপ ক'রে রইলো।

নৃপেন বলতে লাগলো, আমি কি ব্যবস্থা করেছি শোন: আমাদের অফিসের লোকজন অফিসেই থাকবে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ আমার। তোমাকেও ওখানেই থাকতে হবে।

ভুজঙ্গ সভয়ে বললে, সে যে অনেক খরচ নৃপেন।

নৃপেন হাসলে। বললে, খরচের জন্যে ভয় পেওনা। চেষ্টা করো তার চেয়ে বেশি যাতে আয় করতে পার। ভুজঙ্গ, এর জন্যে কত আর বেশি খরচ হবে ব'লে মনে কর? দু'হাজার, তিনহাজার, চারহাজার? কাগজ যদি নির্দিষ্ট দিনে সুন্দর ক'রে বের করতে পারি, ও টাকাটা কিছুই নয়। ওর চেয়ে

অনেক, অনেক বেশি টাকা,—তুমি সামনে থাকলে ভাবতে জলে ফেলে দিচ্ছি,—এমন বহুবার চোখ বুজে খরচ করেছি। ঠকিনি। ব্যবসাতে আসল বস্তু কি জানো? Luck,—অদৃষ্ট। যার অদৃষ্ট ভালো সে ধুলোমুঠো ধরলে কড়িমুঠো হয়, যার খারাপ সে কড়িমুঠো ধরলে ধুলোমুঠো হয়। তুমি কিছু ভয় পেও না। আমার অদৃষ্ট এখন জোর চলেছে। তুমি আমার অদৃষ্টের ওপর আস্থা রেখে চুটিয়ে কাজ চালিয়ে যাও। তোমার কাছ থেকে আমি চাইব, নির্দিষ্ট দিনে চমৎকার একখানি কাগজ: 'ছবিতে, ছাপায়, সংবাদ-পরিবেশনে অনবদ্য'! ব্যস্।

ভুজঙ্গ বললে, দেখা যাক। এখন তোমার অদৃষ্ট আর আমার হাতযশ!

—ঠিক আছে। আর, ভালো কথা, একটি ভালো ম্যানেজার জানা আছে তোমার?

আছে। কদিন আগে পথে নরেশের সঙ্গে ভুজঙ্গের দেখা হয়। নরেশ ওদেরই কাগজের ম্যানেজার ছিল। মোটা টাকা মাইনে পেতো, তার সঙ্গে গাড়ি-টেলিফোন, সে এক এলাহী কাণ্ড! এখন হেঁটেই চলেছে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। বললে, মালিকের অসাধুতার সঙ্গে তাল রাখতে পারলে না। বাধ্য হয়েই শেষে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটি কর্মদক্ষ এবং, ভুজঙ্গ যতদূর জানে, অসাধু নয়। তারই কথা মনে পড়লো।

বললে, আছে একটি লোক নৃপেন। লোকটি ভালো, অন্ততঃ অসাধু নয় ব'লেই জানি।

নৃপেনের মুখ গম্ভীর হোল। বললে, খুব সাধুলোক ম্যানেজার হিসেবে আমার দরকার নেই ভুজঙ্গ। বরং কোনো ঘোড়েল লোক জানো কি না বল। নানারকম ফন্দি-ফিকির জানা আছে, দরকারমতো দু'চারটে মিথ্যে কথা বলতে পারে, এমন কি টাকা-পয়সা সম্পর্কে কোনো কুসংস্কার না থাকলেও চলবে।

—বলো কি হে! সে যে তোমাকেই আগে ডোবাবে।

—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি করবে না। জানি। কিন্তু এরা আমার দলের লোক। জানি কি না, এরা ডোবাবার পরও যতখানি ভাসিয়ে রাখে,

সেও সাধু লোকের চেয়ে বেশি। যাই হোক ভুজঙ্গ, তোমার সাধু লোকটিকে একদিন নিয়ে এস বরং। আমি দেখলেই বুঝতে পারব, আমার চলবে কি না।

ব্রততী বললে, আচ্ছা আমি না হয় মুখ্যু মানুষ। কিন্তু শ্রীদি'কে কি তোমার কাগজে কোনো কাজে লাগাতে পারো না?

শ্রী সেখানেই ছিল। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল। বললে, আঃ! ব্রততী, কী বাজে বকছ, আমি চাকরী করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—আহা! চাকরী কেন? মাইনে ছাড়া কি কাজ করা যায় না?

নৃপেন হেসে বললে, না, তা হয় না ব্রততী। স্বেচ্ছাসেবকের উপর আমার আস্থা নেই। তাঁরা লোক প্রায়ই ভালো হন, কিন্তু তাঁদের উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় না। আমি যাঁদের রাখব, তাঁদের মাইনে দিয়ে রাখব এবং সম্ভবত ভালো মাইনে দিয়েই। তোমার শ্রীদি যদি দয়া ক'রে আসেন আমাদের কাগজে, তাঁকে মাইনে নিতে হবে। এবং ভুজঙ্গ যদি উচিত বিবেচনা করে, ওঁকে মহিলা-বিভাগের ভার দিতে পারে।

ভুজঙ্গ বললে, আমি যদি উচিত বিবেচনা করি? কেন, তোমার নিজের কোনো অভিমত নেই?

—আমার অভিমত অনাবশ্যক। ভুজঙ্গ, তুমি কাগজের সম্পাদক, সুতরাং তোমার বিভাগে লোক রাখা-না-রাখার অধিকার তোমারই। তাতে কোনো দিন আমি হস্তক্ষেপ করতে যাব না। কেন জান? আমি চাই একখানি ভালো কাগজ। সে দায়িত্ব তোমার। তোমার কাঁধের উপর আমার লোক চাপিয়ে তোমার দায়িত্ব হালকা ক'রে দোব, এত বোকা আমি নই।

নৃপেন হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে লাগলো।

তৃতীয় খণ্ড

বাইশ

চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর উপর প্রকাণ্ড একটা বাড়ি নিয়ে দৈনিক 'কৃশানু' বার হোল। এই অল্প কয়েকদিনের ভিতর নৃপেন যে কোথা থেকে নিয়ে এলো অত বড় প্রেস,—সেই প্রেস বসানো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয়োজন এত দ্রুত সম্পূর্ণ করলে, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। বাড়িও চমৎকার, ভাড়াও তেমনি। তারই চারতলার একটা 'ফ্ল্যাটে' ভুজঙ্গের এবং ম্যানেজার নরেশের থাকবার ব্যবস্থা। কর্মকর্তা সর্বক্ষণ নিজে থেকে নিজের চোখে সমস্ত জিনিস না দেখলে কোনো বড় জিনিস গ'ড়ে তোলা যায় না, এটা নৃপেনের দৃঢ় বিশ্বাস। সৌভাগ্যের বিষয়, ভুজঙ্গ এবং নরেশ উভয়েই অবিবাহিত। সুতরাং এই ব্যবস্থায় তাদের অসুবিধা তো হোলই না, বরং সুবিধাই হোল। দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় ভুজঙ্গ তেতলার এবং নরেশ দোতলার অফিস-ঘরে থাকে। অবসর সময়ে চারতলার ঘরে এলেও সেখানে ফোনের সংযোগ আছে। কর্মীরা যে-কোনো সময়ে যে-কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ নৃপেন আসে। তার আসার সময়ও নেই, অসময়ও নেই। সে যে তত্ত্বাবধানের জন্যে আসে, তাও বোঝবার উপায় নেই। হয়তো একটা টিফিনক্যারিয়ারে ক'রে খানিকটা ফাউল-রোষ্ট নিয়ে এল, কিংবা সন্দেশ। রাত বারোটার সময় হৈ হৈ ক'রে ওদের উঠিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে চ'লে গেল। নয়তো স্রেফ খানিকটা মাতলামি ক'রেই চলে গেল।

ভুজঙ্গ মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। নৃপেনকে ধমক দেয়, ব্রততীকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে ব'লে শাসায়। কিন্তু নরেশ চতুর লোক। সে বোঝে, এর সবটাই বন্ধুকৃত্য অথবা মাতলামি নয়। সমস্ত কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে নৃপেন ওদের অগোচরেই কাজের কথাগুলি জেনে নেয়। নিরিবিলি আলোচনায় নরেশ দেখেছে, নৃপেন এ অফিসের মোটামুটি ব্যাপার সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিব-হাল। মাঝে মাঝে নরেশের এমনও সন্দেহ হয়, অফিসে নৃপেনের গোয়েন্দা

কেউ আছে। কিন্তু কে যে সেই গোয়েন্দা তা সে ঠাহর করতে পারে না। সন্দেহ কয়েকজনকে করে, কিন্তু প্রমাণ কিছু পায় না।

তবে সে সতর্কতার সঙ্গে লেগে আছে এবং ভরসা করে যে, গোয়েন্দা যদি সত্যই কেউ থাকে, তাকে আবিষ্কার করতে তার দেরি হবে না। কিন্তু ভুজঙ্গকে সে চেনে। ভুজঙ্গ সাধাসিধে পরিষ্কার লোক, কিন্তু বদ্‌রাগী। সুতরাং এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলে না, পাছে সে রেগে গিয়ে নৃপেনকে এই নিয়ে ধমকা-ধমকি করে।

শ্রী মেয়েদের বিভাগের ভার নিয়েছে। চাকরী করার ইচ্ছা তার ছিল না,—শুভেন্দুরও না। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার থেকে দূরে থাকাও তার পক্ষে কঠিন। আবার বিনাবেতনে কাজ করানো নৃপেনের নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং তাকে বেতন নিতে বাজি হোতে হয়েছে এবং সেটা মোটাই বলা চলে।

কিন্তু তারও চেয়ে অনেক মোটা বেতন ভুজঙ্গের,—হাজার টাকা। এই টাকাটা নিয়ে সে রীতিমত বিপদে পড়েছে। বেচারার ছিল 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'। সে জায়গায় একা প্রাণী হাজার টাকা মাসে-মাসে কী ক'রে খরচ করবে, সে এক দুশ্চিন্তার বিষয়। টাকা জমানো তার ধাতে নেই। অথচ খরচ করারই বা উপায় কোথায়?

নৃপেন একদিন এসে তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে ডজনখানেক মিহি খদ্দরের সার্ট, হাফ সার্ট, পাঞ্জাবী, হাওয়াই সার্ট করিয়ে দিয়েছে। কিনতে বাধ্য করেছে ডজন দুয়েক মিহি খদ্দরের ধুতি, কয়েক জোড়া দামী 'নিউ-কাট', স্লিপার, দামী ফাউণ্টেন পেন, রিষ্ট-ওয়াচ। ঘরের জন্যে কিছু মূল্যবান্ আসবাবপত্র। বাধ্য ক'রেছে একটা বাবুর্চি রাখতে, যে প্রত্যহ বাযবহুল মুখরোচক রান্না রাঁধে,—একটা চাকর, যে প্রত্যহ কাপড়-জামা কেচে, ইস্ত্রি ক'রে কুঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু তথাপি অনেক টাকা থেকে যায়। ভুজঙ্গের মুস্কিলের আর শেষ নেই।

সেদিন অফিসের কাজের শেষে রাত্রি ন'টার সময় শ্রী ওর চারতলার ঘরে এলো।

চারিদিক দেখে মুচকি হেসে বললে, তোমার অবস্থা দেখে আমার রীতিমত হিংসে হচ্ছে ভুজঙ্গদা।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, নেবে এসব? নাও না। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' আমি পারছি না, হাঁফিয়ে উঠেছি এই ক'মাসেই।

—তাই নাকি? সে রকম তো বোধ হচ্ছে না।

—কি রকম বোধ হচ্ছে?

—বোধ হচ্ছে, তুমি এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে যেন সাধনা আরম্ভ করেছ।

—ভুল, শ্রী, ভুল। আমার মন হাহাকার করছে সেই পুরোনো ভিক্ষু-জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু সে-কথা বোঝাই কাকে!

শ্রী হেসে বললে, বোঝাতে হবে না। ও হাহাকার শীগগিরই বন্ধ হয়ে যাবে।

সভয়ে সোফার উপর সোজা হয়ে ব'সে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে জানলে?

শ্রী হেসে বললে, জানলাম নিজেকে দিয়েই। তোমার ঐশ্বর্য দেখি, আর ভাবি, রুজ-লিপষ্টিক আমিও ধরব না কি?

—সর্বনাশ কাণ্ড! তুমি বলো কি শ্রী!

—ঠিকই বলছি। মনের কথাই বলছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে ভুজঙ্গ বললে, আমার মনে কিন্তু এই বিলাসের কোনো ছোপ লাগেনি, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি।

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে শ্রী জোরের সঙ্গে বললে, না, পারো না। কিন্তু এর জন্যে লজ্জা পাচ্ছ কেন ভুজঙ্গদা? চিরটা জীবন দুঃখ-দুর্ভোগ-দারিদ্র্যের সঙ্গে মিতালি ক'রে কাটালাম। আজ, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে, যদি একটু স্বাভাবিক জীবন যাপন করি, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে?

—আছে শ্রী।

—থাকে থাক। কিন্তু শোনো: 'মহিলা-বিভাগ' এতদিন তো নারীর সমানাধিকার আর রান্নার টুকি-টাকি দিয়ে চালাচ্ছি। নৃপেনবাবু বলছেন,

কেশ-বেশ এবং যৌনতত্ত্বের ছিটেফোঁটাও তার সঙ্গে চালাতে। তুমি কি বলো ?

বিরক্তভাবে ভুজঙ্গ বললে, আমি কিছুই বলি না। তোমরা যা-জানো কর।

—সে কি হয় ? তোমার মতামত ছাড়া তো কিছুই হোতে পারে না।

ভুজঙ্গ বেশ রেগে গেল। বললে, দেখ শ্রী, বাজে কথা বোলো না। আমার মতামতের উপর নির্ভর করলে, এই 'মহিলা-বিভাগ'টাই হোত না। অথচ হোল। এর পরে নৃপেন যখন ধরেছে তখন মৃদু যৌনতত্ত্বও বাদ যাবে না।

এমন সময় নৃপেনের গলা পাওয়া গেল :

—কি ব্যাপার ! কিসের কন্‌ফারেন্স ! খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন।

ভুজঙ্গ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি নাকি 'মহিলা-বিভাগের' সঙ্গে যৌনতত্ত্বও কিছু কিছু পরিবেশন করতে বলছ ?

নৃপেন তখনই-তখনই তার উত্তর দিলে না। চাকরটাকে তিনটে প্লেট আনতে ব'লে কাগজের প্যাকেট থেকে কতকগুলো কাটলেট বের ক'রে সেগুলো প্লেটে সাজিয়ে দুখানা প্লেট ওদের দিকে এগিয়ে দিলে।

তারপরে নিজে একটা কাটলেটে কামড় দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তোমার কি আপত্তি আছে ?

—আছেই তো। যৌনতত্ত্ব !

– তাহ'লে যাবে না। তোমার আপত্তিতে তোমার কাগজে একটা লাইনও যেতে পারে না।

ব'লে ওদের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে হো হো ক'রে হাসতে হাসতে বললে, তাহ'লে জিগ্যেস করবে আমি এ প্রস্তাব করলাম কেন ? করলাম, কারণ পাঠক তো এক রকমের নয়, এক রুচিরও নয়। আমার মনে হোল, সব পাঠকের খোরাক কিছু কিছু আমরা দোব। আজ আমরা তাদের হাতে। আজ আমাদের পাঠক-সংখ্যা বাড়াতেই হবে। তারপরে কাগজ যখন বেশ চালু হয়ে যাবে, যখন পাঠকরা আমাদের হাতে আসবে, আমরা যা পরিবেশন করব ভালো

ছেলের মতো নির্বিবাদে তাই গ্রহণ করবে, তখন আমরা স্থির করব কাগজে কি যাবে আর কি যাবে না। আমার যুক্তিটা বুঝলেন শ্রীদেবী?

শ্রী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝলে।

নৃপেন হাত নেড়ে বলতে লাগলো: ভুজঙ্গকে যখন সম্পাদক করেছি তখন কাউকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না যে, একখানি উচ্চ শ্রেণীর দৈনিকপত্র করাই আমার ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে কাগজটাকে বাঁচতে হবে তো? তার পাঠক-সংখ্যা বাড়াতে হবে তো?

ভুজঙ্গ বললে, এটা তোমার ব্যবসায়-বুদ্ধির কথা।

কথাটা লুফে নিয়ে নৃপেন বললে, তাই তো। কিন্তু তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার রাজনীতিজ্ঞান, তোমার রুচির কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি,—আর আমার ব্যবসায়-বুদ্ধিকে তুমি একটু মুখের শ্রদ্ধাও জানাবে না?

ব'লেই ও নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

ভুজঙ্গের রাগ জল হয়ে গেছে ততক্ষণে। বললে, তাহ'লে যা জান তাই কর তোমরা দু'জনে।

নৃপেন বললে, সেকথা যদি বল ভুজঙ্গ, তাহ'লে আমি নিশ্চয় জানি আমার জিৎ হবে। শ্রীদেবী আমাকে সমর্থন করবেন। কারণ আমি জানি, তোমাদের মতো অবিবাহিতেরা মেয়েদের যে পরিচয় জানে সেইটেই তাঁদের সত্যিকার পরিচয় নয়। ওঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের চেয়েও চোখা। বলুন ঠিক কি না।

ব'লে শ্রীর দিকে চেয়ে আবার একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

কাটলেটগুলো ততক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীর দিকে চেয়ে নৃপেন বললে, এগারোটা বাজে। আপনি কি বসবেন আর একটু?

ব্যস্তভাবে শ্রী বললে, না, না। আমাকেও উঠতে হবে।

—তাহ'লে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই। ভুজঙ্গর অফিসের গাড়ির যেটুকু তেল বাঁচে! কি বলেন?

ব'লে হাসতে হাসতে শ্রীকে নিয়ে চ'লে গেল।

গাড়ীতে উঠে শ্রী নৃপেনের দিকে চেয়ে হেসে বললে, আপনারই জিৎ হোল।

নৃপেন বোধ করি একটু অন্যমনস্ক ছিল। চমকে বললে, কিসে?

—'মহিলা বিভাগ' নিয়ে।

নৃপেন কিন্তু খুব উৎসাহিত হোল না। বললে, তা ঠিক বলা যায় না শ্রী দেবী। বিষয়টা ভুজঙ্গের আদর্শবাদের ব্যাপার হোলে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। আদর্শবাদ অধিকাংশ স্থলেই সাফল্যের অন্তরায়। কিন্তু যদি ওর অভিজ্ঞতার কথা হয়, তাহ'লে ভেবে দেখতে হবে।

শ্রী মুচকি হেসে বললে, অভিজ্ঞতার কথা নয়।

—নয়? ঠিক জানেন? এমন তো হোতে পারে যে, সত্যি যৌনতত্ত্বের পাঠক বেশি নয়।

—তাহলে আজকে যে-সব কাগজ খুব জোর চলেছে, তার অনেকগুলিই কবে বন্ধ হয়ে যেত।

—আপনি তাই মনে করেন?

—করি।

—তাহ'লে ঠিক আছে।

একটুক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো।

তারপর শ্রী বললে, আশ্চর্য মানুষ এই ভুজঙ্গদা। একেবারে খাঁটি সোনা।

—ঠিক বলেছেন। সেইটেতেই আমার মুস্কিল হয়েছে।

—মুস্কিল কিসের?

—দেখুন খাঁটি সোনাটা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড-মাত্র। বাস্তবজগতে কোনো কাজেই লাগে না। সোনাকে কাজে লাগাতে গেলে কিছু খাদ মেশাতে হয়। ভুজঙ্গকে নিয়ে সেই দুরূহ পরীক্ষাই আমি করছি।

শ্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে একবার চেয়েই নৃপেন বললে, ওকে নিজের স্ত্রী ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

শ্রী হাসলে। বললে, আপনার কথার প্রথমাংশ বুঝলাম। কিন্তু দ্বিতীয়াংশ একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

নৃপেন ব্যাখ্যা ক'রে বললে, আদর্শবাদ ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার, ধর্মের মতো। আমার আদর্শবাদ নিয়ে আমি একাই চলতে পারি,—সঙ্গী পাওয়া গেলে ভালো, না গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যবসা একা করা যায় না। তাতে অন্য পক্ষের কথাই বড় ক'রে ভাবতে হবে।

শ্রী বললে, অর্থাৎ আপনি যে মাল তৈরি করলেন তা সাধারণের পছন্দমত হোল কিনা সেটাও বিবেচনা করতে হয়, কেমন ?

—ঠিক! অর্থাৎ আমার আদর্শ, আমার রুচিই লোকের ঘাড়ে জোর ক'রে চাপাব না,—তাদের রুচি, তাদের পছন্দের কথাও খানিকটা মেনে নোব।

—কিন্তু সাধারণের রুচির উন্নতিবিধানও যে খবরের কাগজের কর্তব্য সেটা স্বীকার করেন না ?

—সেটা পরে। আমি বলি, আগে সাধারণের রুচির সঙ্গে এক হয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করব। তারপরে আমার রুচি, আমার পছন্দ এমন কৌশলে তাদের উপর চাপাব যে, তারা টেরই পাবে না। তখন আমার রুচিকেই নিজেদের রুচি ব'লে তারা অম্লানবদনে গ্রহণ ক'রে নেবে।

নৃপেন খুব আত্মতৃপ্ত ভাবে হাসতে লাগলো।

শ্রী বললে, ভুজঙ্গদার মতো লোকের মন্ত্রিসভায় যাওয়া উচিত ছিল।

নৃপেন বললে, না।

—কেন ?

—তাতে আমাদের অসুবিধা হোত। আমরা টেঁকতে দিতাম না ওকে।

নৃপেন হাসলে।

সেই কুটিল হাসি শ্রীর ভালো লাগলো না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে ?

—তার মানে দু'দিন পরেই বুঝতে পারবেন। ওই আপনার বাড়ি এসে গেছে। নামবার আগে একটা কথা জিগ্যেস করব ?

—কি বলুন।

—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

—কিসে ?

—ভুজঙ্গের খাঁটি সোনায় খাদ মেশাবার কাজে?

শ্রী একটু দ্বিধা করলে। বললে, সে-কাজে আপনাকে বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে নৃপেনবাবু। আমার সাহায্যের আবশ্যক হবে না। আপনি একাই পারবেন।

নৃপেন হেসে বললে, সে বিশ্বাস আমারও আছে। তবু যদি আবশ্যক হয় তাই জিগ্যেস করছিলাম।

শ্রীও হেসে উত্তর দিলে, আবশ্যক হোলে দেখা যাবে। এখনিই সে-প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। আচ্ছা, চললাম।

ব'লে মোটর থেকে নেমে চ'লে গেল। গম্ভীর ভাবেই চ'লে গেল। কথাটা বোধ করি তার খুব ভালো লাগলো না। তার কেমন সন্দেহ হোল, নৃপেনের খাদ মেশানোর কাজ হয়তো আরম্ভ হয়ে গেছে এবং নৃপেনের মতো করিৎকর্মা লোক এ রকম ব্যাপারে শ্রীর সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করে না। কিন্তু কি ভাবে কাজ আরম্ভ হোল? কি ভাবে?

-ক।

শুভেন্দুর ফ্ল্যাটে বাইরের আলোটা জ্বলছে। ঘরে অর্ধেক অন্ধকারে খাটের শিয়রে বালিশটা উঁচু ক'রে দিয়ে শুভেন্দু অর্ধশায়িত। চোখ বন্ধ।

শ্রী ঘরে ঢুকতেই শুভেন্দু চোখ মেলে চাইলে।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

—না।

—তবে অমন নির্জীবের মতো শুয়ে যে! শরীর ভালো তো?

—ভালোই। ক'টা বাজে?

—রাত্তির হয়েছে। তুমি খেয়ে নিলেই পারতে। আমি এখনই বাথরুম থেকে আসছি। ওরে ওই, কি নাম তোর, আমাদের খাবার দে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে গা ধুয়ে একখানা শাদা শাড়ি প'রে শ্রী যখন ফিরে এল তখন টেবিলে ওদের দুজনের খাবার দেওয়া হয়েছে।

খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় শ্রী জিজ্ঞাসা করলে আচ্ছা নৃপেনবাবুকে তোমার কি রকম মনে হয়?

—ভালো।

শ্রী হেসে উঠলো। বললে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই আমার ভুল হয়েছে। তোমার কাছে সবাই ভালো।

শুভেন্দু হেসে বললে, হ্যাঁ। 'কেউ বা কিঞ্চিৎ গৌরবরণ, কেউ বা কিঞ্চিৎ কালো'।

শ্রী মন্তব্য করলে, নৃপেনবাবু কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—না।

—ভুজঙ্গদাও খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

—নিশ্চয়।

একটু পরে শ্রী আবার প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, এই যে দু'জন বিভিন্নধর্মী তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন, এতে কে কাকে প্রভাবিত করবেন ব'লে মনে কর?

—বলা শক্ত। তবে ভালোর ওপর মন্দের প্রভাবটা সহজে পড়ে ব'লেই মনে হয়।

শ্রী হেসে উঠলো: তাহ'লে তুমি স্বীকার ক'রে ফেললে নৃপেনবাবু ভালো নন।

অপ্রস্তুতভাবে হেসে শুভেন্দু বললে, সামাজিক বুদ্ধিতে ভালো-মন্দের বিচার একটা আছে বই কি। আমি সেই বিচারেই বলেছি। কিন্তু এটাই দোষে-গুণে-জড়ানো মানুষের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার নয়। নৃপেনবাবু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তাঁর বুদ্ধির কাঁটা ঘোরায় অর্থ-স্বার্থ। ভুজঙ্গবাবুও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁর বুদ্ধির কাঁটা ঘোরায় পরার্থ-স্বার্থ। দুটোর পথ ভিন্ন। একটা চলে লোভের পথে, ভোগের পথে আর একটা দুঃখদহনের পথে, ত্যাগের পথে।

শ্রী যেন এতক্ষণ পরে তার ঈপ্সিত সূত্রটি পেলে। আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলে, তাহ'লে যার সার্থকতা দুঃখের পথে তাকে যদি কেউ ভোগের পথে কুপথে আনে, ফলটা কি দাঁড়ায়?

শুভেন্দু একটু ভেবে বললে, তাও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁর মধ্যে কুশাঙ্কুর থাকে রাজৈশ্বর্যও তাঁর পথরোধ করতে

পারে না। সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমানদের

ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে শ্রী বললে, স্খলন হওয়া বিচিত্র নয়। এই তো?

—হ্যাঁ।

শ্রী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে যেন একান্ত মনে খেয়ে যেতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আমার ওখানে চাকরী করাটা কি ভালো হচ্ছে?

—মন্দ কি! তোমার খুব ইচ্ছা ছিল আমার পড়ার ঘরে একটা পাখা দেওয়া। আমি তো প্রতি মুহূর্তে সেই ঘুর্ণায়মান সুদর্শন চক্রের প্রতীক্ষা করছি।

কুটিল কটাক্ষে চেয়ে শুভেন্দু হাসতে লাগলো।

শ্রী হেসে জবাব দিলে, পাখা তোমার আসছে গো। পাখার কথা ভুলিনি আমি। একেবারে তিনটে পাখার অর্ডার দিয়েছি। কাল-পরশুই এসে যাবে দেখো।

—একেবারে তিনটে পাখা! সে যে অনেক দাম!

—হ্যাঁ। কিন্তু দাম একসঙ্গে দিতে হবে না। কিস্তিতে কিস্তিতে দিলেই চলবে।

—ব্যস, তা'হলে আর চিন্তা নেই। আচ্ছা কোন্ দেশে শুনেছি ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরী-বাকরী সব মেয়েরাই করে। পুরুষে খায়-দায় আর দ্বিচক্রযানে ঘুরে বেড়ায়।

—তারপর?

—ভারতের শাসন-ভার তো এখন তোমাদের হাতে এল। সেই নিয়মটা এখানে চালাতে পারো না?

—কেন বল তো?

—আর ভালো লাগছে না। বাকি জীবনটা তোমার ছত্রচ্ছায়ায় নিষ্কর্ম কাটাতে লোভ হচ্ছে।

কটাক্ষ হেনে শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, 'এরই মধ্যে ক্লান্তি এল'?

শুভেন্দু হেসে জবাব দিলে, ক্লান্তি নয়,—কেমন যেন মনে হচ্ছে ত্যাগ মিথ্যা, সাধনা মিথ্যা, দুঃখ মিথ্যা,—সত্যি শুধু ভোগ। তোমার আশ্রয়ে আমি আলস্য ভোগ করতে চাই।

শুভেন্দুর পাতের দিকে চেয়ে শ্রী চাকরটাকে একখানা মাছ দিয়ে যাবার জন্যে ডাক দিলে। তারপরে বললে, কে বললে তোমাকে ত্যাগ মিথ্যে, সাধনা মিথ্যে?

—স্পষ্ট ক'রে কেউ বলেনি, কিন্তু কথাটা যেন হাওয়ায়-হাওয়ায় কানাকানি হচ্ছে।

শ্রী কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। শুভেন্দুর দিকে যেন চাইতে পারছিল না। রাগের সঙ্গে বললে, এই ঘরের মধ্যে ব'সেই তুমি হাওয়ার কানাকানি শুনতে পাচ্ছ?

ওর রাগের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে যেন আপনমনেই শুভেন্দু উত্তর দিলে, মনে হচ্ছে যেন পাচ্ছি।

শ্রী তখনই-তখনই এর উত্তর দিলে না। কি যেন নিঃশব্দে ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, তা যদি আসেই একটু ভোগের লোভ,—দীর্ঘ দুঃখভোগের পর—সে কি এমনই দোষের?

শুভেন্দু হেসে ফেললে। বললে, আমি তো সেই কথাই বলছি শ্রী। তুমি ভুল বুঝে মিথ্যে রেগে যাচ্ছ।

—ভুলও নি, মিথ্যে রাগও করিনি। তোমার ইঙ্গিত যে আসলে আমাদের দিকে সে আমি বুঝেছি।

—তাতেই বা রাগের কি আছে শ্রী?

—আছে। কারণ তোমার আশঙ্কাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

শ্রী শুভেন্দুর মুখের দিকে না চেয়েই বুঝতে পারছিল, ওর দৃষ্টি একাগ্রভাবে তার মুখের দিকে নিবদ্ধ। সে যেন আপন মনেই তার উক্তির পাদপূরণ ক'রে বললে, ভুজঙ্গদার জন্যে যে রাজকীয় ব্যবস্থা নৃপেনবাবু করছেন, এটা আমার ভালো লাগছে না।

তারপরেই একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে, কি জানি, হয়তো এর প্রয়োজনও

আছে। নৃপেনবাবু বলেন, সোনায় একটু খাদ থাকা দরকার। তুমি কি বল?

শুভেন্দু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। ভুজঙ্গের জন্যে নৃপেন কি রকম রাজকীয় ব্যবস্থা করেছে, তা সে জানে না, জানার কৌতুহলও নেই। সে শুধু লক্ষ্য করছিল, শ্রীর মধ্যে কি যেন একটা দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু তা নিয়েও তার যে খুব বেশি কৌতুহল রয়েছে তা নয়।

প্রকাশ্যে বললে, আমি কি বলব শ্রী? তুমি তো জানো, সোনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

ব'লে হাসতে লাগলো।

তেইশ

ভোরবেলায় ভুজঙ্গ বারান্দায় চায়ের টেবিলে ব'সে চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের 'কৃশানু' পড়ছিল আর ভুলগুলো একটা লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় অনেকগুলি ছেলের কলকণ্ঠে চমকে উঠল।

দেখলে তারই দলের গুটি চারেক ছেলে। প্রত্যেকের কাঁধে একটা ক'রে ছেঁড়া ময়লা শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা আর হাতে রং-চটা টিনের বাক্স। সেইগুলো সেইখানে বারান্দায় নামিয়ে তারা অনিশ্চিত আনন্দে হাত ঘষতে লাগলো।

ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কী রে! চ'লে এলি যে!

—পোষালো না দাদা।

—তার মানে?

তার মানে কেউই বলতে পারে না। পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

ভুজঙ্গ বললে, আচ্ছা, ঠিক আছে। বোস্ একটু চা খা। ওরে,

চাকরটা এসে দাঁড়াতেই ভুজঙ্গ বললে, এদের একটু চা দে। আর,—নিজের প্লেটের অর্ধভুক্ত ডিম ও টোস্টের দিকে চেয়ে বললে,—খাবার কিছু আছে?

চাকরটা ছিন্ন মলিন বেশধারী ছেলেগুলি, বিশেষ ক'রে তাদের বাক্স-বিছানা দেখে যে খুব প্রীত হোল, তা মনে হোল না। অসন্তুষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে, নেই।

ভুজঙ্গ মানিব্যাগ থেকে একটা টাকা বের ক'রে বললে, কিছু খাবার নিয়ে আয়। আর শোন্,

চাকরটা চলে যাচ্ছিল, নিঃশব্দে ফিরে দাঁড়ালো।

—এরা খাবে এখানে।

তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে হেসে বললে, তারপর? ঘোমালো না? কেন? মার্বেলের মেঝে গায়ে বিঁধছিল?

সামনের ছেলেটি, নাম তার প্রশান্ত, উত্তর দিলে, আজ্ঞে না। তাও অভ্যেস ক'রে আনছিলাম। কিন্তু

আবার তারা পরস্পরেরর মুখের দিকে চায়।

এরা ভুজঙ্গের কংগ্রেসী সৈন্যদল। দুর্দান্ত ছেলে। ভুজঙ্গদের দল থেকে সত্যহরি যখন মন্ত্রী হোল, এরা চ'লে গেল তার নতুন বাড়িতে। সত্যহরি অবিবাহিত, ত্যাগী কর্মী। চিরদিন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবায় কাটিয়েছে আশ্রম-জীবন এদেরই সঙ্গে। সুতরাং সত্যহরি যখন আশ্রমের কুটির থেকে মন্ত্রীর প্রাসাদে প্রোমোশন পেলো, এরাও তার অংশভোগে বঞ্চিত হোল না।

একই কর্মসূত্রে দুঃখ-বেদনার বন্ধনে সত্যহরির সঙ্গে এরা বাঁধা পড়েছিল। চরকা কাটা, তাত বোনা, গ্রামে কংগ্রেসের বাণীপ্রচার, জেলে যাওয়া সবই একসঙ্গে ক'রে এসেছে। তার ফলে, সত্যহরির সঙ্গে এদের যে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা রক্তের বন্ধনের চেয়ে দৃঢ়তর। সত্যহরির উপর ওদের এবং ওদের উপর সত্যহরির যে জোর তা জীবন-মৃত্যুর কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বস্তুতঃ এ সংসারে ভাই-বন্ধু-সখা-সেবক বলতে সত্যহরির ওরা ছাড়া আর কেউই ছিল না।

সুতরাং ভারতের ভাগ্যপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অন্যতম ত্যাগী কর্মী সত্যহরিরও যখন ভাগ্যপরিবর্তন হোল, তখন সেই সঙ্গে তার এই কর্মবাহিনীরও যে ভাগ্যপরিবর্তন হবে এতে আর আশ্চর্য কি! অতএব সত্যহরির

বাক্স-বিছানার সঙ্গে এদের বাক্স-বিছানাও মন্ত্রীভবনের মস্ত বড় ঝকঝকে ঘরে গিয়ে উঠবে সে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু এই তরুণের দল জানতো না, কর্মের বন্ধন আর ভাগ্যের বন্ধন একই সূত্রে গাঁথা নয়। নকড়ি আর কেনারাম, প্রকাশ আর ছোট হেম সত্যহরির সঙ্গে তেরো বার জেলে গেলেই এবং দশ বছর একই কুঁড়ে ঘরের মেঝের একই ছেঁড়া মাদুরে পাশাপাশি কাটালেই যে মন্ত্রীভবনের ডিস্‌টেম্পার-করা প্রশস্ত কক্ষের মোজাইক-করা মেঝের উপর মূল্যবান খাটের কোমল শয্যায় অবশিষ্ট জীবন পাশাপাশি কাটানো যায় না, জীবনদর্শনের সেই দুরূহ সত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের কোনো সুযোগ এতদিন তাদের ঘটেনি।

সত্য সর্বত্র কোমলও নয়, মধুরও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য আসে নিষ্ঠুরের বেশে। যা-কিছু প্রিয় সে-সমস্তই পরিত্যাগ ক'রে ওরা যখন দেশসেবার গাজনে মেতেছিল, সত্যের সেই রূঢ় কঠোর রূপের সঙ্গে নিয়তই তাদের পরিচয় হোত। দেশ স্বাধীন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে এল মোহ। তারা আশা করলে, সত্যদেবতার সেই রুদ্ররূপের আঘাত আর তাদের সইতে হবে না। এরপরে সত্যের মুখোমুখি যতবারই তাদের দাঁড়াবার প্রয়োজন হোক, সে সত্যের একহাতে থাকবে সুধাভাণ্ড আর হাতে পারিজাত।

সুতরাং মন্ত্রীভবন থেকে বাক্স-বিছানা ঘাড়ে ক'রে যখন তারা বেরুলো, তখন আঘাতের জ্বালা তাদের মনের প্রশান্তিকে অনেকখানি বিচলিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পথে একে অন্যের সেই অতিপরিচিত মুসাফির মূর্তির দিকে যখন চাইছিল, তখন না হেসেও পারছিল না। ভাবটা এই যে, বন্ধু, অনেক দিন পরে আবার তোমাদের সেই চিরপরিচিত রূপে দেখলাম! আর কী ভালোই যে লাগছে!

ভুজঙ্গের সঙ্গে ওরা সেই গল্পই আরম্ভ করলে:

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে: পোষালো না কেন? সত্যদা কি খারাপ ব্যবহার করছিল?

নকড়ি বললে, সত্যদা নিজে নয়।

—তবে ?

—সত্যদার পিসতুতো না মাসতুতো বোনেরা।

ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে উঠলো: দূর্ বোকা! সত্যদার আবার মাসতুতো-পিসতুতো বোন কি ?

কেনারাম বললে, আমারও তাই ধারণা ছিল, আপনাদের মাসতুতো-পিসতুতোর বালাই নেই। কিন্তু চোখে দেখে কি ক'রে অবিশ্বাস করি বলুন।

ভুজঙ্গ বললে, চোখে দেখলি ?

কেনারাম বললে, দেখলাম বই কি।

কী রকম দেখলি ?

—তাহ'লেই মুস্কিলে ফেললেন ভুজঙ্গদা।—কেনারাম একটু ভেবে বললে,—মুখের দিকে চাইবার সাহস হয়নি কোনোদিন। শুধু মেঝের উপর হিল্-তোলা জুতোর শব্দ শুনেছি।

প্রকাশ বললে, মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু বোঝানো মুস্কিল।

—কি রকম ?

আমতা আমতা ক'রে প্রকাশ বললে, কি রকম রং-মাখানো মুখ ভুজঙ্গদা। গাঁয়ে-ঘরে আমরা যাদের দেখি ঠিক তাদের মতো নয়। কেমন চোখ, কেমন ভুরু, কেমন ঠোঁট, কেমন রং বলা কঠিন।

ভুজঙ্গ হেসে ফেললে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে লাগলো এরা কে হ'তে পারে। সত্যহরির নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াদের অনেককেই সে চেনে। এরা যে তাদের কেউ নয় এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা কে তবে ?

ছোট হেম এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। বললে, আপনি তাদের চিনবেন না ভুজঙ্গদা। আমরাও এর আগে কখনও দেখিনি। এরা ঠিক নিজের মাসতুতো-পিসতুতোও নয়।

ভুজঙ্গ প্রশ্ন করলে, কি ক'রে জানলি ?

ছোট হেম বললে, প্রথম যেদিন আসে আমি ছিলাম। সত্যদা ওদের চিনতে পারেননি—নাম শুনেও না। অনেকখানি পরিচয় দেওয়ার পর বুঝতে পারলেন,—তাও যেন কতকটা আন্দাজে।

আশ্বস্তভাবে ভুজঙ্গ বললে, তাই হবে। দূর সম্পর্কের কেউ। নইলে আমি চিনতে পারতাম। কিন্তু কী করলে মাসতুতো-পিসতুতোরা?

জবাব দিলে নকড়ি। বললে, আমাদেরও দোষ ছিল ভুজঙ্গদা।

—কি রকম?

—সত্যদা যে-বাড়িতে রয়েছেন, দেখেছেন?

—না। আমি একদিনও গিয়ে উঠতে পারিনি।

—মস্ত বড় বাড়ি।

—নিশ্চয়ই।

—সেই বাড়িতে আমরা গিয়ে বিপন্ন বোধ করলাম। এতগুলো মস্ত মস্ত ঘর নিয়ে কা যে করা যায় ভেবেই পেলাম না। সত্যদা বললেন, ঘরগুলো মিথ্যে-মিথ্যি ফেলে রাখা তো চলবে না। রাত্রিতে প্রত্যেক ঘরে গিয়ে ঘণ্টাকয়েক ক'রে শোয়া যাবে, কি বলিস্?

সবাই হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ জিগ্যেস করলে, তারপরে?

ছোট হেম বললে, তারপরে বিছানার যা ছিরি! যেমন শতরঞ্চির অবস্থা, তেমনি কাঁথা বালিশের!

ভুজঙ্গ অপাঙ্গে ওদের বিছানাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

ছোট হেম চোখ মিটি মিটি ক'রে বললে, রাত্রে ওগুলো যখন মার্বেলের মেঝেয় সার-সার বিছানো হোত, ঘরগুলো যেন ঝলমল ক'রে হেসে উঠত! একদিন তাড়াতাড়িতে ওগুলো আর গুটোনো হয়নি। এমন সময় হাই-হিলের খুট্ খুট শব্দ ক'রে মাসতুতো-পিসতুতোরা এসে উপস্থিত। বিছানা দেখে তাদের কী হাসি! এরা তখন কোথায় গেছে। আমি একা। বাথরুমে।

মাসতুতোরা জিগ্যেস করলে, ওগুলো কি রাঙাদা?

সত্যদা লজ্জিত অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ছোড়াগুলো বাইরে গেছে, কিন্তু বিছানা তুলে যায়নি!

—কে ছোঁড়াগুলো? ও হতভাগাদের কোথেকে জোটালেন?

সত্যদা বিব্রতভাবে কি যে বললেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় মাসতুতোরাও না। তাঁরা জোরের সঙ্গে বললেন, তা সে যেই হোক, এ সব বিছানা এখানে চলবে না। ওদের নিচে যেতে হবে। এখানে ডিনার-টেব্‌ল্‌টা পড়বে।

সত্যদা অস্ফুট কণ্ঠে বোধ হয় বাধা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। তারা হৈ হৈ ক'রে উঠলো: কী আশ্চর্য রাঙাদা! নিচের ঘরগুলোই বা মন্দ কি! যেখানকার যা, সেখানে তাই থাকবে।

প্রকাশ বললে, অর্থাৎ নিচের তলার লোক নিচের তলায়!

—হ্যাঁ! ছোট হেম বললে,—আমি সেই বাথরুমে খিল বন্ধ ক'রে ব'সে। অনেক চাকর-বাকরের পায়ের শব্দ, জিনিসপত্র টানাটানি, ধোয়া-মোছা সমস্ত শুনছি। মনে হোল ওপর শেষ হয়ে এবার নিচে অভিযান আরম্ভ হোল। তখন চুপি চুপি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরে ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম।

ব'লে বোকার মতো হাসতে লাগলো। একটু পরে বললে, কিন্তু যাই বলিস ভাই, বাড়ি সাজিয়ে গেল বটে! যেন আর সে বাড়ি নয়।

ব'লে গর্বিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাইতে লাগলো।

নকড়ি বললে, তারপরে ঠাকুরের কথাটা বল্।

যেন একটা ঝাপ্‌টায় সেই গৌরবাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে ছোট হেম বললে, হাঁ, ঠাকুরের কথাটা! জানেন ভুজঙ্গদা, গিয়ে দেখি উনুনে কি যেন একটা চড়িয়ে ঠাকুর জড়সড় হয়ে ব'সে।

জিগ্যেস করলাম, কি ঠাকুর, আকাশ পাতাল ভাব কি?

—বারোটা বেজে গেল বাবু!

—কেন?

—আমার জবাব হয়ে গেল। কাল থেকে একটা ভালো ঠাকুর আর একটা বাবুর্চি আসছে।

—বাবুর্চি!

—হ্যাঁ গো! আমার রান্না সাহেব-বাড়িতে চলবে না। তোমাদেরও সুবিধা হবে না বাবু, তোমরাও এই বেলা একটা আস্তানা দেখে নাও।

ছোট হেম বললে, ঠাকুর বরাবরই আমাদের আপনি-আজ্ঞে করত। কিন্তু সে বোধ হয় আমাদের দৌড় বুঝে ফেলেছে!

ব'লে হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, তাই তোরা চ'লে এলি?

প্রকাশ হেসে বললে, এত সহজে! তার পরেও আমরা পোনেরো দিন ছিলাম। প্রথম প্রথম সত্যদা সেক্রেটারিয়েট থেকে ফিরে আমাদের ঘরে আমাদের ছেঁড়া মাদুরে এসে বসতেন! গল্প-সল্প করতেন। তারপরে কাজের ভিড়ে সে সময়ও আর পেতেন না। শেষে

সকলে কাঁচুমাচু ক'রে বললে, আর থাকতে লজ্জা করতে লাগলো।

ভুজঙ্গ সত্যহরিকে টেলিফোন করলে: সত্যদা, কেমন আছ?

—ভালো নেই ভাই, মারা গেলাম।

—কি হোল?

—কাজ। নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

—তা তো হবেই। এতবড় দেশের শাসনভার।

—শাসনভার নয় ভাই, তার চেয়ে বেশি ঝামেলা লোকজনের ভিড়: চাকরী দাও, চাকরী দাও। এত চাকরী কোথায় পাব বল তো?

—তা তো বটেই। সব যেন উপোসী ছারপোকার মতো আক্রমণ করেছে। আচ্ছা, প্রকাশরা আছে ওখানে?

—প্রকাশ? ডেকে দোব?

—দাও না একটু, যদি অসুবিধা না হয়।

—না, অসুবিধা আর কি! ধ'রে থাক, ডেকে দিচ্ছি।

ভুজঙ্গ কলিংবেলের শব্দ পেলে। একটু পরে সত্যহরি জানালে, তারা তো নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় আবার এত সকালে বেরুলো! একটু খবর নাও না ভাই, কোথায় বেরুলো, কখন ফিরবে।

—দেখছি। ধ'রে থাক। এবারে সত্যহরির কণ্ঠে একটু বিরক্তির স্বর।

একটু পরে সত্যহরি বললে, তারা তো নেই। তাদের বাক্স-বিছানাও না। কী আশ্চর্য! এই ছেলেগুলো হয়েছে এমন ইয়ে,

—কবে গেল তারা ?

—তাও কেউ বলতে পারছে না। আমার এই বাড়ির চাকরগুলো হয়েছে,

—খেতো তো তোমার ওখানেই ?

—নিশ্চয়। আর খাবে কোথায় ?

—তাহ'লে ? কবে থেকে খাচ্ছে না ?

সত্যহরি চাকরকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে। তারপর বললে, ওরাও ঠিক খবর রাখে না। বোধ হয়, দু'তিন দিন আগে গেছে।

—হঠাৎ চ'লে গেল ? তোমার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া

—কিছু না, কিছু না। ওদের সঙ্গে আমার,—আমার সঙ্গে ওরা দেখাই করে না। আক্কেলটা দেখ, যাবার সময় আমাকে একবার ব'লে যাওয়াও দরকার মনে করলে না!

সত্যহরি যেন একটু অপ্রস্তুত, যেন একটু বিব্রত।

ভুজঙ্গ আর কিছু বললে না। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলে। ওদের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কদ্দিন খাসনি তোরা ?

নকড়ি হেসে বললে, কদ্দিন কি বলছেন ভুজঙ্গদা ? এই তো সেদিন খেলাম সত্যদার হোটেলে, তোফা ভাত-ডাল-তরকারী-মাছ, একটু মাংসও ছিল বোধ হয়, না রে ?

ভুজঙ্গ রেগে বললে, হতভাগারা এতদিন আসিসনি কেন ?

প্রকাশ হেসে বললে, দোষ আমাদেরই ভুজঙ্গদা। ঘুরে ঘুরে আমরা যখন ফিরতাম, তখন লাঞ্চ-ডিনারের টাইম চ'লে যেত। অনেক সময় ঠাকুর-বাবুর্চি তখন কাজকর্ম সেরে চ'লে যেত, অনেক সময় হয়তো খাবার কিছু থাকত না। সত্যদার দোষ কি ?

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়তে লাগলো। হঠাৎ মানিব্যাগ

থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের ক'রে বললে, এইটে রেখে দে তোদের কাছে। হঠাৎ দরকার পড়লে

প্রকাশ দ্বিধাভরে অন্নদের মুখের দিকে চাইতে লাগলো, কিন্তু নকড়ি হাত বাড়িয়ে খপ্‌ ক'রে নোটখানা নিয়ে পকেটে পুরে ফেললে।

বিকেলে যথারীতি নৃপেন এলো। কিন্তু আজকে তার মুখ আরও উৎফুল্ল। খুশি যেন তার চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে উছলে পড়ছে। ভুজঙ্গের দিকে ডান হাতটা মর্দনের জন্যে প্রসারিত ক'রে বললে, আজ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কি চাও বলো।

ভুজঙ্গ এর জন্যে তৈরিই ছিল। আজ সকালের কাগজে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সে যে জ্বালাময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছে, তা নিয়ে অনেক অভিনন্দন ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

নৃপেন বললে, অদ্ভুত লেখা। আজ সমস্ত দিন যেখানে গেছি, সেখানেই তোমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। বলো, কি চাও।

—দেবে তা?

—অসাধ্য যদি না হয়।

—তাহ'লে বলি। দূর কোনো গাঁয়ে খানিকটা খোলা জায়গায় আমাকে ছোট্ট একটি কুঁড়ে বানিয়ে দাও। কুড়িটি টাকা দিও আমার খাবার জন্যে আর পঁচিশটি টাকার বই কিনে পাঠিয়ে দিও। যতদিন বাঁচব, ততদিন। দেবে?

নৃপেন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু তখনই পরিহাসের সুরে বললে, 'কৃশানু' সেইখান থেকে বেরুবে?

ভুজঙ্গও হেসে উত্তর দিলে, না এইখান থেকেই বেরুবে,—'কৃশানু'র জয় হোক। আমি পেনশন চাইছি।

—চমৎকার!

—দেবে না ছুটি ?

—না। আজ তো নয়ই, তোমার মৃত্যুর পরেও বজ্র তৈরি করব তোমার হাড় দিয়ে।

—আমার মৃত্যু ঘটে গেছে। তুমি বুঝতে পারছ না নৃপেন ?

নৃপেন চমকে উঠলো। কণ্ঠস্বরটা ঠিক যেন পরিহাসের মতো শোনাল না মনে হোল।

—মৃত্যু ? তুমি বলো কি ভুজঙ্গ ? যে-লেখা আজ তোমার কলম থেকে বেরিয়েছে, যাদের রক্ত টগবগ ক'রে ফোটে তারাই শুধু সে-লেখা লিখতে পারে।

ভুজঙ্গ যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বললে, কি জানি কি লিখেছি। কিন্তু যেদিন থেকে আমাদের হাতে স্বাধীনতা এসেছে, সেদিন থেকেই বোধ হচ্ছে যেন আমাদের মৃত্যু ঘটে গেছে। মরে গেছে সত্যদা, মরে গেছে ভুজঙ্গ।

— সত্যদা কে ?

—তোমাদের মন্ত্রী। আমাদের সেই পুরোনো সত্তার মৃত্যু ঘটেছে। যাদের চোখে দেখেছ, এরা সেই শরীরে অন্য মানুষ।

নৃপেন ওকে উৎসাহিত করবার জন্যেই যেন জোরে জোরে হেসে উঠলো। বললে, পুরোনো সত্তার জের টেনে যাওয়াকেই তুমি জীবন বলো ?

বলি। যে-সত্তার সূচনা হোল স্ফুলিঙ্গে তাকে শিখায় বিকশিত ক'রে তোলাই জীবন ধারা। হঠাৎ সেই স্ফুলিঙ্গ নিবিয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে।

নৃপেন হো হো ক'রে হেসে বললে, এবারে হেঁয়ালীতে উঠলে। আর আমি তোমার নাগাল পাব না। আর একটু স্থূল ক'রে বলো তো ব্যাপারটা কি ?

—ভালো লাগছে না।

—কি ভালো লাগছে না ?

—এই বিলাস এই আরাম, এই মনের মানুষের থেকে বিচ্ছেদ।

নৃপেন পরিহাসের সুরে বললে, আরাম-বিলাস ভালো লাগে না, এ খুব অদ্ভুত কথা স্বীকার করি। কিন্তু মনের মানুষটি কে, যার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল ?

—দেখবে তাদের ?

—তোমার আপত্তি না থাকলে আমার আপত্তি নেই।

—তাহ'লে দেখাই দাঁড়াও।

ব'লে ওর বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে পাশের ঘরে গেল এবং নকড়িদের নিয়ে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে।

বললে, এরাই। এরাই আমার মনের মানুষ, আমার জ্ঞাতি, আমার সগোত্র। আমি বুঝতে পারছি, এদের থেকে ক্রমেই আমি স'রে আসছি। তার মানে আমি আমার স্বধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি।

ওদের ছিন্নমলিন জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে নৃপেন যেমন অবাক, নৃপেনের মূল্যবান ইংরাজি পোষাকের দিকে চেয়ে ওরাও তেমনি।

কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নৃপেন ব্যাপারটা বুঝে নিলে এবং সসম্ভ্রমে ওদের বললে, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কবে এসেছেন ?

ওরা কুণ্ঠিতভাবে জানালে, আজ সকালে।

—কোথায় দেশ আপনাদের ?

ভুজঙ্গ উত্তর দিলে, এক জায়গায় নয়,—কারও মেদিনীপুর, কারও মুর্শিদাবাদ কারও কুমিল্লা, এইরকম। এতদিন দেশের কাজ করছিল। এখন দেশ স্বাধীন। এদের আর কোনো কাজ নেই। 'Othelo's occupation gone' !

নৃপেন সবিস্ময়ে বললে, কেন ! দেশে কি এতদিন শুধু ইংরেজ-তাড়ানোই একটা কাজ ছিল ? এখন আর কোনো কাজ নেই ?

ভুজঙ্গ বললে, থাকবে না কেন ? কাজ তো সবই প'ড়ে আছে। কিন্তু তার জন্যে এদের আর দরকার নেই। তার জন্যে পুলিশ আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে, গবর্ণমেন্টের গোটা শাসনযন্ত্রটাই আছে।

—তাহ'লে এঁরা এখন কি করবেন ?

—সেই তো সমস্যা। দিন কয়েক সস্তাদার হোটেলে ছিলেন, আজ আমার হোটেলে আছেন, বলতো কাল তোমার হোটেলে পাঠিয়ে দিতে পারি। কে ভাবছে এদের কথা ?

কিন্তু এই পরিহাসে নৃপেন হাসলে না। সে নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো। উত্তেজনায় উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলে।

একটু পরে বললে, একটু চা খাওয়াবে ন ভুজঙ্গ?

—নিশ্চয়।

—ছ'কাপ। আর দেখ, আসবার সময় দেখলাম, ও-ফুটপাথে চমৎকার তেলেভাজা ভাজছে।

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তেলেভাজা কি হবে?

—সবাই মিলে খাব, আর কি হবে?

ভুজঙ্গ আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সবাই মিলে খাব? তুমি খাবে? তুমি তেলেভাজা খাও?

কেন খাব না?

বেয়ারাটা কয়েকটা প্লেটে ক'রে কতকগুলো তেলেভাজা এনে দিলে। আর চা। ওরা চা খেতে খেতে অনেক গল্প করলে। স্বাধীনতার আগেকার গল্প, স্বাধীনতা পাওয়ার পরের গল্প, চালের কাঁকরের গল্প, সরকারী কণ্ট্রাক্টের গল্প, আরও অনেক কিছু।

হঠাৎ এক সময় নৃপেন উঠে দাঁড়ালো। বললে, তুমি এঁদের ছেড়ো না ভুজঙ্গ। এঁদের সম্বন্ধে কি করা যায়, আমি এখনই ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে।

ওদের দিকে চেয়ে বললে, আপনারা পালাবেন না। ভুজঙ্গ বিরক্ত হোলেও না। আমি আপনাদের জন্যে কিছু করব, নিশ্চয় জানবেন।

নৃপেন চ'লে গেলে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, এ ভদ্রলোক কে?

ভুজঙ্গ জানালে, এই কাগজের মালিক। কি রকম লাগলো?

কেনারাম এবং নকড়ি বিগলিত কণ্ঠে বললে, অদ্ভুত! এ রকম ভদ্রলোক আমরা দেখিনি।

ছোট হেম বললে, অত বড় লোক, কিন্তু অহঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। আমাদেরই সঙ্গে এক প্লেটে তেলেভাজা খেয়ে গেলেন।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, কেন, তোরাও কি সামান্য লোক নাকি? আজ

নানা কারণে আকাশ ঘোলাটে হয়ে আছে। তোদের যথার্থ মূল্য দিতে পারছে না দেশ। কিন্তু দেশের এই সময়কার ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন তোদের কথাই লেখা হবে,—নানা ফন্দি-ফিকিরে মিলিটারী কন্ট্রাক্টে যারা বড় হয়েছে, তাদের কথা নয়।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, কথা শুনে মনে হোল, আপনার সঙ্গে অনেক আগের পরিচয়, না?

—হ্যাঁ। ছেলেবেলায় আমরা এক স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এর চেয়েও অদ্ভুত মানুষ এর স্ত্রী। আমি যখন ১৯৪২-এর অগষ্ট বিপ্লবের পরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম, এরা তখন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এমন সময় ব্রততীকে নিয়ে শ্রী এসে উপস্থিত।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, এস ব্রততী। তোমার কথাই হচ্ছিল। অনেক দিন বাঁচবে।

ব্রততী সহাস্যে বললে, আমার কথা আপনি বলছিলেন! কি আশ্চর্য!

—তোমার কথা আমি বলছিলাম, এর মধ্যে আশ্চর্যটা কি?

একখানা চেয়ার টেনে বসতে বসতে ব্রততী বললে, আমি জানতাম, খবরের কাগজের সম্পাদকরা চার্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন-জওহরলালের নিচে আর কারও কথা আলোচনাই করেন না।

—অনেক জিনিসই ভুল জানতে তুমি। যেমন, অফিসে বসে আমরা এক টাকার তেলেভাজা উড়িয়ে দিতে পারি, একথা জানতে তুমি?

—তাই নাকি! তাহ'লে খুব দেরি হয়ে গেল তো!

—তোমার স্বামীর ফরমাস।

এবারে ব্রততী সত্য সত্যই চমকে উঠলো : বলেন কি! তাঁর যে কাল থেকেই পেটটা ভালো নেই! সকালে এক গ্লাস বার্লির সরবৎ খেয়ে বেরিয়েছেন।

শ্রী হেসে বললে, তাহ'লে ক্ষিদের চোটে ভুলে গেছেন পেটের কথাটা।

ব্রততী উদ্বিগ্নভাবে বললে, তিনি তো ভুলে গিয়েই খালাশ। কিন্তু ফিরে গিয়ে আমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

শ্রীর দিকে চেয়ে ব্রততী বললে ওঁর একটা ক্রনিক ডিসেণ্টি আছে। মাঝে মাঝেই কষ্ট পান। কাল থেকে আবার দেখা দিয়েছে।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ব্রততী বললে, ডাক্তার আসেন, দেখেন, ওষুধ দেন। কিন্তু ওষুধ খাবার সময় কোথায়? কোনো রোগেরই ওঁর শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা হয়নি। নিতান্ত যখন শুয়ে পড়েন, তখন কিছুটা চিকিৎসা হয়, ওষুধও চলে। উঠে বসবার মতো শক্তি হলেই বাইরে ছুটবেন। কার সাধ্যি আটকায়!

শ্রী বললে, কাজে পাগল।

ব্রততী হেসে বললে, পাগলই বটে দিদি। সহজ মানুষ এমন করতে পারে না।

ভুজঙ্গ যোগ দিলে, সাধারণ মানুষও না।

তারপর বললে, ব্যাপারটা কি হোল তোমাকে তাহ'লে বলি ব্রততী।

প্রকাশরা শ্রীর অপরিচিত নয়। ওদের আসার খবরও শ্রী আগেই পেয়েছে। সে একপাশে ওদের সঙ্গে গল্প করতে বসলো। ভুজঙ্গ ব্রততীকে বলতে লাগলো:

—আমার মনে হয়, এই ছেলেগুলোর ব্যাপারে সে এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, পেটের কথা আর খেয়ালই ছিল না।

ব্রততী ছেলেগুলির দিকে একবার চেয়ে ভুজঙ্গের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

ভুজঙ্গ বললে, ওরা আমাদের দলের ছেলে। আমাদের সঙ্গে দেশের কাজ করত। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং বেকার।

—বেকার কেন? এখন তো আপনারা ইচ্ছা করলেই কাজ জুটিয়ে দিতে পারেন।

ভুজঙ্গ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, সে-ইচ্ছা আপাতত আমরা করতে চাই না।

—কেন ?

—কারণ প্রথমত আমরা মনে করি, আমরা যারা শাসন-দপ্তরের শীর্ষস্থানে উঠেছি, তারা ছাড়া আর কারও পক্ষে সরকারী দপ্তরখানায় প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করাও পাপ। কংগ্রেস কর্মীরা স্বাধীনতার যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতায় আসীন হওয়ামাত্র আমাদের অনেক মাসতুতো-পিসতুতো জুটে গেছেন, যাঁরা এতদিন পুলিশের ভয়ে আমাদের ছোঁয়াচ পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন। তথাপি রক্ত যে জলের চেয়ে ভারি এতো স্বতঃসিদ্ধ।

—সুতরাং ?

—সুতরাং এরা মরবে। ইংরেজ এদের মেরেছে, আমরাও মারব। বলব, শাসনকার্যে আমরা ক'জন ছাড়া কংগ্রেসের আর কারোই যোগ্যতা নেই। রেডিওতে, সৌধ চূড়ায়, পুলিশ-বেষ্টিত বড় বড় গাড়ি চ'ড়ে আমরা এদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের মহৎ আদর্শ শোনাব।

—অর্থাৎ দেশের সেবায় এদের প্রয়োজন শেষ হয়েছে।

—নিশ্চয়। দেশের সেবা করবার জন্যে এখন থেকে তো শাসন-বিভাগই রয়েছে। কেবল

—কেবল ?

—আগামী নির্বাচনের সময় এদের একবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তার এখনও দেরি আছে।

—তখন এদের পাবেন কোথায় ?

—কণ্ট্রাক্ট ও বাস-ট্যাক্সির লাইসেন্স দিয়ে কিছু কিছু জিইয়ে রেখে দোব।

—বাকীদের ?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তাদের হয়তো পাওয়া যাবে না।

—তাহ'লে ?

—কি তাহ'লে ? ভোট-ভিক্ষার লোক মিলবে কোথায় ?

—হ্যাঁ।

ভুজঙ্গ প্রশান্ত হাস্যে বললে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় ? এরা না এলে অন্য লোক আসবে।

প্রকাশ শ্রীর সঙ্গে গল্প করতে থাকলেও তার একটা কান বোধ হয় এইদিকেই ছিল। বললে, আসবে নয় ভুজঙ্গদা এসে গেছে। অনেক দিন পরে কাল এক বার কংগ্রেস অফিসে গিয়েছিলাম। একটাও চেনা মুখ দেখতে পেলাম না। যেখানে যাই, জিগ্যেস করে কাকে চান? সবাই সন্দেহ করে। ভয়ে আমার তখন তেষ্টা পেয়ে গেছে। এমন সময় দেখি এক কোণে একটা ভাঙা বেঞ্চিতে ব'সে হরিদা খবরের কাগজ পড়ছে। তাকে দেখে বাঁচলাম। ইঙ্গিতে জিগ্যেস করলাম, ওরা কারা? হরিদা চুপি চুপি বললে, ওরাই আসল,—ওরাই আসল, —ওরা 'নতুন রক্ত'।

প্রকাশ হাসলে।

শ্রী হেসে বললে, আশ্চর্য হবেন না ব্রততীদি। কোন্ দিন হয়তো শুনবেন, নৃপেনবাবু ক'লকাতার একটা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন।

ব্রততী বললে, আশ্চর্য কি শ্রীদি। ক'দিন থেকে আমাদের বাড়িতে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিদের আসা-যাওয়া যে-রকম বেড়েছে, তাতে মনে হচ্ছে সে শুভদিনের আর বোধ হয় বেশি দেরিও নেই।

ভুজঙ্গ এবং শ্রী এক সঙ্গে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো: তাই নাকি?

—তাই তো বোধ হচ্ছে।

সবাই স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

চব্বিশ

শ্রীদের ফ্ল্যাটে প্রত্যেক ঘরেই পাখা এসে গেছে। শুভেন্দু তার লাইব্রেরী ঘরে এখন পাখার নিচে পরমানন্দে মহারাজ প্রিয়দর্শী নিয়ে গবেষণা করে। ঘেমে ওঠে না। বরং কোনো কোনো দিন আরামে চেয়ারে ব'সে ঘুমিয়েই পড়ে। কয়েক দিন পরে একদিন সে স্বীকার ক'রেই ফেললে যে, বৈদ্যুতিক পাখাকে ঠিক বিলাস বলা চলে না, বরং প্রয়োজনীয়ই বলতে হয়।

শুধু পাখা নয়, অফিস থেকে তাকে একটা টেলিফোনও দেওয়া হয়েছে। 'কৃশানু'র আরও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীকেও দেওয়া হয়েছে। অফিসের কাজের যাই হোক, এতে শুভেন্দুর খুবই সুবিধা হয়েছে।

সেদিন সকালে এই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। নৃপেন শ্রীকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছে একটা বিখ্যাত সাহেবী হোটেলে।

শ্রী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোথায়?

—অফিসে।

—এই সাতদিন কোথায় ছিলেন?

—প্রধানত অফিসে এবং কলকাতা শহরের নানা স্থানে।

—বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়ারও সময় পাননি?

—না। এবং যেজন্যে এই দুশ্চর তপস্যা, আধ ঘণ্টা আগে তা সফল হয়েছে। ভগবান বর দিয়েছেন।

—কত টাকার বর?

—তা মন্দ নয়। একুশ লক্ষ টাকার। তাই ভাবলাম, আজকে খাবার টেবিলে আপনি থাকলে মনটা আরও ভালো হয়। আসছেন তো দয়া করে?

—নিশ্চয়ই।

—বহু ধন্যবাদ। ঠিক পোণে একটায় গাড়ি যাবে। আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।

—নিশ্চয়ই। আর কি খবর বলুন।

—অনেক খবর আছে। কিন্তু সে সব সাক্ষাতে।

শ্রী হাসতে হাসতে খবরটা শুভেন্দুকে দিলে। বললে, আশ্চর্য ভাগ্যবান এই লোকটি। একটা মস্ত বড় গবর্ণমেন্ট অর্ডার। যে এটা এতদিন পেয়ে আসছে, সেও গবর্ণমেন্টের খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু নৃপেনবাবুর জেদ এই অর্ডারটা পেতেই হবে। সাত দিন ভদ্রলোক কোথায় নেয়েছেন, কোথায় খেয়েছেন, রাত্রিই বা কোথায় কেটেছে বরতাও তার হদিস পায়নি। সাত দিন পরে আজ ফোন করছেন, ভগবান বর দিয়েছেন। বললেন, তাঁর দুশ্চর তপস্যা সার্থক হয়েছে।

শুভেন্দু একটু ভেবে বললে, একে তুমি তপস্যাই বলতে পার, এর বর লক্ষের অঙ্কে পাওয়া যায়।

—আর তোমাদের তপস্যায় ?

আর একটু ভেবে শুভেন্দু বললে, বৎসরের অঙ্কে। অর্থাৎ কত বৎসর বেঁচে থাকবে : একশ, কি পাঁচশ, কি হাজার বৎসর, কি অনন্ত কাল।

শ্রী স্থির নেত্রে কথাটা ভাবতে লাগলো।

শুভেন্দু বলতে লাগলো, আর যাঁরা ভগবানের জন্যে তপস্যা করেন,

শুভেন্দু থামলো।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কিসের অঙ্কে ?

—নিরঙ্কের অঙ্কে। অর্থাৎ অঙ্কের আঁচড় সেখানে পড়ে না। বলতে পারো, মহাকালীর অঙ্কে।

—তাহ'লে কে শ্রেষ্ঠ ?

—নিজের নিজের সাফল্যে প্রত্যেকেই কৃতার্থ। কিন্তু এখন দশটা বাজে। তোমার কোথায় কার সঙ্গে যেন দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল, যাবে না ?

—যেতে হবে।

—তাহ'লে আর দেরি কোরো না। ফিরে এসে সাড়ে বারোটার মধ্যে তৈরি থাকতে হবে।

—হ্যাঁ, যাই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে শ্রী বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু ট্রামে আসতে আসতে হঠাৎ কি মনে হোল, ধর্মতলায় নেমে পড়লো।

বিলিতি হোটেলে কত কাল সে খায়নি। যতদিন কংগ্রেসের কাজে নেমেছে ততদিন। কংগ্রেসের কাজে জামা-কাপড়ের বিলাসিতার প্রয়োজন করে না। বিলাসিতার প্রবণতাও তার নেই। কিন্তু ধনী বন্ধুর সঙ্গে বিলিতি হোটেলে লাঞ্চ খেতে গেলে নিতান্ত সাধারণ পোষাকে যাওয়াও ঠিক নয়। যেখানকার যা। হয়তো বেয়ারাগুলো অদ্ভুতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকবে। ভাগ্যক্রমে লাঞ্চে যাওয়ার মতো শাড়ি বোম্বাই-প্রবাসের কল্যাণে তার

অনেকগুলো রয়েছে। কিন্তু প্রসাধনের উপকরণ একেবারেই নেই। যেখানে তার যাওয়ার কথা, সেও অবশ্য জরুরী। কিন্তু সে কাল গেলেও চলবে। আজ বরং মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে কিছু প্রসাধনের জিনিস কিনে নিয়ে যাক।

ধর্মতলায় নেমে পড়লো সেই জন্যেই। মার্কেট থেকে আবশ্যকীয় প্রসাধন দ্রব্য কিনে যখন সে ফিরলো তখন সাড়ে এগারোটা। জলের শব্দে বুঝলে, শুভেন্দু বাথরুমে।

শুভেন্দু ফিরে এলে তার জন্যে ঠাকুরকে ভাত দিতে ব'লে শ্রী বাথরুমে গেল। ফিরে এসে একখানা হালকা রঙের শাড়ি প'রে মুখে হাল্‌কা পেণ্ট ক'রে আয়নায় নিজের বেশ দেখেই তার কি রকম লজ্জা করতে লাগলো।

ঠাকুর যখন খবর দিলে নিচে নৃপেনবাবুর গাড়ি অপেক্ষা করছে, তখন সেই বেশে কিছুতেই সে শুভেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে না। তাকে কিছুই না জানিয়ে এক রকম চুপি চুপি নেমে এসে সে নৃপেনের গাড়িতে গিয়ে বসলো।

হোটেলের সামনের ফুটপাথে গাড়ি-বারান্দাব নিচেই নৃপেন পাইচারি করছিল। তার বেশে আজ যেন পারিপাট্য আরও বেশি। মাথার চুল সাধারণত তার অগোছালো থাকে। বোধ কবি একটু আগেই কোনো সেলুনে চুল কেটে এসেছে। চুলগুলি পরিপাটিভাবে বিন্যস্ত। কোটের বাট্‌ন্‌-হোলে একটা লাল গোলাপ। হাতে আর একটি।

শ্রী গাড়ি থেকে নামতেই নৃপেন এক মুহূর্ত ওর পোষাকের দিকে চেয়ে রইল। এ রকম সুসজ্জিত বেশে ওকে কোনোদিন সে দেখেনি। এবং তখনই হাতের গোলাপটি ওর হাতে দিযে ওকে নিয়ে হোটেলের ভিতরে চ'লে গেল।

একটা নিরিবিলি কোণে ওরা দু'জনে বসলো।

শ্রী জিজ্ঞাসা করলে, আর কাউকে বলেননি ?

—না। সাতদিন ধ'রে অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের ভিড় সহ্য করলাম। আজ একা খেতেও ইচ্ছা করল না, ভিড়ও ভালো লাগলো না। তাই নিরিবিলি শুধু আপনাকে নিমন্ত্রণ করলাম।

শ্রী ভেবেছিল, অনেক লোককেই হয়তো নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। অন্ততঃ ব্রততীদি আর ভুজঙ্গদা আছেনই। কিন্তু নেই যখন, তখন সে প্রসঙ্গ আর তুললো না। জিজ্ঞাসা করলে, ভিড়ের কথা বলছিলেন, কিসের ভিড় ?

নৃপেন মুচকি হেসে বললে, পুরোহিতের,—যাঁদের হাত দিয়ে দেবতারা হবি গ্রহণ কবেন তাঁদেব।

বেয়ারা স্যুপ দিয়ে গেল। তারই এক চামচ খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে নৃপেন বললে, আপনাকে একলা নিমন্ত্রণ করেছি, তার আরও কারণ আছে।

—কি কারণ ?

—কিছু অনুমান করতে পারেন ?

—না। কাগজ নিয়ে ?

নৃপেন একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বললে, তা অনুমান করতে পারেন, এ সাধ্য আপনার নেই। তা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

—তাহ'লে ব'লেই ফেলুন, কারণটা কি।

নৃপেনের মতো লোকেরও কথাটা এক-দমে বলতে বোধ হয় সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে একাগ্রচিত্তে সে স্যুপ খেয়ে চললো। তারপর মুখ তুলে হেসে বললে, এ সঙ্কটে আপনি ছাড়া কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারে না। করবেন আমাকে রক্ষা ?

নৃপেন হাত জোড় করলে অনুনয়ের ভঙ্গিতে।

ওর কথা শুনে শ্রীর কেমন ভয় করছিল। নৃপেনকে এর মধ্যে যতটুকু সে চিনেছে, তাতে ওর সম্বন্ধে তার মনে একটা ভয়ের ভাবই আছে। ওর একটা লক্ষ্য আছে যার সঙ্গে শ্রীদের কোনো যোগ নেই,—না অন্তরের, না বুদ্ধির। ওর রাজ্য তাদের কাছে অপরিচিত অন্ধকারের রাজ্য। অপরিচিত এবং অন্ধকার ব'লেই ভয়টার কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে না।

ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, ব্যাপারটা না জানলে তো প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না নৃপেনবাবু।

—আপনাদের কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি আমাকে ধরেছেন আমাদের এই জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্যে। কি করি বলুন তো?

বিস্ময়ে শ্রীর কণ্ঠ যেন মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

বললে, আপনাকে ধরেছে? কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্যে?

—হাঁ।

নিজের কানকে শ্রী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আমি আপনাকে কি ভাবে রক্ষা করতে পারি?

—আপনি প্রেসিডেণ্ট হ'তে রাজি হ'লে আমি নিষ্কৃতি পেতে পারি।

—আপনার কি প্রেসিডেণ্ট হ'তে আপত্তি আছে?

—না। লজ্জা-সঙ্কোচের বালাইও আমার নেই।—নৃপেন নির্লজ্জ ভাবে হাসতে লাগলো।

—তবে? আমিই বা আপনার জায়গায় প্রেসিডেণ্ট হ'তে রাজি হব কেন, ওঁরাই বা আপনাকে নিষ্কৃতি দেবেন কেন?

নৃপেন সগর্বে বললে, দেবেন। কারণ যে গাড়িটা আমি কংগ্রেসকে দান করব বলেছি, আপনি প্রেসিডেণ্ট হ'লেও তা দোব। আর আপনি রাজি হবেন,—নৃপেন মধুর হাস্যের সঙ্গে বলতে লাগলো,—আমাকে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

—ঝামেলাটা কিসের? খবরের কাগজ ঠাট্টা করবে?

—না। কারণ বলেছি তো, লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই আমার নেই। তা-ছাড়া খবরের কাগজ যাতে ঠাট্টা না করে সে ব্যবস্থা ক'রেই আমি সভাপতি হব।

—তাহ'লে ঝামেলাটা কি?

—আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। কংগ্রেসের কাজে কিছু সময় তো দিতে হবে।

শ্রী হেসে বললে, তাতে আপনার ব্যবসার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। চারটে যদি ব্যবসা থাকে আপনার, তাহ'লে মনে করবেন এটা পঞ্চম।

নৃপেন ক্ষুণ্ণভাবে বললে, তাহ'লে আপনি আমাকে কোনো সাহায্যই করবেন না? ভুজঙ্গ করবে না জানতাম। তাই আজ তাকে ডাকিনি। ভরসা ছিল, আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই পাব।

ওর অভিমান দেখে শ্রী হেসে ফেললে। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললে, আমি তো আপনার সেবাই করছি নৃপেনবাবু। আমাকে আপনার most obedient maid-servant মনে করতে পারেন।

নৃপেন হেসে ফেললে। বললে, maid-servant কি servant শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ?

—হাঁ।—শ্রী হাসলে।

একটু থেমে কি যেন খানিকটা ভেবে নৃপেন বললে, জানেনই তো ব্যবসার ক্ষেত্রে সব সময় যে সাধু উপায় অবলম্বন করেছি তা তো নয়। ভবিষ্যতেও কত অসাধু উপায় প্রয়োজন হ'লে হয়তো অবলম্বন করতেও হবে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তা যদি করি, কংগ্রেসের সম্মান কি বাড়বে?

—কিন্তু সে আশঙ্কা আছে জেনেই তো কর্তারা আপনাকে ডাকছেন। সুতরাং কংগ্রেসের সুনাম এবং মর্যাদার দুশ্চিন্তা যদি কারও থাকে তাঁদেরই, আপনার নয়।

—সে কথা তাঁরাও বলছেন।

—বলছেন? তবে?

—তবু ভরসা পাচ্ছিনা।—নৃপেন হাসলে,—সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা কিনা। কবে বাল্যকালে বিপ্লবী দাদাদের এক-আধখানা চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেই জোরে কতদূর যাওয়া যেতে পারে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

ভরসা দিয়ে শ্রী বললে, বোঝবার কিছু দরকার নেই নৃপেনবাবু। আমি বলছি, যতদূর চাইবেন, ততদূর উঠতে পারবেন। একখানা বাড়িতে না হয়, আর একখানা বাড়ি দিন। ব্যস্।

নৃপেন বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিল। ওর কথা ঠিক শুনতে পেলে ব'লে বোধ হোল না। বললে, আপনি যদি সেক্রেটারীও হন, আমি খানিকটা বল পাই। হবেন?

শ্রী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো : বাঃ! বাড়ি দেবার বেলায় দেবেন কর্তাব্যক্তিদের, আর আমি হব বিনা-মাইনের সেক্রেটারী, না? চমৎকার!

নৃপেন হঠাৎ ওর চেয়ার থেকে উঠে শ্রীর চেয়ারের পাশে দাঁড়ালো। হেসে জিজ্ঞাসা করলে, নেবেন আপনি একটা বাড়ি?

তারপরে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে বললে, তোমাকে আমার অদেয় যে কিছুই নেই, এই সোজা কথাটা বুঝতে আর কত দেরি করবে?

ঘরের হাওয়া যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে অন্য ভোজনার্থীদের যে মৃদু গুঞ্জন উঠছিল, তাও। শ্রীর বুকের ভিতরটাও যেন বার কয়েক জোরে জোরে লাফ দিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভুজঙ্গ যখন শ্রীর ঘরে এলো 'মহিলা-মণ্ডল' সম্বন্ধে কি একটা কথা বলতে, শ্রী তখন সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে। ওর মুখে যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। ভুজঙ্গের আসা যেন টেরই পেলে না।

ভুজঙ্গ এক মুহূর্ত অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার শরীর কি ভালো নেই শ্রী?

—শরীর?—মানুষের কণ্ঠস্বরে শ্রী যেন চমকে উঠলো। সামলে নিয়ে বললে, ভালোই তো আছে।

আশ্চর্য হয়ে ভুজঙ্গ একটা চেয়ার টেনে বসলো। বললে, আমি আরও একবার এসেছিলাম। তুমি আসনি। তোমার বাড়িতে ফোনও করেছিলাম। শুভেন্দুবাবু বললেন, নৃপেন তোমায় নাকি লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি তো অবাক।

শ্রী খুব জোরে জোরে হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, সে এক কাণ্ড!

ভুজঙ্গ হেসে জিজ্ঞাসা করলে, বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা না ক'রে হোটেলে লাঞ্চ?

—তবে আর বলছি কি ! দশটার পরে খবর পেলেন, গবর্ণমেণ্টের যে কণ্ট্রাক্টের জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন গত ক'দিন ধ'রে, সেটা পেয়ে গেছেন। তখন আর বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করার সময় নেই। সুতরাং হোটেলেই নিমন্ত্রণ ক'রে বসলেন !

—আর কে ছিলেন ?

—আর কাউকে তো দেখলাম না।—শ্রীর কণ্ঠস্বর কিছু বিব্রত, কিছু কুণ্ঠিত।

ভুজঙ্গ সভয়ে বললে, সর্বনাশ ! ওর সঙ্গে একলা খেতে বসার বিপদ তো কম নয়।

শ্রী চমকে উঠলো : কেন, বিপদটা কি ?

ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে উঠলো : ও তো অনর্গল হাউ হাউ ক'রে বকবে ! ব্রততী ছাড়া আর কে ওকে সামলাতে পারে ?

এবারে শ্রীও আশ্বস্ত হয়ে হেসে উঠলো : যা বলেছ ! কথার আর শেষ নেই। তা যাই বল, ভদ্রলোকের শক্তির ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত।

—সত্যি। ওর পরিশ্রম করার শক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। অমানুষিক শক্তি,—বলতে পার, আসুরিক শক্তি। ও যেন একটা অটোম্যাটন,—মুহুর্মুহু দু'হাত বাড়াচ্ছে, মস্ত বড় থাবা দিয়ে যা পাচ্ছে ধরছে আর লোভের প্রশস্ত গহ্বরটার মধ্যে ফেলছে।

শ্রী যেন শিউরে উঠলো। বললে, ভয় করে !

—করবেই তো। হাসতে-হাসতে, কথা বলতে-বলতে হঠাৎ এক সময় যখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তখন ওর চোখ যেন কি রকম হয়ে যায়, দেখেছ ?

শ্রী কি যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিবে, চাইলে গা ছম ছম করে।

—হ্যাঁ।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

তারপর ভুজঙ্গ বললে, লাঞ্চ শেষ হয়েছে তো অনেকক্ষণ। এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

—সিনেমায়।

—সিনেমায়?—ভুজঙ্গ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি আবার সিনেমা যেতে আরম্ভ করলে কবে থেকে?

শ্রী অদ্ভুত একরকম হাসলো: নৃপেনবাবুর পাল্লায় পড়ে। তাঁকে 'না' বলে সাধ্য কার?

—তাই এত দেরি? আমি ভাবলাম,

ভুজঙ্গ কথাটা শেষ না ক'রেই ভাবতে বসলো।

শ্রী বললে, সেখান থেকে খদ্দরের দোকানে। নৃপেনবাবু খদ্দর কিনলেন এক গাদা।

—খদ্দর? নৃপেনবাবু?

—হ্যাঁ। তিনি বোধ হয়, আমাদের অঞ্চলের জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন।

ভুজঙ্গ স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তাহ'লে ব্রততী যা বলছিল তা মিথ্যে নয়।

—না।

দুজনেই অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে রইল।

তারপরে শ্রী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। হাঁই তুলে বললে, বড্ড ক্লান্তি বোধ করছি। বাড়ি যাব এবার। তুমি কিছু বলতে এসেছিলে ভুজঙ্গদা?

অন্যমনস্কভাবে ভুজঙ্গ বললে, এমন জরুরী কিছু নয়। কাল বললেই হবে।

—তাহ'লে আমি উঠি।

ব'লে টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট বের করলে।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কি ওটা?

—শাড়ি একখানা।

—কিনলে বুঝি?

—না, ঠিক আমি কিনলাম না। নৃপেনবাবু জোর করে গছিয়ে দিলেন। কি অন্যায় বলতো?

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, ও ওই রকমই। সবেতেই জবরদস্তি। কিন্তু তোমাকে যেন বড্ড অসুস্থ বোধ হচ্ছে শ্রী। দাঁড়াও আমি ড্রাইভারকে ব'লে দিই, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক বরং।

পঁচিশ

ন'কড়িদের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ব্যবস্থাটা ঠিক যে কি, চাকরীটা কোথায় এবং কি তাদের করতে হবে তা অবশ্য বোঝা গেল না। নৃপেনের কোনো কাজ বোঝা যায়ও না। কিন্তু মোটামুটি দাঁড়ালো এই যে, কংগ্রেসের জন্যে যে বাড়িটা নৃপেন দান করেছে তারই তেতলায ওরা থাকবে এবং নৃপেনেব কাছ থেকে প্রত্যেকে মাসে একশো টাকা মাসোহাবা পাবে।

এতে ওবা খুশিই হয়েছে। এর আগে যখন ওরা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিল, তখন সব দিন খাওযা হোত না। যে দিন হোত, নিজেরা রেঁধে খেতে হোত। নিজেবা যেদিন বাঁধবার সময় পেত না, সেদিন যে রকম পয়সা থাকতো সেই বকম হিসাবে 'পাইস হোটেলে' খেযে আসত। পয়সাটা হাতে কখনও পেত না। পেলেও অল্পক্ষণের জন্যে,—এক হাত থেকে নিযে আর এক হাতে দিযে আসতে হোত।

আর এ ব্যবস্থায প্রত্যেকে ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম পেয়ে গেছে। মাস শেষ হযে গেলেই বাকি পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাবে। এতগুলো টাকা একসঙ্গে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বে এর আগে কখনও তারা পায়নি।

একটা চাকর রেখেছে। সেই রাঁধেও বাসনও মাজে, অন্যান্য ঘরের কাজও কবে। তার মাইনে তাবাই দেয। সুতরাং সে একান্ত ক'বে তাদেরই ভৃত্য। মনিবানা করার এত বড় অধিকার এর আগে তাদের হাতে কখনও আসেনি। সুতবাং এতে ক'বে তাদের মানবমনের প্রভুত্ববোধ পরিতৃপ্ত হযেছে।

কিন্তু কাজ কিছু নেই।

সকালে চা-পানের পর নিচে কংগ্রেস অফিসে বসে। খবরের কাগজ পড়ে, রাজনৈতিক তর্ক করে এবং বাইরে থেকে যারা কোনো প্রয়োজনে আসে, তাদের উপর মাতব্বরী করে। দুপুরে স্নানাহারের পর লম্বা ঘুম। বিকেলে চা-পানের পর আবার কংগ্রেস অফিস, কংগ্রেসের কর্তা ব্যক্তিদের তোয়াজ এবং নৃপেন যেদিন আসে সেদিন ছুটোছুটি, ব্যস্ততা।

সন্ধ্যার পরে সপ্তাহে দু'দিন সিনেমাও যায়। নইলে নিতান্ত একঘেয়ে বোধ হয়। সিনেমাটা ক্রমশঃ নেশার মতো পেয়ে বসছে, এটা মাঝে মাঝে উপলব্ধি করে। কিন্তু কাজ না থাকলে করবেই বা কি!

আগে বিড়ি খেত, তারও পয়সা সব সময় জুটতো না। এখন সিগারেট ধরেছে।

কিন্তু নিষ্কর্ম জীবন, মাঝে মাঝে বিরক্তিও বোধ করে। কিছু যেন ভালো লাগে না। এক একদিন বাধ্য হয়ে নৃপেনকে নিরিবিলি পেলে বলেও সেকথা। নৃপেন হো হো ক'রে হাসে। বলে, ব্যস্ত কি! আসছে কাজ,—এমন কাজ আসবে যে, তখন আর দম ফেলবার ফুরসুৎ পাবে না। আজীবন খাটলে দেশের জন্যে, দু'দিন বিশ্রামই নাও না।

ওরা আর কিছু বলতে সাহস পায় না। দু'দিন বিশ্রামই নেয়, আর প্রতীক্ষা করে সেই দিনের জন্যে যেদিন কাজের চাপে দম ফেলবার ফুরসুৎ পাবে না।

এক একদিন নৃপেন ওদের ঘরে আসে। দেখে, ওদের খাওয়া-দাওয়া কি রকম হচ্ছে। ওদের আম-কাঠের তক্তাপোষে ব'সে ওদের সঙ্গে গল্প করে,—নিতান্ত ঘরোয়া ছোটখাটো সুখ-দুঃখের গল্প। ওদের গ্রামের কথা, কংগ্রেসের কাজ-কর্মের কথা, কারাজীবনের ইতিবৃত্ত,—এমনি কত কি। কোনো কোনোদিন ওদের জন্যে গঙ্গার ইলিশ নিয়ে আসে, নয়তো দুষ্প্রাপ্য কোনো মিষ্টি। মাঝে মাঝে কাপড়-জামা অথবা জুতো ময়লা দেখলে তিরস্কারও করে।

এমনি ক'রে পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে।

দিন যায়। পল্লীর সরল বালকের দল ধীরে ধীরে চালাক হয়। কিছুদিন আগে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের দৃষ্টির অন্তরালে কোনো নির্জন ঘরের

এক কোণে ভীত মেষশাবকের মতো জড়সড় হয়ে যারা ব'সে থাকতো, কথার চটকে এবং বেশের পারিপাট্যে তাদের বর্তমান পরিবর্তনকে সে তুলনায় অপ্রত্যাশিত বলা চলে। এই পরিবর্তন দেখে ভুজঙ্গ এবং শ্রী নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করে, কিন্তু প্রকাশ্যে ওদের কিছু বলে না।

ওরাও এখন বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে শ্রী কিংবা ভুজঙ্গকে এড়িয়েই চলে। ওদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা এখন বিশেষ ক'রে নৃপেনের সঙ্গে এবং সাধারণভাবে কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের সেই সব কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যাঁদের কংগ্রেস অফিসে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে হয়।

সেদিন গান্ধীজির জন্মতিথি।

ওদের কংগ্রেস অফিসে সমারোহ কাণ্ড। অফিসের সামনের ফটক পুষ্পে, পত্রে, মঙ্গল ঘটে সাজানো। মাথার উপর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো, কালো মখমলের উপর সূচে তোলা গান্ধীজির একখানি আবক্ষ প্রতিমূর্তি। তার চারিদিকে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাল্‌ব। এখনও জলেনি, সন্ধ্যার পরে সেগুলি মালার মতো ঘুরে-ঘুরে জ্বলবে। গান্ধীজির মাথার উপর আবার একটা লাউড স্পীকার। ভিতরে বক্তৃতা আরম্ভ হোলে রাস্তার লোকেরাও তার সাহায্যে সেই সব মূল্যবান বক্তৃতা শুনতে পাবে।

ভুজঙ্গের এই উৎসবে যোগদানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। যাঁকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে, তাঁকে নিয়ে কোনো উৎসব হোলে তাতে সে বড় একটা যোগদান করে না। তাঁকে নিয়ে জনতার ভিড় সে সহ্যই করতে পারে না। গান্ধীজির জন্মতিথি তার উপবাস এবং প্রার্থনার দিন। কিন্তু জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হিসাবে নৃপেন এবং সম্পাদিকা হিসাবে শ্রী তাকে আসবার জন্যে এতবার টেলিফোন করেছে যে, শেষ পর্যন্ত তাকে আসতেই হোল।

এ বাড়িটায় সে এতদিনের মধ্যে একবারও আসতে পারেনি। তার অফিসের গাড়িখানা যখন এইখানে এসে দাঁড়াল, তখন প্রথমটা সে চমকে উঠল : এ কার বিয়ে-বাড়িতে ড্রাইভারটা ভুলে নিয়ে এলো তাকে!

কিন্তু তখনই খেয়াল হোল, এটা বিয়ে-বাড়ি নয়। গেটের মাথায় গান্ধীজির ছবি। বাড়ির মাথায় জাতীয় পতাকা। রাস্তার ওধারে কতকগুলো এঁটো পাতা তখনও পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু সে বিয়ে-বাড়ির খাওয়ানো নয়, বোধ হয় গান্ধীজির জন্মতিথি উপলক্ষে কাঙালী-ভোজন করানো হয়ে থাকবে। এবং সব চেয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ, গাড়ি থেকে নেমে এক-পা এগুতেই সামনে সিঁড়ির মাথায় নৃপেন এবং শ্রীকে দেখা গেল। নৃপেনকে খদ্দরের পোষাকে কেন, বাঙালী পোষাকেই ভুজঙ্গ কিছুকালের মধ্যে দেখেছে ব'লে মনে করতে পারলে না। পরণে মিহি খদ্দরের কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলা-করা মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপর কোঁচানো চাদর, মাথায় খদ্দরের টুপি।

ভুজঙ্গকে বলতে হোল, চমৎকার মানিয়েছে হে তোমাকে!

নৃপেন লজ্জা পাবার ছেলে নয়, লজ্জা পায় না। হেসে ওর করমর্দন করলে।

শ্রী বললে, যাক, তুমি যে আসবে ভুজঙ্গদা, আমি আর ভরসা করতে পারছিলাম না।

—কেন, খুব বেশি দেরি হয়েছে কি?

—দেরির জন্যে নয়।

—তবে?

শ্রী হেসে বললে, তোমার কাণ্ড জানি তো। শেষ পর্যন্ত ব'লে বসবে, দূর কোথায় যাব আর, থাকগে!

ভুজঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিলে। একটু হাসলে।

শ্রীর পরণে একখানা, কোথাকার কে জানে, মূল্যবান খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি। ডান হাতে দু'গাছা সোনার সরু চুড়ি, কিন্তু আঙুলের মস্ত বড় হীরার আংটিটা চোখে পড়েই। বাঁ হাতে চুড়ি নেই, শুধু একটা ছোট্ট রিষ্টওয়াচ। ভুজঙ্গ রিষ্টওয়াচের দাম জানে না। কিন্তু যে পরিবেশে ওটি রয়েছে, তাতে অল্প দামের ব'লে সে মনে করতে পারলে না। সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীর কেশের পারিপাট্য এবং মুখের পেন্ট।

সে দৃষ্টিতে শ্রী লজ্জা পেলে। সলজ্জ হাস্যে বললে, কি দেখছ?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তোমাকে। আর তোমার মারফৎ তোমার জেলা কংগ্রেসকে।

—দেখে কি মনে হচ্ছে?

—ঠিক দেবীর রাণীগিরি ব'লে মনে হচ্ছে না।

শ্রী রেগে বললে, সে তোমার চোখের দোষ।

—তাও হ'তে পারে। তোমার 'মহিলা-বিভাগ' নিয়ে কি কিছু ভুল-চুক হয়েছিল?

—কি ভুল-চুক? জানি না তো।

—কাল অনেক রাত্রে তুমি অফিসেই ফিরে এসেছিলে শুনলাম। ভাবলাম, কিছু ভুল-চুক হয়েছিল বুঝি।

শ্রী এবারে হেসে ফেললে। বললে, না, ভুল-চুক নয়। এই উৎসবের আয়োজন করতে কাল একটা হয়ে গেল। অত রাত্রে বাড়ি ফিরে কাউকে ডাকাডাকি করতে ইচ্ছা হোল না। অফিসের টেবিলেই, বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম।

—কষ্ট হয়েছে তো, কাঠের টেবিলের উপর শুতে। বাড়ি ফিরলেই ভালো করতে।

—এমন তো কত রাত্রি খোলা আকাশের নিচে শক্ত মাটির উপর কেটেছে ভুজঙ্গদা। তখন তো বাড়ি ফেরার কথা বলোনি।

—না। কারণ সে-রাত্রি আর এ-রাত্রি এক নয়।

ব'লেই ভুজঙ্গ একেবারে পিছন ফিরে দ্রুতপদে সভা-গৃহের দিকে চ'লে গেল।

শ্রী স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ওর চ'লে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। যখন ও সভাগৃহের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল তখনও। তারপরে পাশে নৃপেনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলে নৃপেন মিটি-মিটি হাসছে।

—শুনলে?

—শুনলাম বই কি!

—আমি বাড়ি ফিরতেই চেয়েছিলাম। তুমিই ফিরতে দিলে না।

—ঠিকই করেছিলাম শ্রী।

—কিন্তু তুমি নিজে বাড়ি ফিরেছিলে।

—হ্যাঁ। কারণ, ভুজঙ্গের ভাষায়, অত রাত্রে আমার বাড়ি-ফেরা আব তোমাব বাড়ি-ফেরা এক নয়।

কযেকজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। নৃপেন তাঁদের সম্বর্ধনা জানালে। শ্রী বোধ হয় অভ্যাসবশে একটু হাসলে। কিন্তু সে এতই অন্যমনস্কভাবে যে, নিজেই জানতে পারলে না, সে কি ভাবে সম্বর্ধনা জানালে।

তাঁরা চলে গেলে, শ্রীর দৃষ্টি তার হীরার আংটিটার উপর পড়লো।

চুপি চুপি নৃপেনকে বললে, স্বভাবতই উনি উদাসীন লোক। কোনো কিছুর উপব সহজে ওঁর দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু আজ সকালে এই আংটিটাব দিকে একবার উনি চাইলেন। এমন লজ্জা করলো!

অবিচলিত কণ্ঠে নৃপেন উত্তর দিলে, বোঝা যাচ্ছে ওটা আসল হীবে, উদাসীনেব দৃষ্টিও আকর্ষণ কবে। কিন্তু ওসব কথা থাক শ্রী, সভাপতি আসছেন।

ব্যাণ্ডে বেজে উঠেছে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'। ওরা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। স্বেচ্ছাসেবকেরা 'গার্ড অফ অনার' দিলে। সসম্মানে নৃপেন ও শ্রী মাননীব সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে উপরে নিয়ে এল।

সভা শেষ হ'তে রাত্রি আটটা হোল।

স্বয়ং প্রদেশপাল সভাপতি। প্রধান অতিথি (পূর্বে স্যাব, বর্তমানে শ্রী) হাজারিমল গুটগুটিয়া। উভয়েই খ্যাতনামা। বিশেষ গুটগুটিয়াজি যুদ্ধেব বাজারে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। প্রার্থীকে কদাচিৎ তিনি নিরাশ করেন। কলিকাতা শহবে এমন প্রতিষ্ঠান নেই যা তাঁর দানের স্পর্শ পায়নি। যারা ধর্মঘট করে, আর যারা ধর্মঘট ভাঙে উভয়েই তাঁব সমান স্নেহের পাত্র। কংগ্রেসের আদর্শ ও ঐতিহ্য, মহাত্মাজি এবং তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের কথা

বিবৃত করে সকলকে তিনি মহাত্মাজির সরল ও সাধু জীবনাদর্শ ও ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন।

ভুজঙ্গ অনেক আগেই উঠে গেছে। অফিসে তার অনেক কাজ প'ড়ে আছে। ঘুমে শ্রীরও চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু সম্পাদিকার পালাবার পথ নেই। বিশেষ এর পরে বিরাট জলযোগের ব্যবস্থা আছে। তার সমস্ত ব্যয় প্রধান অতিথি বহন করেছেন। সেই সমস্ত শেষ করতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল।

নৃপেন বললে, মাথাটা কেমন করছে। চল, মাঠ দিয়ে একটু ঘুরে আসি।

মাথাটা শ্রীরও কেমন করছিল। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি এসেছিল ঘুম। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল, সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়ছিল।

বললে, আজ থাক নৃপেনবাবু। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

এত শীঘ্র বাড়ি ফেরা নৃপেনের কোষ্ঠিতে লেখা নেই,—আগের রাত্রে ঘুম হোক বা না হোক। কিন্তু শ্রীর পরিশ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে পীড়াপীড়ি করলে না। বললে, তাই চল।

দরজা খোলাই ছিল। শ্রী শোবার ঘরে আলো জ্বাললে। ঘরে কেউ নেই। পাশের ঘরও অন্ধকার। বাইরের বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখলে, শুভেন্দু তারই এক কোণে টেবল-ল্যাম্প জেলে একটা টিপয়ের উপর লিখছে।

শ্রী ওর কাছে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

শুভেন্দু অন্যমনস্কভাবে একবার ওর দিকে চেয়েই আবার লেখায় মন দিলে।

—খেয়েছ ?—শ্রী জিজ্ঞাসা করলে।

শুভেন্দু লিখতে-লিখতেই একবার বললে হ্যাঁ, আবার বললে না, শেষে কলমটা রেখে ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, রাত কি বেশি হয়েছে ?

—দশটা বাজে।

—তুমি খেয়ে এসেছ ?

—না।

—তাহ'লে চল, বাবাজীবন কি রেঁধেছেন দেখিগে।

খাতা-বই বন্ধ ক'রে শুভেন্দু উঠলো। বললে, আমি ভেবেছিলাম তুমি খেয়ে আসবে।

শ্রী সভয়ে বললে, সর্বনাশ! বাবাজীবন তাহ'লে আমার জন্যে রান্না করেনি নাকি?

—না। অত বুদ্ধি তার হবে ব'লে বোধ হয় না। চলো তো।

চলতে চলতে শুভেন্দু বললে, মহাত্মাজির জন্মদিনে তাঁর ভক্তদের জন্যে খানা-পিনার ব্যবস্থা ছিল না?

—ছিল বই কি। বিরাট আয়োজন।

—তাহ'লে?

—কি তাহ'লে? আমি খেয়ে আসিনি কেন?—অপূর্ব মোহিনী ভঙ্গিতে শ্রী টিপে-টিপে হাসতে-হাসতে বললে, যদি বলি খেয়াল হয়নি, ভুলে গিয়েছিলাম?

শুভেন্দু হেসে জবাব দিলে, তাহ'লে বলব, কংগ্রেস ছেড়ে দাও। দিয়ে মহারাজ প্রিয়দর্শীর গবেষণাটা শেষ কর। সত্যি খেয়ে আসনি?

—সত্যি। খাওয়া দেখলেই বুঝতে পারবে।

তাই বটে। মনে হোল শ্রী যেন কতদিন খায়নি। চাকরটার রান্না সেই আধ-পোড়া আধসিদ্ধগুলো দিয়েই শ্রী ভাতগুলো যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। হঠাৎ এক সময় শুভেন্দুর দৃষ্টি পড়লো, শ্রীর আঙুলে সেই হীরার আংটিটা নেই।

জিজ্ঞাসা করলে, আজ সকালে তোমার আঙুলে একটা হীরের আংটি দেখেছিলাম যেন। সেটা দেখছি না তো।

আহারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই শ্রী সংক্ষেপে উত্তর দিলে, না।

—কি হোল?

—যার আংটি তাকে দিয়ে দিয়েছি।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভেন্দু চেয়ে ছিল। তেমনিভাবে চেয়ে থেকেই বললে, দামী আংটি। যার-তার নয়। তোমার হাতে এলো কি ক'রে?

নিস্পৃহভাবে শ্রী জবাব দিলে, এসে গিয়েছিল।

শুভেন্দু আর প্রশ্ন করলে না। উভয়েরই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে নিজের-নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। রাত তখন ক'টা হবে কে জানে, বারোটা হ'তে পারে, একটাও হ'তে পারে,—হঠাৎ শ্রীর ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলে :

হ্যালো। ···হ্যাঁ আমি, কথা বলছি। ···কিছু হারিয়েছে ব'লে মনে করতে পারছিনা তো। ···সত্যি পারছিনা নৃপেনবাবু। ···কি জিনিষ? ···আংটি? ···তা জানি না তো। ···তা হ'তে পারে। আশ্চর্য নয়। রাস্তা তো ওর চেনা। ···কি রকম আবার কি? শোনো, (চুপি-চুপি) রাস্তা চেনা। পকেট থেকে একদিন আঙুলে এসেছিল, আঙুল থেকে আবার পকেটেই ফিরে গেছে। আশ্চর্য নয়। ···জানি না যাও। এতক্ষণে ফিরলে বুঝি? ···আচ্ছা, খুব হয়েছে! এখন ঘুমোও গে যাও।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে শ্রী বিছানায় গেল। নৃপেনকে সে ঘুমিয়ে পড়বার হুকুম দিলে। কিন্তু নিজে কখন ঘুমুবে কে জানে!

ছাব্বিশ

বিপিনকে নিয়ে ব্রততীর মহা মুস্কিল হয়েছে।

এম-এ পড়তে পড়তে কী যে তার হয়েছে, মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পাঁচ-সাত দিন পরে যখন সে ফেরে তাকে আর চেনা যায় না। জামা-কাপড় ময়লা, মাথার চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে, চোখে কালি পড়েছে। কোথায় গিয়েছিল,—নরম-গরম কোনোভাবে প্রশ্ন ক'রেই তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

নৃপেন তার সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ করেছে! ব্রততীর মারফৎ জিজ্ঞাসা করে, এম-এ পড়তে যদি তার ভালো নাই লাগে, তাহ'লে পড়া ছেড়ে দিয়ে দাদার একটা ব্যবসা দেখুক।

বিপিন হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। নিতান্ত চাপাচাপি করলে বলে, দাদার ব্যবসা দেখা তার কাজ নয়। ব্যবসার সে বোঝে কি?

ব্রততী ভরসা দেয়, একদিনেই কি কেউ বুঝতে পারে? যেতে-যেতেই বুঝবে?

বিপিন বলে, এম-এ'টা দিই তো আগে।

—দেবে কী ক'রে। কলেজ কামাই ক'বে পালিয়ে-পালিযে বেড়ালে কি পরীক্ষা দেওয়া যায়? এম-এ পাশ করা কি এতই সোজা।

তাব হাত থেকে পবিত্রাণেব আশায বিপিন জবাব দেয়, আর পালাব না।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ।

কিন্তু আবাব সে পালায। আবাব নৃপেন কথা বন্ধ করে। আবাব সেই একই উত্তব।

রেগে-মেগে নৃপেন একদিন বললে, ওর বিয়ে-থা দিয়ে দাও। নইলে ঘবে মন বসবে না।

ব্রততী তাড়াতাড়ি বললে, না, না। ঠাকুবপো তেমন ছেলে নয়। বিয়ে-থা নয়, অন্য কিছু হযেছে। খবব নাও ভালো ক'বে।

—হবে আবাব কি!

—জানবই যদি তাহলে আব তোমাকে খবব নিতে বলব কেন?—বেগে ব্রততী জবাব দিলে।

তারই হযেছে মুস্কিল। বিপিন একেবাবে নিস্তব্ধ, নৃপেন বেগেই তাব কর্তব্য শেষ কবে। ব্রততী নিবর্থক ওদের দুজনেব মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মবে। বিপিনকে বুঝতে না পেবে, তাব কথা ভেবে ব্রততী কিছুতে আব স্বস্তি পায় না।

যদি সে খাবাপ ছেলে হোত, যদি বুঝতো তাব পড়াশুনা ভালো লাগছে না, তাহলে তার উড়ে উড়ে বেড়ানোর একটা হেতু সে পেত। কিন্তু তা তো নয। বিশ্ববিদ্যালযেব রত্ন না হোলেও বিপিন লেখাপড়ায় খাবাপ ছেলে নয়। পড়াশুনা করতে সে ভালোই বাসে। তার বন্ধুবান্ধবেব যে-ক'টিকে ব্রততী জানে, তারা সবাই স্বল্পভাষী শান্তস্বভাব। সুতবাং নৃপেন যাই বলুক, বিপিনের

সম্বন্ধে কোনো মন্দ ধারণা ব্রততীর মনের কোণেও ঠাঁই পায় না। অথচ, কেন বিপিন মাঝে মাঝে পালায়, কোথায় যায়, কি করে তারও কোনো হদিস সে খুঁজে পায় না।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন নৃপেন অসময়ে সিঁড়ি থেকে চিৎকার করতে করতে উপরে উঠতে লাগলো।

তখন আড়াইটা।

এ সময়ে নৃপেনের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। যুদ্ধ বন্ধ হবার পর নৃপেনের তরকারীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে সকালেই আর সে বেরিয়ে যায় না। কিন্তু ন'টার পরে আর এক মিনিটও সে থাকে না। দুপুরে অধিকাংশ দিন তার লাঞ্চ অফিসেই পাঠানো হয়। কচিৎ কোন দিন নিজেও খেতে আসে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফের চ'লে যায়। আজকে তার লাঞ্চ অফিসেই গেছে। সুতরাং এখন সে এলো কেন? অত কী চেঁচাচ্ছে সে!

সম্প্রতি মদ্যপানটা তার অসম্ভব বেড়েছে। দিন রাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে অপ্রকৃতিস্থ থাকে। সুতরাং আবার কী গণ্ডগোল কোথায় বাধালে ভেবে উদ্বিগ্ন চিত্তেই ব্রততী শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

দোতলার বারান্দার দু'ধাপ নিচের সিঁড়িতে নৃপেন তখন চেঁচাচ্ছে: বিপিন,—বিপিন কোথায়,—তোমার আদরের দেওর? কোথায়?

নৃপেন যে প্রকৃতিস্থ নয়, তা তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছিল। তথাপি বিপিনের প্রসঙ্গ প্রশ্নটার মধ্যে নিহিত ব'লে সে ঠিক নিশ্চিন্তও হ'তে পারছিল না। বারান্দায় উঠে নৃপেন প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে সে বললে, কেন? কলেজে গেছে।

—কলেজ? কোন কলেজে শুনি? আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কি আজকাল এম-এ পড়ানো হচ্ছে?

জেলের নাম শুনে ব্রততীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিম ঝিম ক'রে উঠলো। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, কী আবোল তাবোল বকছ? ঠাকুর পো তো কলেজে। দশটার সময় খেয়ে দেয়ে বই নিয়ে বেরিয়েছে।

নৃপেনের পা টলছিল হাতের কাছের ঈজি চেয়ারটায় ধুম ক'রে ব'সে বললে, তাহ'লে কলেজ অবধি আর বোধ হয় সে পৌঁছুতে পারেনি। পাখাটা খুলে দাও।

ব্রততী তাড়াতাড়ি পাখাটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে কি? পৌঁছুতে পারেনি তো কোথায় গেল?

—জেলে।

—সে আবার কি? জেলে যাবে কেন?

—পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে। হোম-মিনিষ্টার একটু আগে আমাকে টেলিফোনে খবরটা দিলেন।

ব্রততী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এতক্ষণে বিপিনের রহস্য তার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হোল। দলের কাজেই সে মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালাতো। এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও সে-খবর সে পায়নি, কিন্তু পুলিসে পেয়েছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

নৃপেন বললে, বাড়িও তারা খানাতল্লাসী করত। কিন্তু আমার বাড়ি ব'লেই তা আর করেনি। ক'দিন ধ'রেই পুলিশ ওকে অনুসরণ করছিল। আজকে সুযোগ পেয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

ব্রততী সাড়া দিলে না। ভাবতে লাগলো। কি যে ভাবতে লাগলো তা সেও জানে না। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবে?

—করতে বল।

চাকরটাকে চায়ের জল গরম করতে ব'লে ব্রততী ফিরে এসে অদূরে একটা চেয়ারে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলে, তাকে কি কোনো বিশেষ অপরাধে ধরেছে? তার কি বিচার হবে?

—না বোধ হয়। হোম-মিনিষ্টার আমাকে যেন বললেন, জন-নিরাপত্তা না কি একটা আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন কি করা যায় বল?

—কি করা যেতে পারে জানি না তো।

—সবই করা যেতে পারে। বলো যদি, ছাড়িয়েও আনতে পারি।

ব্রততী ছাড়িয়ে আনার কথায় যেন লাফিয়ে উঠলো: আমি বলব তবে ছাড়িয়ে আনবে? তোমার না ভাই? তোমার নিজের কোনো আগ্রহ নেই?

—আছে। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে আনার একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব নেবার সামর্থ্য আমার নেই।

ব্রততী হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আমার আছে?

—থাকতে পারে। তোমার কথা সে শোনে। তুমি যদি দায়িত্ব নাও, আমি এখানে থেকে ফোন ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে তোমার কাছে আনিয়ে দিতে পারি।

ব্রততীর মনটা উসখুস করতে লাগলো। তবু প্রাণপণ বলে সে নিজেকে সংবরণ করলে। গম্ভীরভাবে বললে, তুমি বুদ্ধিমান। বিপিন তোমার সহোদর। ছেলেবেলা থেকে তার প্রকৃতি তুমি জানো।

—জানি।

—জানো যে, সে তুমি নয়। রাজনীতি তার কাছে ভাগ্যান্বেষণের পথমাত্র নয়, - তার জীবনাদর্শ, তার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

—তাও মানি।

—তারপরেও তার দায়িত্ব সে ছাড়া আর কেউ নিতে পারে ব'লে মনে কর? আমি তার জামিন হ'তে পারি, তার বিনিময়ে জেলে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাকে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট করব, এ দায়িত্ব, তুমি স্বামী, তোমার কাছে কি সাহসে নিই বলো?

নৃপেন ভাবতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে বললে, তাহ'লে সে কি জেলেই পচবে?

এ প্রশ্নের ব্রততী জবাব দিলে না।

সন্ধ্যার পরে ভুজঙ্গ এল। ব্রততী তাকে টেলিফোন করেছিল আসবার জন্যে।

সহাস্যে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, এমন জরুরী তলব কেন বলো তো?

প্রশ্নের ভঙ্গীতে ব্রততী হাসলে না। তার মন একটা দুস্তর অনিশ্চয়তার মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে। বললে, বড় বিপদে প'ড়েই ডেকেছি দাদা।

মুখ-চোখের ভাব দেখে ভুজঙ্গ উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

—ঠাকুরপোর কথা শুনেছেন তো?

—বিপিনের? কি কথা?

—আজ দুপুরে তাকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে।

—পুলিশে? কেন?

—সে নাকি কমিউনিষ্ট।

ভুজঙ্গ স্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইল। তারপর আপন মনেই হাসলে।

—হাসছেন?—ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে।

—কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা জিগ্যেস করব?

—করুন।

—নৃপেন যেমন কংগ্রেসী, ও তেমনি কমিউনিষ্ট নয় তো? এমনও দেখেছি কি না, এক ভাই কংগ্রেসী, এক ভাই হিন্দুমহাসভাপন্থী, এক ভাই কমিউনিষ্ট। যেদিক থেকে যা আসে। তেমন নয় তো?

এবারে ব্রততীও হেসে ফেললে। বললে, বিপিনকে যতদূর জানি, তাতে তেমন তো মনে হয় না।

ভুজঙ্গ বললে, বিপিনকে যতদূর জানি, তাতে আমারও মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে সমস্যা তো খুব সহজ হয়ে গেল ব্রততী।

—কেন?

—কারণ, এ ব্যাপারে তোমার, আমার কিংবা কারও আর করবার কিছু রইলো না।

—উনি বলছিলেন, ওর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেউ দায়িত্ব নিলে উনি এখনই ছাড় করিয়ে দিতে পারেন।

—কে দায়িত্ব নেবে?

—আপনি পারেন না? আপনাকে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন না যে, যে-পথে ও চলেছে সেটা ভুল?

ভুজঙ্গ অনেকক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগলো। কোনো জবাব দিলে না।

—কি ভাবছেন?—ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে।

—চেষ্টা করতে পারি ব্রততী। কমিউনিজমে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো,

ভুজঙ্গ আবার থামলে।

—কি মুস্কিল হয়েছে?—একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে।

ভুজঙ্গ বললে, শাসনভার হাতে পেয়ে কংগ্রেস যে-পথে চলেছে, তাতে কাউকে বোঝাবার জোর আর পাই না।

ব্রততী নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলো।

—কংগ্রেস তার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিলাসে গা ভাসিয়েছে। ভিড় জমিয়েছে পুঁজিপতিরা। যদি বলি, তাদেরই ইঙ্গিতে আজ রাষ্ট্রতরণী চলছে, তাহ'লে খুব বাড়িয়ে বলছি বলতে পারো না। ব্রততী, কাকে কি বোঝাব? কংগ্রেস আর ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করছে না। চুপ ক'রে ব'সে থাকা তো তাদের ধর্ম নয়। কী করবে তারা, কোথায় যাবে, বলতে পারো?

—কিন্তু আপনি কংগ্রেসের একজন নেতা। আপনি কি অবাধে কংগ্রেসকে ভেসে যেতে দেবেন? আপনার কি এ বিষয়ে কোনো কর্তব্য নেই?

—আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা যে কী, খুঁজে পাচ্ছি না। চেষ্টা করছি। যদি পাই খুঁজে তাহ'লে বিপিনের ভার নোব, তার আগে নয়।

দু'জনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

এমন সময় চাকর এসে চুপি চুপি ব্রততীকে জানালে: ছোটবাবু তাঁর পড়ার ঘরে ব'সে রয়েছেন।

ব্রততী চমকে উঠলো: কে ছোটবাবু? কাদের ছোটবাবু?

—আমাদের ছোটবাবু।

—ঠাকুরপো!

এবং ব্রততীর সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গও চিৎকার ক'রে উঠলো: বিপিন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ডেকে নিয়ে আয়, ডেকে নিয়ে আয়।—বলতে বলতে ব্রততী নিজেই ডেকে আনবার জন্যে ছুটলো এবং মিনিটকয়েকের মধ্যে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ভুজঙ্গের সামনে হাজির করলো।

বিপিন হাসতে হাসতে পাশের একটা চেয়ারে বসলো। দুই হাত ঘষতে ঘষতে অস্বস্তির সঙ্গে বললে, দেখুন দেখি কাণ্ড!

কিন্তু সে সম্বন্ধে ভুজঙ্গ অথবা ব্রততী কারও কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বললে, একটু চা খাওয়াবেন বৌদি? মগে ক'রে চা ব'লে কি একটা যে দিলে আমি মুখেই ঠেকাতে পারলাম না।

ব'লে আবার হাসতে লাগলো।

ওর সাহস দেখে ব্রততী অবাক হয়ে গেল। সংকোচ ব'লে আর যেন ওর কিছুই নেই। আগে-আগে নিরুদ্দেশ থেকে যখন ও ফিরতো, কত ভয়, কত লজ্জা, কত সংকোচ। এবারে আর যেন তার চিহ্ন নেই।

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, প্রথম প্রথম তাই হয়। এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে না এলে শেষে ওই চা-ই অমৃত ব'লে বোধ হোত।

—পালিয়ে এলাম! আমি পালিয়ে তো আসিনি ভুজঙ্গদা। থাকবোই তো ভেবেছিলাম। মনকে সেজন্যে তৈরিও করেছিলাম। কিন্তু থাকতে দিলে না তো!

—বলো কি!

—তাই। আপনার মতো আমিও অবাক হয়ে ভাবছি, কেন থাকতে দিলে না।

সমস্ত জীবনে ভুজঙ্গ এতবার জেলে গেছে যে, এ ব্যাপারে তাকে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। এবং যদিও ইংরেজ রাজত্ব আর নেই, কিন্তু পুলিশে ও জেল বিভাগে সেই একই কর্মচারীর দল একই কাঠামোর মধ্যে এখনও কাজ করছে। সুতরাং সে বিপিনের কথা শোনামাত্র বুঝেছে, এর মধ্যে প্রভাবশালী বাইরের লোকের হাত আছে। এবং নৃপেনই যে সেই প্রভাবশালী বাইরের লোক, তাতেও তার সন্দেহ নেই। কিন্তু তা আর সে বিপিনের কাছে প্রকাশ ক'রে বললে না।

প্রকাশ্যে পরিহাস ক'রে বললে, তোমাকে বোধ হয় তাদের পছন্দ হোল না।

বিপিনও জবাব দিলে, বোধ হয়। কিন্তু বার বার দু'বার। প্রথম বারে ইলিশিয়ম রো পর্যন্ত নিয়ে গিযে ছেড়ে দেয়। এবারে জেলের ফটক পর্যন্ত বলা যায়। তৃতীয় বারে আর অপছন্দ করবে না আশা করি।

ব্রততী রেগে উঠলো: তৃতীয়বারও তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিলে?

বিপিন হেসে চাইলে ভুজঙ্গের দিকে: আপনি নিশ্চয় বৌদির মতো রাগ করবেন না।

ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বললে, রাগ করাই তো স্বাভাবিক বিপিন।

—স্বাভাবিক কেন? আপনাদের গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছি ব'লে?

—হ্যাঁ। আরও অনেক কারণের মধ্যে ওটাও একটা কারণ নিশ্চয়ই।

বিপিন হেসে জবাব দিলে, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানে আমার দাদা সভাপতি, দুর্নীতি যে গবর্ণমেণ্টকে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে, মধুর লোভে ভাগ্যান্বেষীর যেখানে ভিড় জমে গেছে,—আমাকে তালাবদ্ধ ক'রে আটকে রেখেই কি তাকে বাঁচাতে পারবেন?

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বললে, এর জবাব আজ দিতে পারলাম না ভাই। কিন্তু জবাব একটা আছেই। সময় অনুকূল হোলে তাও একদিন দোব।

—তাই দেবেন। ততদিন কিন্তু আমাকে গালাগালি দেবেন না, এইটুকুই অনুরোধ।

ভুজঙ্গ বললে, না বিপিন, তোমাকে গালাগালিও দোব না, আশীর্বাদও করব না। কিন্তু আজকে আমার অনেক কাজ। উঠি ব্রততী। অন্য এক সময় এসে বরং আলোচনা করা যাবে।

ভুজঙ্গ মন্থরপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সাতাশ

রবিবার ভুজঙ্গের ছুটি। কিন্তু তা নামমাত্র। অফিসেই থাকার সুবিধা যেমন আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। সব দিন, সমস্ত সময় সে অফিসের হাতের নাগালের মধ্যে। সুতরাং যেদিন তার ছুটি সেদিনও তাকে কাজের দিনের মতোই আদেশ, নির্দেশ এবং উপদেশ দিতে হয়। অন্য দিন তাতে সে অসুবিধাও বোধ করে না, বিরক্তও হয় না। কিন্তু আজ তার ভালো লাগছিল না। তার চোখের সামনে বিপিনের বঙ্কিম হাসি যেন ক্রমাগতই ভাসছিল। কানে বাজছিল তার সেই কথা: মধুর লোভে ভাগ্যান্বেষীর যেখানে ভিড় জমে গেছে, আমাকে তালাবন্ধ রেখেই কি তাকে বাঁচাতে পারবেন?

ভুজঙ্গ জানে যে, তা সম্ভব নয়। তবু বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, বাঁচানো যাবে না। ১৯১৪ সালে যখন বিপ্লব আন্দোলন হয়, তখন সে ছোট। তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কোন সুযোগও আসেনি। রাজনীতিতে সে এলো গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের মারফৎ। সেই থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্বন্ধে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে যা উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুতরাং কংগ্রেসের সম্বন্ধে তার একটা মোহ আছে। সুতরাং এমনি ভাবে চললে কংগ্রেস বাঁচতে পারে না, বাঁচা উচিতও হবে না,—এ কথা বুদ্ধি দিয়ে সে বোঝে, কিন্তু মন দিয়ে মানতে পারে না।

বিপিনের হাসি তাই সে ভুলতে পারছে না।

সহযোগী সম্পাদকেরা এসে সম্পাদকীয় লেখা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গেলেন। বার্তা-সম্পাদক ক'বারই টেলিফোনে বিশেষ ক'টি খবর সম্বন্ধে কি করা উচিত পরামর্শ চাইলেন। অন্য দিন এ সম্পর্কে ভুজঙ্গের উৎসাহের অবধি থাকে না। পরামর্শ আজও দিলে, কিন্তু উৎসাহ যেন কিছুটা শিথিল। সাংবাদিকতা সম্বন্ধে তার যে গভীর পবিত্রতা-বোধ ছিল, তা যেন আর তেমন নেই। তার কেমনই মনে হচ্ছে, এ সবই মিথ্যা, মিথ্যা।

হঠাৎ তার মনে পড়লো শুভেন্দুকে। কেন মনে পড়লো কে জানে? এই মিথ্যার যুগে সত্যের একজন একনিষ্ঠ পূজারী হিসাবেই কি?

মনে পড়ামাত্র সে উঠে দাঁড়ালো। মনে লজ্জা পেলে, এত দিনের মধ্যে এই লোকটির সঙ্গে একবারও দেখা করেনি ব'লে। অথচ এরই সঙ্গে দেখা করাই সর্বাগ্রে উচিত ছিল। চাকরটাকে কাপড় জামা আনতে বললে।

কাপড় জামা এনে চাকবটা জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও বেরুবেন কি?

—হ্যাঁ।

—গাড়ি বার করতে বলব কি?

—বল।

ব'লেই তাড়াতাড়ি মনে হোল, না, থাক। দরকার নেই।

ভুজঙ্গ হাসলে: কার গাড়ি! আজীবন বিনাগাড়িতেই চ'লে গেল, আজ নৃপেনের দৌলতে গাড়ি ছাড়া সে চলতে পারে না? তা ছাড়া তার মনে হোল, শুভেন্দুব কাছে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওযাটা একেবারেই অশোভন। তার কাছে যেতে হয তীর্থযাত্রীব মতো পাযে হেঁটে।

কিন্তু গাড়ি তখন বার কবা হযেছে। পাযে হেঁটে শুভেন্দুর কাছে যাওয়া হোল না।

চিত্তবঞ্জন এভিন্যু, দিয়ে আব একটু সোজা গেলেই কংগ্রেস অফিস। ছেলেগুলো কেমন আছে, কি করছে, জানবার জন্যে সেখানে গেলেও হয। অনেক দিন তারা আসেনি। কি কাজে ব্যস্ত কে জানে। তবে আসেনি যখন, তখন অসুবিধা কিছু হচ্ছে না, অনুমান করা যায। অসুবিধা হোলে না এসে পারত না।

সুতরাং সেখানে নয়। তার চেয়ে শুভেন্দুর ওখানেই ভালো। আজকের অপরাহ্নে তাব মনের যে অবস্থা, তাতে সেখানে ছাড়া আর কোথাও গিয়ে সে আবাম পাবে না।

গলিপথে আরও খানিকটা এগিযে সে কর্ণওযালিস্ ষ্ট্রীটে পড়লো। হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়ালো।

সেই জায়গাটা না, যেখানে বৎসর কয়েক আগে শুভেন্দু মিলিটারীর হাতে আহত হয়েছিল? ওই তো সেই মনোহারী দোকানটা। সেই জায়গাই বটে, কিন্তু রক্তের কোনো চিহ্ন নেই। পৃথিবীতে কিছুরই চিহ্ন বেশিদিন থাকে না,—স্মৃতিপটেও না।

ডানদিকের গলি দিয়ে আর একটু গিয়েই শুভেন্দুর ফ্ল্যাট।

ভুজঙ্গ কড়া নাড়লে,—একবার, দু'বার, তিনবার।

—কে?

—আমি ভুজঙ্গ।

দরজা খুলে গেল: আসুন, আসুন। অনেক দিন পরে এলেন।

সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ এবং প্রশান্ত হাসি।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভুজঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলে: সময় পাইনা শুভেন্দুবাবু। আজ একরকম জোর ক'রে চ'লে এলাম।

—বেশ করেছেন। চা খেয়ে এসেছেন তো?

—তার মানে?

—তার মানে, চা খেতে চেয়ে লজ্জা দেবেন না। আমার চাকরটার কাল থেকে পাত্তা নেই।

—চমৎকার! পালালো নাকি?

—সেই রকমই সম্ভব। কারণ, মাণিব্যাগটাও নিরুদ্দেশ।

—ভালো। কিন্তু শ্রী বললে না তো?

—তিনি জানবেন কি ক'রে? আপনাদের কাগজের কল্যাণ হোক, কী যে আপনাদের কাজের চাপ আপনারাই জানেন। তিন দিন তাঁরও দেখা নেই। টেলিফোনে খবর পাই ভালো আছেন, ওই পর্যন্ত।

—সে আবার কি!—ভুজঙ্গ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললে,—'মহিলা বিভাগে' এমন কী কাজের চাপ যে তিন দিনের মধ্যে বাড়ি আসার সময় পায়নি সে!

শুভেন্দু হো হো ক'রে হেসে বললে, শুধু কি 'মহিলা-বিভাগ', কংগ্রেস নেই? আছেন কোথায়?

—সেইটেই ভাবছি।—ভুজঙ্গ চুপ ক'রে গেল।

শুভেন্দু বললে, ভাববেন পরে, বাড়ি ফিরে। এখন বলুন খবর কি ?

—খবর ?

কিন্তু ভুজঙ্গের আর কথা বলা হোল না। ঝড়ের বেগে ব্রততী ঢুকলো, তার পিছনে একটা চাকর।

ঢুকেই ব্রততী শুভেন্দুকে ধমক দিলে, ব'সে আছেন যে বড় !

এ আবার কী প্রশ্ন !

ভুজঙ্গ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তা ছাড়া অন্য কিছু ফরমাস ছিল কি ?

তার দিকে না চেয়েই ব্রততী আবার শুভেন্দুকে ধমক দিলে, শুয়ে পড়ুন।

—সমস্ত দিন শুয়ে রয়েছি ব্রততী, ভালো লাগছে না আর।

—ভালো না লাগলে তো চলবে না। ডাক্তার যা ব'লে গেছেন তাই করতে হবে তো।

ডাক্তার! এতক্ষণে ভুজঙ্গ শুভেন্দুর দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলে। তাই তো! শুভেন্দুকে রুগ্ন ব'লেই তো মনে হচ্ছে। মুখখানি শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখে গভীর অবসাদ। জ্বর? কিন্তু হৃদয়ে কোনো আঁচ লাগেনি। তা যেমন সরস, যেমন শুভ্র ছিল, তেমনি আছে। তাই সে যে অসুস্থ ভুজঙ্গ তা বুঝতেও পারেনি। ব্রততী না বললে হয়তো বুঝতে পারতই না।

শুভেন্দু শান্ত শিশুর মতো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ব্রততী চাকরটাকে বললে, চল্, আমি তোকে সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিই।

সে চ'লে গেলে শুভেন্দু ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ বললে, মাফ করবেন, আপনার জ্বর আমি বুঝতেই পারিনি।

—আপনার দোষ নেই ভুজঙ্গবাবু, আমি নিজেও খুব ভালো বুঝতে পারছি না। শুধু ও বুঝেছে, আর যে ডাক্তারকে ও নিয়ে এসেছিল তিনি বুঝেছেন।

—খুব অল্প জ্বর আর কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একশোর বেশি কালকেও ওঠেনি। আজ তো আরও কম। কেবল বুকের বাঁ পাশটায় এবং পিঠের দিকে একটা ব্যথা আছে। সেইটেতেই ও লাফাবার স্থবিধা পেয়েছে বেশি।

শুভেন্দু আরও কি বলতে যাচ্ছিল, ব্রততীর পায়ের শব্দ পেয়ে চুপ করলে।

ব্রততী এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার যথাসর্বস্ব কি ব্যাগেই ছিল? না, এখানে-ওখানে আরও কিছু আছে?

—না ভাই। এখান-ওখানের ব্যাপার আমার নেই।

—ভালো।

ব্রততী তার হাতব্যাগটা খুলে একখানা নোট বার করলে, আর একটা ফর্দ। চাকরটাকে বললে, ষ্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দে। দিয়ে এই ফর্দ মিলিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আয়। একটু তাড়াতাড়ি আসবি বাবা, নইলে চায়ের জল শুধু শুধু ফুটবে।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞেসা করলে, এ চাকরটাকে তোমার বাড়িতে দেখেছি যেন।

—হ্যাঁ। আমাদেরই চাকর। খুব বিশ্বাসী ব'লে একেই নিয়ে এলাম। অন্য চাকর না পাওয়া পর্যন্ত ও এখানেই থাকবে।

শুভেন্দু হেসে বললে, থাকার অস্থবিধা হবে না। কিন্তু খাবে কি?

—সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। ও নিজেই রেঁধে-বেড়ে খাবে, আপনাকেও খাওয়াবে। শুধু দয়া ক'রে মুখ বুঁজে থাকবেন না, যখন যা দরকার হবে হুকুম করবেন। দেখি, হাঁ করুন।

থার্মোমিটারটা ঝেড়ে ব্রততী সেটা ওর জিভের তলায় দিলে। মিনিটখানেক পরে বের ক'রে দেখে বললে, একশো। দাঁড়ান, আমি টেলিফোনে ডাক্তার-বাবুকে এটা জানিয়ে আসছি। রোজ এই সময়ে একশো।

ব্রততী পাশের ঘরে ফোন করতে গেল।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রে কি আরও বাড়ে?

শুভেন্দু বললে, আমার বিশ্বাস আর বাড়ে না। ওদের বিশ্বাস অন্যরকম।

—রাত্রে টেম্পারেচার নেওয়া হয় না ?

—কে নেবে ? ব্রততী আটটার মধ্যেই আমাকে ওষুধ পথ্য দিয়ে চ'লে যায়।

ওকে সাহস দেবার জন্যে ভুজঙ্গ বললে, চিন্তার কিছু নয়। হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা, নয়তো

—টাইফয়েড।—শুভেন্দু হেসে বললে,—চিন্তা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আপনি এসেছেন যখন তখন ব্রততীকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। ও না বুঝলে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে।

ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে উঠলো : ওকে কষ্টের হাত থেকে কে বাঁচাবে শুভেন্দুবাবু ? কষ্ট ও খুঁজে নিয়ে আসে। নইলে কোথায় ছিলেন আপনি, কোথায় বা ও। খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে গেছে আপনার রোগশয্যার পাশে।

শুভেন্দুও হাসলে : যা বলেছেন ! আচ্ছা ব্রততী !

ব্রততী পাশের ঘর থেকে এসে ওর বিছানার পাশে দাঁড়ালো। বললে, কি বলছেন ?

শুভেন্দু বললে, ভূমিকম্প মাপবার একটা যন্ত্র আছে। যতদূরেই ভূমিকম্প হোক, তাতে সাড়া পাওয়া যায়। তোমার কি তেমনি কোনো যন্ত্র আছে ?

—কি মাপবার জন্যে ?

—কোথায় কে দুঃখ পাচ্ছে তাই মাপবার জন্যে ?

লজ্জায় ব্রততীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। রেগে বললে, বাজে বকবেন না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন দেখি। আমি আপনার বার্লিটা নিয়ে আসি। ভুজঙ্গদা, পালাবেন না যেন। আপনার সঙ্গে দরকার আছে।

ওর অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে সস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে উভয়েই চেয়ে রইল।

শুভেন্দু বললে, আশ্চর্য মেয়ে ! ওর সঙ্গে যতই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, ততই আরও বেশি মুগ্ধ হচ্ছি।

অনাবশ্যক বিবেচনায় ভুজঙ্গ এ প্রসঙ্গে আর অগ্রসর গেল না। জিজ্ঞাসা করলে, শ্রী কি আপনার অসুখের খবর জানেই না ?

—বোধ হয় না। টেলিফোন উনি মাঝে মাঝেই করেন। আমি আর এই সামান্য জ্বরের খবরটা জানিয়ে ওঁকে কাজের মধ্যে বিব্রত করতে চাইনি।

—ভালোই করেছেন! আজ রাত্রে তাহলে কার জিম্মায় থাকবেন? ওই চাকরটার?

শুভেন্দু হাসলে। বললে, না ভাই। সমস্ত জগৎ যাঁর জিম্মায় রয়েছে, তিনি ছাড়া, আর কারও ভরসা শিশুকাল থেকেই আমি করিনা। চাকরটা থাকে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই। একে তো রাত্রে আমার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তার উপর ব্রততী সমস্ত জিনিস এমন ক'রে হাতের কাছে গুছিয়ে রেখে যায় যে, প্রয়োজন হোলে কিছুরই অসুবিধা হয় না।

—ইলা কোথায়?

—ঠিক এই সময়েই তারও একটি ভাসুরঝির বিয়ে লেগেছে। চলে গেছে সেইখানে, এলাহাবাদে। শিগগির ফেরারও সম্ভাবনা নেই। ওরা এই সুযোগে উত্তর ভারত খানিকটা ঘুরেই আসবে।

—চমৎকার!

এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

শুভেন্দু ব্যস্তভাবে বললে, শ্রী ফোন করছে বোধ হয়। একবার টেলিফোনটা গিয়ে ধরুন না ভুজঙ্গবাবু।

ভুজঙ্গ গিয়ে টেলিফোনটা ধরলে। শ্রীরই কণ্ঠস্বর। শুভেন্দুর অবশ্য অনুমানের বাহাদুরি নেই। কারণ শ্রী ছাড়া আর কেউ তাকে টেলিফোন করে না। কে করবে?

ভুজঙ্গের কণ্ঠস্বর পেয়ে শ্রী বললে, বিসিভারটা ওঁকে একবার দাও না ভুজঙ্গদা।

—ওঁর তো আসবার ক্ষমতা নেই। আজ তিন দিন থেকে উনি তো জ্বরে শয্যাগত।

—শয্যাগত! জ্বর কি খুব বেশি?

—একশো।

—একশো! মুস্কিল হোল দেখছি।

—কি মুস্কিল ?

—প্লেন চার্টার করা হয়ে গেছে, এখন

—প্লেন ! কোথায় যাবে ?

—দিল্লী। দুপুরেই ওরা ট্রাঙ্ককল করেছে। এখন···অসুখ কি খুব বেশি ?

—ভুজঙ্গ শেষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করলে না। বললে, তুমি কি একাই যাচ্ছ ?

—না। নৃপেনবাবুও যাচ্ছেন। কংগ্রেসের একটা জরুরী ব্যাপার, না গেলেও নয়। আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

—ঘণ্টা দুয়েক।

—আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

ফিরে এসে ভুজঙ্গ শুভেন্দুকে জানালে, শ্রী আসছে। কংগ্রেসের একটা বিশেষ কাজে তাকে দিল্লী যেতে হচ্ছে। প্লেন চার্টার করা হয়ে গেছে। আপনার অসুখ শুনে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

শুনে শুভেন্দুর মুখ প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উল্লাসের সঙ্গে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্রততী বাধা দিলে। সে দোরগোড়া থেকেই ভুজঙ্গের কথা শুনেছে। এখন বাধা দিয়ে বললে, বালি ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয়েছে। এখন ওষুধটা খেয়ে নিন দেখি। ওরে ও বাবা, এই ওষুধটা আর এক দাগ রাত্রি ন'টায় খাওয়াবি। আর বার্লিটা ঠাণ্ডা হোলেই আধঘণ্টা পরে খাওয়াবি। তুই বাবা, এই ঘরের মেঝেতেই শুবি। একটু সজাগ থাকবি, যেন ডাকলেই সাড়া পান। আমিও রাত্রে ফোন ক'রে খবর নোব। আপনি কি গাড়ি এনেছেন ভুজঙ্গদা ?

—এনেছি। কেন ?

—তাহ'লে আমাকে একটু পৌছে দেবেন ?

—কেন, তোমার গাড়ি কি হোল ?

—নেই। আপনি কি বসবেন আর একটু ? আমি কি আপনার গাড়িটা নিয়ে যাব ?

ভুজঙ্গের মনটা কি রকম গোলমাল লাগছে। বললে, চল তোমাকে পৌঁছেই দিয়ে আসি। বরং ফেরবার সময় আর একবার এদিক হয়ে যাব, কি বলেন শুভেন্দুবাবু?

—বেশ তো। অসুবিধা না হোলে এদিক হয়েই যাবেন।

—তাহ'লে উঠি শুভেন্দুবাবু। নমস্কার!

—নমস্কার।

ব্রততী শুভেন্দুর গায়ের ঢাকাটা গুছিয়ে দিয়ে বললে, চললাম শুভেন্দুদা।

—এসো বোন।

ভুজঙ্গ এবং ব্রততী আশ্চর্য হয়ে গেল, শুভেন্দু একবারও কাউকে বললে না আর একটু বসবার জন্যে। একটু কষ্টই বোধ করলে, যেন তাদের উপর ওর কোনো দাবীই নেই। ওরা যেন নিজের গরজে এসেছে, নিজের গরজেই চ'লে যাচ্ছে, এবং এ বিষয়ে শুভেন্দুর কিছুই বলবার নেই।

গাড়িতে উঠে ব্রততী বললে, ডাক্তারে কি সন্দেহ করছেন জানেন?

—কি?

—প্লুরিসির একটা প্যাচ আছে।

—প্লুরিসি!

—সেই রকমই সন্দেহ করছেন। কাল একটা এক্স-রে করা দরকার। সে-টাকাটার ব্যবস্থা করেছি কোনো রকমে। কিন্তু আরও যদি দরকার হয়, তাহ'লে মুস্কিল হবে।

—মুস্কিল হবে! তোমার!

—হবেই তো ভুজঙ্গদা। আমি কোথায় টাকা পাব?

—এতদিন যেখান থেকে পেতে সেইখানেই।

ব্রততী এ প্রসঙ্গটা যেন এড়িয়ে যেতে চায়। বললে, শুভেন্দুদার যে ব্যাঙ্কে কিছু আছে মনে হয় না। ভগবান করুন প্লুরিসি যেন না হয়। কিন্তু যদি হয়, তাহলে অনেক খরচের ধাক্কায় পড়ব। আমি চেয়ে আছি আপনার দিকে।

ভুজঙ্গ বললে, আমার দিকে?

—আর কার দিকে চাইতে পারি বলুন ?

কথাগুলো ভুজঙ্গের যেন কেমন গোলমেলে বোধ হ'তে লাগলো। বললে, কিছুরই দরকার হবে না দিদি। শ্রী এই অবস্থায় দিল্লী যাবে না নিশ্চয়ই। সুতরাং সমস্ত দায় তারই। আমরা মিথ্যে চিন্তা করছি।

—না গেলেই ভালো।—ব্রততী একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস যেন প্রাণপণে চেপে গেল।

ভুজঙ্গ বললে হঠাৎ একটা জরুরী প্রয়োজন। সে আর নৃপেন যাচ্ছে। কি জরুরী প্রয়োজন কে জানে। নৃপেন তোমাকে জানায়নি কিছু ?

ব্রততী বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে সংক্ষেপে বললে, না।

নৃপেনের প্রসঙ্গ উঠলে ব্রততী সাধারণত থামতে চায় না। পরিহাসমণ্ডিত গর্বের সঙ্গে কত মন্তব্য করে। কিন্তু আজ যেন ওর কি হয়েছে। ভুজঙ্গের সন্দেহ হোল শ্রী-নৃপেনের সম্বন্ধে তার মনে যে সন্দেহ কিছুকাল থেকে জেগেছে, ব্রততীর মনেও তাই জাগলো না কি ? ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো।

হায় ভগবান !

সমস্ত পথ আর একটা কথাও কেউ বললে না,—না ভুজঙ্গ, না ব্রততী। সমস্ত পথ ভুজঙ্গের মনে নানা সম্ভব-অসম্ভব কথা ঘোরাফেরা করতে লাগলো : টাকার জন্যে ব্রততীকে চিন্তা করতে কখনও দেখা যায়নি। বললে, কোনো রকমে এক্স-রে'র টাকাটার ব্যবস্থা সে করেছে। বাকি টাকা ভুজঙ্গের কাছে সে চায় কেন ? নৃপেনের সঙ্গে কী হয়েছে তার ? গাড়ি আনেনি কেন ? তার গাড়ি কি হোল ?

ভুজঙ্গ এ সব ব্যাপার বোঝে না। গোলমাল লাগে।

ওদের বাড়ির গেটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

নামতে নামতে ব্রততী বললে, ফেরবার পথে ও বাড়ি হয়ে যাবেন ভুজঙ্গদা।

—কেন ?

—ওদের দিল্লী যাওয়ার শেষ পর্যন্ত কি হোল ফোনে জানাবেন ?

—সে তো তুমি নিজেই জানতে পারবে ব্রততী। কারণ নৃপেনেরও যাওয়ার কথা।

—না জানতেও পারি ভুজঙ্গদা। আমি আপনার টেলিফোনের জন্তেই অপেক্ষা করব।

ভুজঙ্গ কি ভেবে আস্তে আস্তে নামলো। বললে, এলামই যদি বিপিনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই বরং।

ব্রততী বললে, ঠাকুরপো তো এখানে থাকে না।

—সে কি! কোথায় থাকে?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—ঠিকানা জানি না। মাঝে মাঝে আসে, ওই পর্যন্ত।

—কি হোল? নৃপেনের সঙ্গে কি

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, না বোধ হয়। এমনিই চলে গেছে। মনে হয়, ও বোধ হয় ওর পথ স্থির ক'রে ফেলেছে। এবাড়িতে থেকে সে পথে চলায় অসুবিধা আছে ব'লেই চলে গেছে।

—তুমি বাধা দাওনি?

—না। কেন দোব?

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো।

ব্রততী বললে, যাবার দিন যখন প্রণাম করতে এল, শুধু বললাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু আমার তো ছেলেপুলে নেই, মুখাগ্নি তোমাকেই করতে হবে। সেদিন যেন এস।

ব্রততী কেমন একরকম করুণভাবে হাসলে। তারপর বললে, ও উত্তর দিলে না। ওর চোখ জলে ঝাপ্সা হয়ে গেল। এবং বোধ হয় সেইটে ঢাকবার জন্তেই আমাকে আর একবার প্রণাম ক'রে ঝড়ের মতো বেড়িয়ে গেল।

হঠাৎ বললে, আচ্ছা তাহ'লে আপনি উঠুন ভুজঙ্গদা। শুভেন্দুদার ওখান হয়ে যাবেন এবং বাড়ি ফিরে আমাকে একটা টেলিফোন করবেন, কেমন?

ভুজঙ্গ গাড়িতে ওঠবার গা করলে না। ব্রততীর সঙ্গে তার অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। যে দুঃখ ব্রততী ভোগ করছে, ততখানি এবং

তেমন ক'রে না হোলেও আর একরকম ক'রে সে ভোগ করছে। সমবেদনায় তার মন এখন কানায় কানায় পূর্ণ।

বললে, একটু চা খেয়ে গেলে হোত না?

ভুজঙ্গ জানে, খাওয়াতে ব্রততী বড় ভালোবাসে। সুতরাং চায়ের কথা বললে সে ওপরে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু কি যে হয়েছে তার, খাওয়ানোর ব্যাপারে আর যেন তার কোনো উৎসাহ নেই। ভুজঙ্গের মনের ভাব সে যেন বুঝতে পেরেছে এবং যে প্রসঙ্গ সর্বক্ষণ তাকে কীটের মতো দংশন করছে, ভুজঙ্গের কাছ থেকে সেই প্রসঙ্গই যেন সে সভয়ে এড়িয়ে চলতে চায়।

ব্যস্তভাবে ব্রততী বললে, এখন আর চা নয়। আর একদিন হবে। আপনি যান, গিয়েই আমাকে টেলিফোন করবেন যেন।

ব'লে সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। ভুজঙ্গের দিকে আর না চেয়েই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ গভীর বিস্ময়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে ভুজঙ্গ ধীরে ধীরে তার মোটরে গিয়ে উঠলো। শোফারকে বললে, শুভেন্দুবাবুর বাড়ি হয়ে যাবে।

সেখানে গিয়ে শুনলে, শ্রী এবং নৃপেন ওরা চ'লে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। দিল্লীতে কংগ্রেসের কি একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ওদের না গেলেই নয়। পরশুই ওরা ফিরে আসবে আশা করা যায়। জ্বর যখন বেশি নয়, তখন শুভেন্দুও ওদের আটকায়নি, ওরাও শঙ্কর নাকচ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। সময়ও হাতে ওদের বেশি ছিল না। সুতরাং তখনই ওরা ওখান থেকেই এরোড্রোমে চলে যায়।

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে সমস্ত খবর শুনলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভেন্দুর মুখের প্রত্যেকটি রেখা পর্যবেক্ষণ করলে। সে মুখে ব্যথা, বেদনা অথবা দুঃখের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। সকল সময় যেমন প্রফুল্ল, তেমনি প্রফুল্ল।

শুভেন্দু বললে, আপনি কিংবা ব্রততী যতই ভয় পান, আমি তো জানি ভয় পাবার মতো কিছু নয়। একশো জ্বর নয়। মিথ্যে আটকানোর কোনো অর্থ হয় না। বিশেষ, যখন অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। আপনি কি রেগে গেলেন?

—না, রাগব কেন ?

—মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে যেন।

—না।

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো। বললে, আমি বলি কি, রাত্রিটা আমি এখানেই থাকি। চাকরটার জিম্মায় ভরসা পাচ্ছি না।

শুভেন্দু ব্যস্তভাবে বললে, এই দেখুন। আপনারা বড় ব্যস্তবাগীশ। একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়েন। যেমন আপনি, তেমনি আপনার বোন। কাল সকালে এসে খবর নেবেন, যার জিম্মায় রেখে যাচ্ছেন, তাকেও আমার কোনো দরকার হবে না। ছঁঃ। কি করতে থাকবেন।

ভুজঙ্গ আর কথা বললে না। বলা নিরর্থক। এ লোক কারও সেবা নেয় না, নেবেও না। সুতরাং মিছামিছি কি করবে থেকে? সে চাকরটাকে ডেকে আর একবার ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল এবং টেলিফোনে এই কথাগুলোই ব্রততীকে মোটামুটি জানিয়ে দিলে।

ব্রততী নিঃশব্দে সমস্ত শুনলে। কিন্তু একটাও মন্তব্য করলে না। নৃপেন কিংবা শ্রীর সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলে না।

ভুজঙ্গের ভিতরটাও যেন একটা ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। শরীর ভালো নয় ব'লে রাত্রে সে কিছু খেলে না। আরও খানিকটা পরে যখন বেয়ারা সম্পাদকীয় নিয়ে এলো, সেগুলো তৎক্ষণাৎ সে প্রুফরীডারদের কাছে পাঠিয়ে দিলে। যদিচ সম্পাদকীয়র প্রুফ বরাবর সে নিজেই দেখে, কারণ তার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে, তবু আজকে সে আর কিছুই পারবে না।

অথচ আলো নিভিয়ে শয্যায় যখন সে শুলো, ঘুমও কিছুতে আসে না।

আটাশ

সত্যহরি নানা উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে ভুজঙ্গকে টেলিফোন করে তার বাড়িতে আসবার জন্যে। খবরের কাগজের সম্পাদকের প্রয়োজন তার কাছে সব চেয়ে বেশি। তার উপর ভুজঙ্গ বন্ধু, সত্যহরির দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সহকর্মী। কিন্তু সত্যহরির মন্ত্রীভবন থেকে তল্পীতল্পা গুটিয়ে প্রকাশরা চ'লে আসবার পর থেকে ভুজঙ্গের মনটা তার সম্বন্ধে খুব প্রসন্ন ছিল না। তাই নানা অজুহাতে সত্যহরিকে এতকাল সে এড়িয়েই এসেছে। আজ সত্যহরির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভুজঙ্গ যখন ফোন করলে, সত্যহরি মনে মনে বিস্মিত হোলেও মুখে সন্তোষ এবং হৃদ্যতা প্রকাশের ত্রুটি রাখলে না।

বললে, তাহ'লে এক কাজ কর না ভুজঙ্গ। কাল না এসে পরশু জগদ্ধাত্রী পূজোর ছুটি, পরশু বিকেলে এসো না। এখানেই একটু চা খাবে।

—জগদ্ধাত্রী পূজোয় তোমাকে আবার কোথাও সভাপতিত্ব করতে যেতে হবে না তো?

সত্যহরি হেসে বললে, না, না। জগদ্ধাত্রী পূজোটা এখনও সর্বজনীন হয়নি। হোলে কি হোত বলা যায় না।

ভুজঙ্গ বললে, বেশ তাই হবে। কিন্তু আবার চা কেন?

—কেন, চা খাও না তুমি?

—খাই। কিন্তু মন্ত্রীর চা হজম করতে পারব তো?

সত্যহরি কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, নৃপেনবাবুর চা যখন হজম হচ্ছে, তখন আমারও হবে। এসেই দেখ না।

কথাটা ভুজঙ্গকে যেন একটা ধাক্কা দিলে। টেলিফোন রেখে দেবার পর থেকে জগদ্ধাত্রী পূজার অপরাহ্ণ পর্যন্ত কথাটা অহরহ সূচের মতো তাকে বিঁধতে লাগলো। নৃপেন তার বন্ধু। গা-ঢাকা দেওয়ার সময় তার যথেষ্ট

উপকার করেছে। ব্রততী টাকা না পাঠালে তার পক্ষে গা-ঢাকা দিয়ে অত দিন থাকা অসম্ভব হ'ত। ব্রততী আর নৃপেন তো ভিন্ন নয়। টাকাটা তো নৃপেনেরই। তা ছাড়া সাম্প্রদায়িক হত্যালীলার সময় নৃপেনই তার প্রাণরক্ষা করেছে। এই 'কৃশানু'তে সেই তাকে এনেছে এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই রেখেছে। শুধু থাকা-খাওয়ার দিক দিয়েই নয়, সম্পাদক হিসাবেও যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে এখানে সে আছে। কোনো দিন তার কথার উপর কথা কয়নি। এখানে যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব সে পেয়েছে, কোনো সম্পাদকের অদৃষ্টে তা জোটে না, এ তো সে নিজেই ভালো ক'রে জানে।

তবু নৃপেন যে কি, তাও তার অবিদিত নয়। সে ধনী চোরাকারবারী, সে মদ্যপ,—এবং সম্প্রতি শ্রীর সঙ্গে যে-রকম মাখামাখি করছে, ভগবান জানেন তার প্রকৃত স্বরূপ কি, কিন্তু ভুজঙ্গের ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না। সেই নৃপেনের চা সে তো অম্লান বদনে পরিপাক করছে। সত্যহরি অন্যায় কিছু তো বলেনি।

এইটে ভুজঙ্গকে বিঁধছে। চোরের মা যেমন কান্না পরিপাক করে, তেমন ক'রে সত্যহরির কথাগুলি সে যতই পরিপাক করার চেষ্টা করে, বি ধন যেন ততই বেশি ক'রে বাজে।

এই মানসিক অবস্থা নিয়েই সে মন্ত্রীভবনে গেল। সত্যহরির বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, মোটর-আর্দালি দেখলে। এরই মধ্যে তার চিরকালের শীর্ণ-শুষ্ক দেহ শাঁসে-জলে অল্প একটু পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ-সবের চেয়েও তার দৃষ্টি বেশি ক'রে আকৃষ্ট করলে সেই দেহে আভিজাত্যের ছায়া। ছাপ ঠিক নয়, ছায়াই। কিন্তু ছাপ পড়তেও যে দেরি হবে না তাও সুস্পষ্ট অনুমান করা যায়।

অবশেষে তারা লনে এলো চা খেতে।

কার্পেটের মতো নরম, সবুজ ঘাসের উপর বেতের টেবিল, হাল্কা কাজ কর কাপড় ঢাকা। চার পাশে চারটি বেতের চেয়ার। দু'খানি বেতের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে, দু'টি সুবেশা তরুণী, বোধ করি চায়ের তদ্বির করছিল। অকারণেই হাসিমুখে তারা ভুজঙ্গ ও সত্যহরির দিকে চাইলে।

সত্যহরি পরিচয় করিয়ে দিলে: কুমারী রেবা চক্রবর্তী, কুমারী লীলা চক্রবর্তী। আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া।

ভুজঙ্গের মুখে এসে প'ড়েছিল: কত নিকট? কিন্তু চেপে গেল। মনে-মনে বুঝলে, প্রকাশ যাদের মাসতুতো-পিসতুতো ব'লে অভিহিত করেছিল, ওরা তাদেরই কেউ হবে বোধ করি। কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিমুখে প্রতিনমস্কার ক'রে চায়ের চক্রে বসলো।

হালকা কথা, হালকা গল্প,—চায়ের টেবিলে যেমন হয়,—অনেক হোল। আশ্চর্য, সেদিনের সেই খোঁচাটার সত্যহরি আর পুনরুক্তি করলে না। ভুলেই গেছে হয়তো।

এ পর্ব শেষ হোলে, মেয়েদুটি যখন নমস্কার ক'রে নিজেদের বাড়ি চ'লে গেল, তখন অগ্রহায়ণের সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে সত্য?

—কি কেমন লাগছে?

—এই মন্ত্রীগিরি।—'এই' কথাটার উপর ভুজঙ্গ জোর দিলে।

—মন্ত্রীগিরি কারও খারাপ লাগতে পারে, এমন আশঙ্কা তোমার মনে আছে নাকি?

—আছে। মানুষের উপর এখনও ততটা আস্থা হারাইনি।

সত্যহরি আধ মিনিট কাল নিঃশব্দে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, যদি বলি ভালো লাগছে না, সেই কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

ভুজঙ্গ তার জবাব দিলে না। শেষ সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল।

এক সময় বললে, গেল শনিবারে ক'লকাতার বাইরে গিয়েছিলাম।

—কোথায়?

—আমাদের সেই কাপাসতলার আশ্রমে।

সত্যহরি নিঃশব্দে উৎসুক নেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ভুজঙ্গ তেমনি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল:

আমাদের সেই কাপাসতলার আশ্রম। এতকাল পরে তারই কথা মনে পড়ল। গেলাম ছুটে। ষ্টেশন থেকে নেমে বাঁহাতি লাল রেলওয়ে সড়ক। ডান দিকে আল-পথে খানকয়েক জমি পেরিয়েই সেই লম্বা-লম্বা দু'খানা চালা—একখানা দক্ষিণদ্বারী, একখানা পশ্চিমদ্বারী। আমবাগান, মধ্যে ঘাট-বাঁধান পুকুর। মনে পড়ে, দক্ষিণদ্বারী চালার প্রথম ঘরখানায় থাকতাম আমি, দ্বিতীয় খানায় তুমি, পরের দু'খানায় ছেলেরা? তার পাশে রান্নার চালা। পশ্চিমদ্বারীটায় তাঁত-শালা আর চরকা-তুলার গুদাম। মনে পড়ে?

সত্যহরি সাড়া দিলে না। গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

—গিয়ে দেখলাম, আমবাগানে হাট বসেছে। আর চালাগুলোয় কারা যেন গরু বাঁধে।

ভুজঙ্গ কি রকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলে।

—গরুগুলোকে কে যেন খেতে দিচ্ছে। মনে হোল, দামোদরের সেই ছোট ছেলেটা। ঠিক চিনতে পারলাম না। আমাকেও ওরা কেউ চিনতে পারলে না।

সত্যহরি তথাপি নীরব।

হঠাৎ সত্যহরির ডান হাতখানা খপ করে চেপে ধ'রে গভীর আবেগের সঙ্গে ভুজঙ্গ বললে, চল সত্য, আবার আমরা ফিরে যাই সেইখানে, আমাদের সেই কাপাসতলার আশ্রমে। এখানে আমাদের কী কাজ? যাবে?

কথা সত্যহরির যেন বেরুচ্ছিল না। একটু কেশে কোনোক্রমে বললে, না। তা আর হয় না।

—কেন? আরাম-বিলাসের আকর্ষণ? ক্ষমতার দম্ভ?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সত্যহরি বললে, কারণ জিগ্যেস কোর না ভুজঙ্গ। বললেও হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মনটাই তুমি আজ খারাপ ক'রে দিলে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি অন্য প্রয়োজনে আসছ। কতকটা অনুমানও করেছিলাম।

—কি অনুমান করেছিলে শুনি ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সত্যহরি একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে, আমাদের আর একজন উপ-মন্ত্রী নেওয়া হচ্ছে, জানো ?

—নেওয়াই তো স্বাভাবিক সত্য। যতক্ষণ তোমাদের দলের প্রত্যেক সদস্য হয় মিনিষ্টার, নয় ডেপুটি মিনিষ্টার, নিদেন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীও না হচ্ছেন, ততক্ষণ শান্তি নেই।

—যা বলেছ !—সত্যহরি হাসলে,—কিন্তু এই নবাগতটি সম্বন্ধে তোমারও উৎসাহ থাকা সম্ভব।

—কি রকম ? কি নাম তাঁর ?

—শ্রী।—সত্যহরি মিটি মিটি হাসতে লাগল।

—শ্রী ! বল কি !—ভুজঙ্গ যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

সত্যহরি হাসতে লাগল : তুমি জানো না ? প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছে। নৃপেনবাবু যা ধরবেন, তা তো ছাড়বেন না !

—তাই নাকি !—এ ছাড়া ভুজঙ্গের মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হোল না।

ইলসে গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। জলসিক্ত পীচের রাস্তার উপর রাস্তার এবং দুপাশের দোকানের রঙিন আলো এসে প'ড়ে একটা বিচিত্র রূপের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেদিকে ভুজঙ্গের দৃষ্টি আছে ব'লে মনে হয় না। ড্রাইভার হয়তো বাসার দিকেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুতে এসে পড়তেই ভুজঙ্গের যেন চমক ভাঙলো। ড্রাইভারকে সোজা কংগ্রেস-অফিসের দিকে গাড়ি চালাতে বললে। কিন্তু নৃপেন এবং শ্রীকে সেখানে পাওয়া গেল না,—পাওয়া গেল প্রকাশদেব তেতলায়। একখানা জমির নক্সা সামনে রেখে তারা কি যেন কতকগুলো গুরুতর এবং জটিল সমস্যার সমাধানে তুমুল বিতর্কে রত।

ভুজঙ্গের আকস্মিক আবির্ভাবে তারা ত্রস্তে চুপ করলে।

—ওদের সন্ধানে এসেছিলাম।—ভুজঙ্গ বললে।

ওদের বলতে কাদের বোঝায় সে আর তাদের বুঝিয়ে দিতে হোল না। প্রকাশ বললে, তাঁরা ক'দিন ধরে সন্ধ্যার দিকে আফিসে আসতে পারছেন না। কি নিয়ে যেন ব্যস্ত আছেন। কোনো-কোনো দিন ন'টার পরে আসেন হয়তো, বেশির ভাগ দিন তাও পাবেন না।

কি নিয়ে যে ব্যস্ত আছে, ভুজঙ্গ তা জানে। এই মাত্র শুনে এল সত্যহরির কাছ থেকে। সুতবাং সে নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ক'রে প্রকাশদের জিজ্ঞাসা করলে, তোরা চিৎকার করছিলি কি নিয়ে? ওটা কি? জমির নক্সা মনে হচ্ছে যেন।

সলজ্জে ন'কড়ি বললে, হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার? জায়গা-বিক্রির এজেন্সী নিয়েছিস?

ওরা পরস্পরেব মুখের দিকে চাইতে লাগলো। কি যে জবাব দেবে ভেবে পেল না।

প্রকাশ বললে, নেবেন জায়গা একটু খানি?

—আমি!—ভুজঙ্গ যেন আকাশ থেকে পড়লো।—জায়গা কিনব? এত জাযগা থাকতে ক'লকাতায!

ন'কড়ি মুচকি হাসতে হাসতে বললে, কেন, এখন তো আপনি অনেক টাকা মাইনে পাচ্ছেন। কেনার অসুবিধা কি?

—অসুবিধা? অসুবিধা অনেক।

তারপর সে প্রসঙ্গ যেন ঝেড়ে ফেলে দিযে বললে, শোন্। কি করছিস তোবা?

—এখন?—প্রকাশ উত্তব দিলে,—বিশেষ কিছুই নয়।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, এই মুহূর্তেব কথা বলছি না। কি কববি ঠিক করছিস?

প্রকাশ জবাব দিতে পারলেনা। নকড়ি খানিকটা ভেবে বিজ্ঞের মতো বললে, দেখি ভেবে।

ভুজঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করলে, ক'লকাতা ভালো লাগছে?

—মন্দ কি!

কথাটা ন'কড়ির মুখ থেকে বের হ'লেও ওদের সকলেরই মুখের কথা ব'লেই ভুজঙ্গ ধ'রে নিলে।

বললে, কাপাসতলার আশ্রমের কথা মনে পড়ে?

ওরা চুপ ক'রে রইল।

ভুজঙ্গ বললে, ভাবছি সেইখানে চ'লে যাব।

প্রকাশ বললে, আর 'কৃশানু'?

—'কৃশানু'?—ভুজঙ্গ খুব জোরে হেসে উঠলো,—কৃশানু তো সেইখানেই রে, কৃষকের মনে-মনে। জলভরা ক্ষেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে তারা কচি ধানের গুছি বুনবে, আমি আলের মাথায় ব'সে আমার মনের কৃশানু তাদের মনে ছড়াবো। ওদের ইতু, ওদের ঘেঁটু, ওদের নবান্ন, ওদের দাওনের ভাগ নোব। ওদের গাজনে ওদের সঙ্গে নাচব। ওদের দুঃখ, যার সম্বন্ধেও ওরা সম্পূর্ণ সচেতন নয়, তারও নোব ভাগ। আমতলাতে ছেলে-বুড়ো নিয়ে আবার আমি পাঠশালা করব।

—নৃপেনদা ছাড়বেন?

—ছাড়তে হবে। ও যখন বুঝবে, আমি ওদের কেউ নেই,—আমি আসলে ওই চাষী ভাইদেরই, তখন অনিচ্ছাতেও ছাড়বে। ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ওর উপায় থাকবে না।

—থাকতে পারবেন সেই মশা-ভরা জঙ্গলে? কষ্ট হবে না?

ভুজঙ্গের প্রাণখোলা উদার অট্টহাস্যে ঘরখানা যেন ভেঙে পড়বে। বললে, কষ্ট হয়তো হবে. কিন্তু থাকতে পারব না কেন রে! সেই তো আমার সত্যিকারের ঘর। মশার ভয়ে আপন ঘর ছেড়ে পালাব, আমি কি এমনই ভীরু!

ওদের চোখের দৃষ্টি তথাপি যেন সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলো। নিঃশব্দে ওরা ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে রইলো।

ভুজঙ্গ এবারে যেন আপন মনেই বলতে লাগল: সত্যহরির কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বললাম, এখানে তোমার কি কাজ? চল, কাপাসতলার আশ্রমে আবার ফিরে যাই।

প্রকাশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি বললেন তিনি ?

—রাজি নয়। সে এখানে কাজ পেয়েছে হাতে।

—কাজ নয়, মধু।

—তা হবে। মধুই হবে হয়তো। তোদের জিগ্যেস করি, তোরা যাবি আমার সঙ্গে ?

ওরা যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, থতমত খেয়ে গেল। বললে, আমাদের বলছেন ?

—হ্যাঁ। যাবি ? তাঁতশালা আর নেই, সে ঘরটার এককোণে খড় আছে। কিন্তু যেখানটায় ব'সে তোরা তাঁত চালাতিস, ঠাহর ক'রে দেখলে সে জায়গাটা বোঝা যায়।

ভুজঙ্গ নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল। হঠাৎ এক সময় উত্তেজিতভাবে বললে, সব চেয়ে আশ্চর্য হ'লাম সেই নোড়াগাছটার উঁচু গুঁড়িতে।

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ওরা এক সঙ্গে ব'লে উঠল : সেই লক্ষ্মী-পেঁচার বাসাটা আছে ?

—আছে। অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে তার চোখ দুটো। দেখে এলাম। —ভুজঙ্গের মুখে শিশুর মতো মিষ্টি হাসি।—কিন্তু এরা হয়তো অন্য দম্পতি। তারা নিশ্চয় ম'রে গেছে। আমাদের কাপাসতলার আশ্রমে যাদের-যাদের বাসা ছিল কেউ ছাড়েনি রে, শুধু আমরাই ছেড়েছি,—কিসের লোভে কে জানে !

ছোট ঘরখানায় কতদিনের কত অশ্রু, শোণিত ও স্বেদের স্মৃতি যেন থমথম করতে লাগল। অনেকক্ষণ।

হঠাৎ এক সময় একটা নিশ্বাস ফেলে ভুজঙ্গ উঠে দাঁড়ালো : তোরা যাবি না বোঝা যাচ্ছে। রাত হোল, আমি উঠি।

ওরা কথা বলতে পারলে না। নিঃশব্দে ভুজঙ্গের পিছু পিছু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত এল এবং অনেক দিন পরে তার পায়ে আবার আগেকার মতো মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

ভুজঙ্গ একবার দাঁড়িয়ে ওদের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাইলে। তারপর শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে নামতে লাগল।

ভুজঙ্গ চ'লে গেলে ওরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলো।

হঠাৎ কেনারাম বললে, পাগল!

সকলেই ভুজঙ্গের কথাই ভাবছিল এই স্তব্ধ ক'টি মুহূর্তে। সুতরাং কেনারাম হঠাৎ কাকে পাগল ব'লে অভিহিত করলে সে প্রশ্ন সকলের কাছেই অনাবশ্যক।

ন'কড়ি বললে, কাপাসতলার আশ্রম! যাই বলিস, নামটা শুনলেও মনটা এখনও কেমন ক'রে ওঠে!

কেনারাম জোর গলায় বললে, ক'রে উঠলে কি হবে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। এখন আর সেখানে ফিরে যাওযার কোনো মানে হয়?

নকড়ি স্বীকার করলে, তা হয় না।

প্রকাশ গম্ভীরভাবে বললে, টাকায় কামড়াচ্ছে! আরাম ভালো লাগছে না, বুঝলি না? সেই এবড়ো-খেবড়ো মাটির মেঝের ছেঁড়া চাটাই ডাকছে! আমাদের দায় পড়েছে যেতে!

বিজ্ঞের মতো ছোট-হেম বললে, যেতাম ভাই। যেদিন সত্যদার মন্ত্রীভবন থেকে বেরিয়ে এলাম সেদিনই যদি ডাকতেন, যেতাম। ন'কড়ি ঠিকই বলেছে, কাপাসতলার নাম শুনলে এখনও মনটা কেমন করে। কিন্তু তবু এখন আর যাওয়া যায় না।

ছোট-হেম দ্বিধাভরে মাথা নাড়তে লাগলো।

প্রকাশও মাথা নেড়ে বললে, আর যাওয়া যায় না। পাকে-পাকে জড়িয়ে গেছি।

কেনারাম বললে, যাইনি? এই যে হাজার বিঘে জমিটা বিক্রির ভার নিয়েছি নৃপেনবাবুর কাছে। কথা দিয়েছি। তার মূল্য নেই? গোলামই বা গরীব লোক!

ন্যায্য ক্রোধে কেনারাম চোখ বিস্ফারিত ক'রে সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগলো।

মুচকি হেসে প্রকাশ বললে, তারপরে চিরদিনই কিছু আর ভলাণ্টিয়ারী করার জন্যে জন্মাইনি। সংসার করি চাই নাই করি, বাড়ি ঘর করব, আর পাঁচজন মানুষের মতো বাঁচবো, এ ইচ্ছা করাও কি অপরাধ?

কেনারামও চোখ টিপে বললে, নৃপেন বাবুর অনুগ্রহে তারও খুব দেরি আছে ব'লেও তো মনে হয় না। জায়গা তো একটুকরো হয়েছেই। বাকি একখানা ক'রে বাড়ি তৈরি করা। তা কি আর হবে না?

নকড়ি বললে, আলবাৎ হবে। বাসের লাইসেন্স পেয়ে গেছি ধ'রে নিতে পার। সেগুলো বেচে কিছু টাকা আসবে। তারপরে ধরো কাপড়ের দোকানখানা আছে। তাছাড়া

ছোট-হেম গম্ভীরভাবে বললে, ভুজঙ্গদা এ সব টের পেয়েছেন কি না কে জানে!

সবাই প্রথমটা চমকে উঠলো।

সত্যহরিকে ওদেব লজ্জা করে না। শ্রী এবং নৃপেনবাবুর তো কথাই নেই। নিজেদেব মধ্যে নৃপেনকে ওরা বাবুদাদা এবং শ্রীকে বৌদি ব'লে পরিহাস করে। কিন্তু ভুজঙ্গকে ওরা ভয় পায়। মনের লোভ ও ইচ্ছার কথা তার কাছে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ কবে। তাব চোখের দিকে এখনও যেন তারা চাইতেই পারে না।

সুতরাং চুরি ধরা পড়লে চোর যেমন চমকে ওঠে, ওরাও ছোট-হেমের কথা শুনে প্রথমটা তেমনি চমকে উঠলো। অথচ ভুজঙ্গ ওদের কিই বা করতে পারে? সত্য কথা বলতে কি, কংগ্রেসের নেতা বলতে এখন নৃপেনকেই বলা যায়, ভুজঙ্গকে নয়। বস্তুত: ভুজঙ্গের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এখন এমনই শিথিল হয়ে এসেছে যে, তাকে এখন আব কংগ্রেসেব লোক বলা যায় কি না সন্দেহ।

অথচ তারা চমকে উঠলো! এবং এই ভাবটা মন থেকে দূর কববার জন্যে প্রকাশ বললে, না না। ভুজঙ্গদাব ওসব খবর নেবার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই।

ভুজঙ্গকে যারা চেনে, একথা মেনে নিতে তাদের কষ্ট হোল না। না, ভুজঙ্গ এসব জানে না।

ছোট-হেম জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ভুজঙ্গদা কি সত্যিসত্যিই কাপাসতলাব আশ্রমে ফিরে যাবেন? কি মনে হয় তোদের?

এ একটা প্রশ্ন।

সবাই কথাটা ভাবলে। সবাই এক বাক্যে বললে, পারেন।

প্রকাশ বিজ্ঞের মতো বললে, অন্যের কথা জানি না, কিন্তু ভুজঙ্গদা'র পক্ষে অসম্ভব নয়।

এমন সময় নৃপেন এবং শ্রী এসে উপস্থিত।

—কি গুল্‌তানি হচ্ছে তোদের?

প্রকাশ বললে, ভুজঙ্গদা এসেছিলেন।

—ভুজঙ্গ? তারপরে?

কেনারাম ফিক্ ক'রে হেসে বললে, কাপাসতলায় ফিরে যাচ্ছেন।

নৃপেন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সে আবার কোথায়?

শ্রী বুঝিয়ে দিলে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় ওঁরা সেখানে একটা আশ্রম করেছিলেন। সত্যদা, এরা, সব সেখানকারই কর্মী। বোধ হয় সেখানে ফিরে গিয়ে আশ্রম-জীবন যাপনের ইচ্ছা হয়েছে।

নৃপেন স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্রী হেসে জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে লাইট আছে, ফ্যান আছে?

কেনারাম হাত উল্‌টে বললে, কোথায় পাবেন? অজ পাড়া গাঁ!

—তাহ'লে ভয় পাচ্ছ কেন? তিনি যাবেন না। যদি যান, শীতের ক'টা মাস থেকে গরম পড়ামাত্র পালিয়ে আসবেন।

শ্রী বিজয়গর্বে হাসতে লাগলো।

কিন্তু নৃপেন তাতেই আশ্বস্ত হোল ব'লে মনে হোল না। বললে, না শ্রী, ভুজঙ্গকে বাঁধতে পাবে, এমন কোনো শক্তি আছে ব'লে আমি জানি না। কত দিন দুপুর বেলায় ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভাসছে। পাখা বন্ধ। আমি নিঃশব্দে পাখা খুলে দিয়ে চ'লে এসেছি।

প্রতিবাদে শ্রী কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে নৃপেন বললে, থাক সে কথা। আসলে ওর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। 'দুত্তোর' ব'লে চ'লে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব নয়।

সবাই চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ নৃপেন বললে, তারপর যে কথা বলতে এসেছি : তোদের মোটর-বাসের লাইসেন্স আজ মঞ্জুর হয়েছে। কাল-পরশু তোরা চিঠি পাবি। খদ্দেরও ঠিক করেছি, দু'হাজার অবধি উঠেছে, চাপ দিলে আরও এক হাজার উঠবে আশা করি। জমি কতদূর বেচলি ?

ন'কড়ি বললে, এখনও বাকি আছে শ' দুই বিঘের কম নয়।

প্রকাশ জোরের সঙ্গে বললে, তাও মাসখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করি।

পিঠ চাপড়ে নৃপেন বললে, ব্যস্। তবে আর ভাবনা কি ? বাড়ি তাহ'লে একখানা ক'রে হোল ! কি বলিস্ ?

বিগলিত কণ্ঠে ওরা জবাব দিলে, আপনার অনুগ্রহ।

শুভেন্দুর রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষা হয়ে গেছে। ডাক্তারে ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন —প্লুরিসি। দিন দুই থেকে জ্বরটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দুর্বলতা খুবই। এই দু'দিন ভুজঙ্গ ওবাড়ি যায়নি। শ্রী এসে গেছে। সুতরাং যাওয়ার তেমন আবশ্যকও ছিল না। মাঝে মাঝে টেলিফোনে খবর নিয়েছে।

গত সন্ধ্যাতেই ভুজঙ্গ শ্রীর উপমন্ত্রিত্ব লাভের খবর পেয়েছিল। ভেবেছিল, শ্রী অফিসে এলে তাকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু শ্রী আসতে পারেনি। আন্তরিক উৎসাহ না থাকলেও ভদ্রতা হিসাবে শ্রীকে একটা অভিনন্দন জানানো দরকার। এই মনে ক'রে সকালে ভুজঙ্গ শ্রীব বাড়ি গেল। গিয়ে দেখে, ওব ছোট বসবার ঘবখানিতে তিলধাবণেব ঠাঁই নেই। বহু লোক এসেছে অভিনন্দন জানাতে। তাদের কাকেও-কাকেও সে চিনতে পারলে, কিন্তু অনেকেই অপরিচিত ব'লে বোধ হোল। নৃপেনকে সেখানে দেখা গেল না। শ্রী নিজেই স্মিতমুখে অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করছে।

ভুজঙ্গ ভিতরে ঢুকতে পারলে না। বাইরে থেকেই অভিনন্দন জানালে।

শ্রী হাসলে। বললে, তুমি বরং ওঘরে গিয়ে বোসোগে ভুজঙ্গদা।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন শুভেন্দুবাবু ?

—অনেকটা ভালো।

ভুজঙ্গ পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, শুভেন্দুবাবু একখানা আরাম-কেদারায় শুয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ। ভুজঙ্গের পায়ের শব্দে পাশ ফিরে চেয়ে হাসলে : কি? আমাকে দেখতে, না অভিনন্দন জানাতে?

—উভয় উদ্দেশ্যেই।—ভুজঙ্গ হেসে জবাব দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

এই ক'দিনেই শুভেন্দু বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। যে ক্লান্তি ওর কণ্ঠস্বরে, সেই ক্লান্তি ওর চোখেও রয়েছে।

—একটু ভালো বোধ করছেন?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—আমি তো সকল সময়ই ভালো বোধ করার চেষ্টা করি ভুজঙ্গবাবু।

শুভেন্দু হাসলে।

—তা জানি। তবু জিগ্যেস করতে হয়, তাই জিগ্যেস করা।—ভুজঙ্গ উত্তর দিলে—কি ভাবছিলেন একা একা?

—ভাবিনি। শ্রী উপমন্ত্রী হোল। ওর জন্যে মনে মনে একটু প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।

শুভেন্দুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

—প্রার্থনাটা কি, শুনতে পাইনা?—ভুজঙ্গ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে।

শুভেন্দু নিরুত্তরে শুধু হাসলে।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, চেঞ্জে যাওয়ার কথা হচ্ছিল, কি ঠিক হোল?

—কিছুই ঠিক হয়নি। মন্ত্রিত্ব নেওয়ার পরে ওঁর পক্ষে কি আমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে? এখনও তো তেমন বল পাইনি। একাই বা যাই কি ক'রে?

সে একটা সমস্যা বটে।

শুভেন্দু আবার বললে, আমার মনে হয় ভুজঙ্গবাবু, তার দরকারও কিছু নেই। ওষুধ-পথ্য-বিশ্রামে এখানেই বেশ সেরে উঠব। কিন্তু ব্রততী শুনছে না।

—কি বলছে সে?

—বলছে, হাওয়া-বদল করলে যখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠব, তখন তাই করাই উচিত। আপনাকে বলেনি কিছু?

—ওই কথাই টেলিফোনে বলছিল একদিন।

—এর মধ্যে দেখা হয়নি একদিনও ?

– না। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়।

—এখানেও আর ঠিক আগের মতো আসে না। আসে রোজই বলতে গেলে, কিন্তু ঝড়ের মতো আসে, ঝড়ের মতো চ'লে যায়। এরা সবাই এমন কাজে ব্যস্ত হোলে আমাদের জীবন বাঁচে কি করে বলুন তো ?

শুভেন্দু হাসলে। ভুজঙ্গ সে-হাসিতে বিশেষ যোগ দিলে না।

বললে, ব্রততী বলছে, আপনি কাছাকাছি কোথাও চেঞ্জে যান। বিপিন আপনার সঙ্গে যাবে।

—বিপিন ছেলেমানুষ। সে কি আমাকে সামলাতে পারবে ?

—তা পারবে না কেন ?

—তারপরে দেখুন টাকা। এই অসুখেই ডাক্তারের ফি, ওষুধ, অনেক টাকা দেনা হোল।

—দেনা ?

—তা হোল বই কি ভুজঙ্গবাবু। ডাক্তারের ফিও দিতে হবে, ওষুধেব বিলও শোধ করতে হবে।

ভুজঙ্গ বুঝলে, কথাটা এইভাবেই ব্রততী শুভেন্দুকে বুঝিয়ে রেখেছে। নইলে হয়তো সে ডাক্তারও ডাকতে দিত না, ওষুধও খেতে চাইত না।

বললে, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়াটা যখন দরকার, তখন আরও কিছু না হয় দেনা হবে।

শুভেন্দু হেসে বললে, বুঝলাম। দেনা দেবার লোকও তৈরি আছে, তাও মানলাম। কিন্তু শোধ তো দিতে হবে।

ভুজঙ্গ হাসলে: কত টাকা দেনা হবে শুভেন্দুবাবু যে, আপনি চিন্তিত হয়ে উঠছেন ?

—সেজন্যে তো নয় ভুজঙ্গবাবু। অসুখটা ভালো নয়, জীবন-মৃত্যুর কথাও বলা যায় না। ওবিষয়ে আমি মনঃস্থির করেছি, চেঞ্জে যাব না। কিন্তু তাছাড়াও নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,—আপনাকে বলা হয়নি।

—কি সমস্যা ?

—সমস্যাটা হচ্ছে শ্রীকে নিয়ে।

শুভেন্দু চুপ করলে। ভুজঙ্গ উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো।

—মন্ত্রী হওয়ার পরে, এবাড়িতে থাকা শ্রীর পক্ষে নানাকারণে অসুবিধাজনক। এত লোকজনের ভিড়, এই ছোট বাড়িতে চলে না। বসবার জায়গা দিতে পারা যায় না। আমি তো এই একদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। এমনি রোজ চললে পাগল হয়ে যাব।

—শ্রী ইচ্ছা করলেই তো এখন একটা বড় বাড়ি পেতে পারে।

—সেই কথাই বলছেন উনি। কিন্তু সেই বাড়িতে আমাকেও টেনে নিয়ে যেতে চান, সেইটেই সমস্যা।

—বেশ তো। আপনিও যান না।

—তা হয় না ভুজঙ্গবাবু। সে বিষয়েও আমি মনঃস্থির করেছি।

ভুজঙ্গ লক্ষ্য করলে, এই শীর্ণ দুর্বল মানুষটি নিজে যেমন কারও ইচ্ছার উপর জোর করে না, নিজের ইচ্ছার উপরও তেমনি কাকেও জোর করতে দেয় না। এবং যেখানে সে মনঃস্থির করে ফেলে সেখানে তা অমোঘ।

মুখে বললে, কিন্তু এখানে এই শরীরে আপনি একা থাকবেনই বা কি করে ?

শুভেন্দু হাসলে। বললে, যেমন ক'রে অনেকদিন একা থাকি, তেমনি ক'রে। আপনারা যখন বম্বেতে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন, তখন কে ছিল আমার কাছে ? একাই তো ছিলাম। এই যে শ্রী দিল্লী ঘুরে এলেন, তখন তো বেশ অসুস্থ আমি, কে ছিল আমার কাছে ? ধরুন, আপনি যে চিরদিন একাই কাটালেন, কিছু কি অসুবিধা বোধ করেন ?

—আমার কথা আলাদা।

—কিছুই আলাদা নয় ভুজঙ্গবাবু। অসুবিধা-বোধটা আসলে মানসিক। মনে অসুবিধা বোধ না করলে আর অসুবিধা কি ?

—নেই কি ? তাহলে আপনি একা চেঞ্জে যেতে অসুবিধা বোধ করছেন কেন ?

—সেটা বিদেশ ব'লে। হঠাৎ দরকার পড়লে আপনাদের খবর দিয়ে আনতেও সময় নেবে ব'লে। এখানে তো তা নয়। শ্রী তো বলতে গেলে হাতের কাছেই রইলেন। তাছাড়া আপনি আছেন, ব্রততী আছে, ইলাও আসছে।

ভুজঙ্গ বললে, আমরা আছি এইমাত্র। নইলে আপনি তো কাউকে কখনও কোনো প্রয়োজনেই ডাকেন না।

এবারে শুভেন্দু হাসলে। বললে, ডাকি না, কারণ সত্যিই আমার প্রয়োজন হয় না। আপনারা হয়তো ক্ষুণ্ণ হন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রয়োজন আমার এতই কম যে কাউকে বড় একটা আবশ্যক হয় না।

এমন সময় শ্রী এল। উত্তেজনায় এবং উদ্দীপনায় তাকে খুব রক্তাভ দেখাচ্ছিল।

শুভেন্দু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার অভ্যাগতেরা সব বিদায় হলেন ?

—এখনকার মতো।—শ্রী উত্তর দিয়েই ভুজঙ্গের দিকে চাইলে. বললে,—কী অন্যায় দেখতো ভুজঙ্গদা, এই ছোট বাড়িতে অসুবিধা খুবই। একটা বড় বাড়িও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ উনি যেতে নারাজ।

ভুজঙ্গ বললে, সেই আলোচনাই হচ্ছিল এতক্ষণ।

—রাজি করাতে পারলে ?

—না। উনি বলেন, তুমি সেখানে চ'লে যাও। উনি এখানেই থাকবেন।

উত্তেজিতভাবে শ্রী বললে, তা কি হয় ? তা কি সম্ভব ?

শান্তকণ্ঠে শুভেন্দু বললে, কেন হবে না শ্রী ? তুমি উত্তেজিত আছ ব'লেই বুঝতে চাইছ না। অন্য কথা ছেড়ে দিলেও, তুমি মন্ত্রী হিসাবে যে-বাড়ি পাচ্ছ, আমি সেখানে কি সূত্রে থাকতে পারি বল তো ? তোমার স্বামী হিসাবে ?

—বেশ তো। সেই হিসাবেই থাকলে।—শ্রীর স্বর কিন্তু নরম হয়ে গেল।

শুভেন্দু বললে, তা আমি পারি না শ্রী। যা পারি না, তা করতে চেও না। কিন্তু তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে শ্রী। এ নিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না।

শ্রী অফিস চ'লে যাওয়ার একটু পরেই ব্রততী এল। জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন দাদা?

কৃত্রিম ক্রোধে চোখ পাকিয়ে শুভেন্দু বললে, দেখ, ওই প্রশ্ন রোজ কোরো না তো। আমি ভালো ছিলাম, ভালো আছি, ভালোই থাকব।

—ভালো থাকলেই ভালো। কে আর চাচ্ছে খারাপ থাকুন।

তারপর ভুজঙ্গের দিকে সহাস্যে চেয়ে বললে, কতক্ষণ এলেন ভুজঙ্গদা?

অনাবশ্যক বিবেচনায় সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, তুমি খানিকটা দেরি ক'রে এলে ব্রততী।

—কেন, বলুন তো?

—শ্রীকে অভিনন্দন জানাতে পেলে না। একটু আগে সে অফিস চ'লে গেল।

কৈফিয়তের সুরে ব্রততী বললে, কিছুতেই আসতে পারলাম না ভুজঙ্গদা। ঠাকুরপো এসেছিল সকালবেলাতেই। তার সঙ্গে দু'টো কথা না ব'লে আসা গেল না।

—কেমন আছে বিপিন?

—বললে তো ভালোই আছে। কিন্তু চেহারা দেখে তা মনে হোল না।

বিপিন যে অন্যত্র থাকে এ খবরটা শুভেন্দু আগেই শুনেছে যদিচ ব্রততীর কাছে নয়। সে বললে, সেটা তার চেহারার দোষ নাও হ'তে পারে ব্রততী, হয়তো তোমার চোখের দোষ।

—আমার চোখের দোষ? কি রকম?

শুভেন্দু বললে, তোমরা যাদের স্নেহ কর, তাদের চেহারা কোনো সময়ই তোমাদের চোখে ভালো ঠেকে না।

—বেশি বাগাবেন না শুভেন্দুদা। এই যে আপনার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে দেখছি এও আমার চোখের দোষ, না?

—আমার তো সেইরকমই সন্দেহ।—শুভেন্দু দুষ্টুমি ক'রে জবাব দিলে।

ব্রততীর স্বভাব হচ্ছে, যখন সে রেগে যায়, কথা বলতে পারে না। শুভেন্দুর পরিহাসে সে রেগে দুম দুম ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে শুভেন্দুর বিছানাটা পাততে

লাগলো। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? তখনই আবার ফিরে এসে ওদের কাছে বসলো। ভুজঙ্গ তখন বাড়ি বিভ্রাটের কথাটা ওকে জানালে।

শুনে ও খুশি হোল কি দুঃখিত হোল বোঝা গেল না। শুধু বললে, তার মানে আমারই ঝামেলা বাড়লো আর কি।

শুভেন্দু সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, কেন, তোমার কি ঝামেলাটা বাড়লো?

ব্রততী বললে, বাড়লো বই কি! আপনাকে একা রেখে আমি স্বোয়াস্তি পাব না। বিশবার খবর নিতে আসতে হবে।

—দরকার নেই আসবার। আচ্ছা, এরা আমাকে ভাবে কি বলতে পারেন ভুজঙ্গবাবু? আমি যে একটা বয়স্ক ব্যক্তি, কচি শিশু নেই, তা যেন ওরা ভুলেই গেছে।

ব্রততী বললে, আপনি কচি শিশুরও অধম। তারও ক্ষিধে তেষ্টার বোধ আছে। ক্ষিধে পেলে কাঁদে। আপনার সে-বোধও নেই।

তর্ক মিথ্যা বিবেচনা ক'রে শুভেন্দু চেয়ারে আরাম ক'রে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলে।

কৌতুকে ব্রততীর চোখ নেচে উঠলো। বললে, তার চেয়ে একটা কাজ করা যাক শুভেন্দুদা।

শুভেন্দু জবাবও দিলে না, চোখও মেললে না।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি আছে? বলুন। চোখ বন্ধ ক'রে প'ড়ে থাকলে চলবে না।

—যদি না থাকে?—শুভেন্দু বললে।

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে ব্রততী বললে, না থাকলে চলবে কেন, বাঃ!

শুভেন্দু সহাস্যে বললে, যদি তোমার জেদটাই বজায় রাখতে চাও, তাহ'লে আর আমাকে জিগ্যেস করা কেন? কি করতে চাও বল।

—চলুন, বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করা যাক। কলকাতাটা বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শুভেন্দু গম্ভীর ভাবে বললে, তাহ'লে ভুজঙ্গবাবুকে নিয়ে যাও।

—উনি কি দুঃখে যাবেন? 'কৃশানু'র সম্পাদক, রাজপুরুষদের অন্তর্গত।

ভুজঙ্গ তাড়াতাড়ি বললে, না ব্রততী, আমি রাজপুরুষদের কেউ নই। বরং আমাকেই নিয়ে চল। কিন্তু বৃন্দাবনে নয়।

—তবে?

—আমাদের কাপাসতলার আশ্রমে।

—সে কোথায়?

—বেশী দূরে নয়। সেখানেও কানাই-বলাই, শ্রীদাম-সুদাম পাবে। তবে এরা লীলা করে না। নিতান্তই দুঃখী কানাই-বলাই। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খেটেও দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। যাবে?

ব্রততী শুভেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলে, যাবেন?

—না। এই ঘরখানা ছেড়ে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

ভুজঙ্গ একটা নিশ্বাস ছেড়ে ব্রততীকে বললে, তোমারও সেই অবস্থা। তাহ'লে 'একলা চল, একলা চল, একলা চলরে'!

হঠাৎ ভুজঙ্গের কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেল। বললে, আমি সত্যিই চ'লে যাচ্ছি ব্রততী।

ওরা দু'জনেই চমকে উঠলো, সে কি!

—তাই। কবে যাব, কখন যাব, ঠিক নেই অবশ্য। হঠাৎ একদিন চ'লে যাব। হয়তো তোমাদের জানিয়ে যাবারও সময় পাব না। যেদিনই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, সেদিনই শেষ দেখা মনে করতে পার।

ওরা দু'জনেই স্তব্ধভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল। এ যে পরিহাস নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য, সে বিষয়ে ওদের সংশয় রইল না।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, কেন চ'লে যাবেন ভুজঙ্গদা? উনি কি কিছু বলেছেন?

—না ভাই। উনি এখনও জানেনই না। আসল কথা, আমার আর ভালো লাগছে না।

—কি ভালো লাগছে না? এই ক'লকাতা শহর?

—এই ক'লকাতা শহর এবং এখানে আমার এই বিলাসী জীবনযাত্রা। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার ধর্মের থেকে, আমার আত্মীয়দের থেকে

আমি যেন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছি। মেতে আছি বড় বড় কথার বুদ্বুদ নিয়ে খেলায়। ভুলে গেছি ছোট ছোট ঘরোয়া কথা, যা মানুষের একেবারে প্রাণের কথা। ভালো লাগছে না।

ওরা নিঃশব্দে ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে রইল।

ভুজঙ্গ বলতে লাগলো :

জীবন-যুদ্ধের কান্না-হাসির প্রকাণ্ড মৌচাক গ'ড়ে উঠেছে আমার সেই কাপাসতলা আশ্রমের আমবাগানে। সেই মধু ফেলে আমি এখানে কেন রয়েছি তাই তো বুঝি না। মানুষ এখানে কেন আসে বলতে পার? কত বন্ধু যে এখানে এসে হারিয়ে গেল, তার সীমা সংখ্যা নেই। নিজেকে হারাবার আগেই আমি ফিরতে চাই।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, এরা আপনাকে ছাড়বে কেন?

ভুজঙ্গ হাসলে : ডাক যখন আসে, কেউ কি তাকে আটকাতে পারে?

—আপনার সঙ্গে আর কে যাচ্ছে?

—আর তো কেউ যাচ্ছে না ব্রততী। ডাক তো দিলাম অনেককে। কেউ রাজি নয়। আজ আমি উঠি শুভেন্দুবাবু।

ব্রততী তাড়াতাড়ি উঠে বললে, আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, আজও তোমার গাড়ি নেই?

—না।

ব'লে ব্রততী ভিতরে চ'লে গেল। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে শুভেন্দুকে বললে, বাথরুমে আপনার গরম জল, ঠাণ্ডা জল দেওয়া হয়েছে। স্নান ক'রে আসুন। দেরি করবেন না। আমি আপনার খাবার জায়গা করছি।

শুভেন্দু বললে, আমাকে আপনার সেই শিমুলতলার আশ্রমে নিয়ে যাবেন?

সংশোধন ক'রে ভুজঙ্গ বললে, শিমুলতলা নয়, কাপাসতলা।

—ওই হোল। নিয়ে যাবেন?

—চলুন না।

—চলুন। মধুর লোভ আমার নেই। শুধু ব্রততী সেখানে থাকবে না, এই আনন্দেই যাব। এই মাষ্টারী আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

ব'লে হাসতে হাসতে বাথরুমে চ'লে গেল।

শুভেন্দুকে খেতে বসিয়ে দিয়ে ব্রততী বললে, চলুন ভুজঙ্গদা, বেলাও নিতান্ত কম হয়নি। চললাম শুভেন্দুদা, এ বেলার মতো মাষ্টারী শেষ, আপনার ছুটি।

—ধন্যবাদ।

ব্রততীকে নিয়ে ভুজঙ্গ গাড়িতে উঠলো।

বাড়ি পৌঁছে ব্রততী গাড়ি থেকে নেমে ভুজঙ্গকে ডাকলে: নামুন।

—কি হবে নেমে? আমি অফিসে চ'লে যাই।

সহাস্যে মাথা নেড়ে ব্রততী বললে, সেদিন চা না খেয়েই আপনাকে চ'লে যেতে হয়েছিল, মনে আছে?

—না।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে। নামুন।

—এত বেলায় আর চা খাব না ব্রততী।—ভুজঙ্গ হাত জোড় করলে।

—চা খাওয়াবার জন্যেই আপনাকে নামাচ্ছি কি না!

—তবে? আর কি খাওয়াবে?

ব্রততী হেসে বললে, তাও বলতে পারব না। অদৃষ্টে যা আছে, দুই ভাই-বোনে ভাগ ক'রে খাওয়া যাবে। নামুন।

ভুজঙ্গ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নামলো।

ব্রততী ড্রাইভারকে বললে, তুমি গাড়ি নিয়ে চ'লে যাও। তিনটে নাগাদ এসে বাবুকে নিয়ে যাবে।

ভুজঙ্গ সবিস্ময়ে বললে, তিনটে নাগাদ কি বলছ!

—ঠিকই বলছি। চলুন।

ড্রাইভারকে হাতের ইঙ্গিতে যেতে ব'লে ভুজঙ্গকে নিয়ে সে উপরে চলে গেল।

আহারাদির পর ভুজঙ্গ যখন খাটে শুয়ে বিশ্রাম করছে, তখন ব্রততী এসে একখানা চেয়ার খাটের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসলো।

একই দুঃখজনক প্রশ্ন যুগপৎ দু'জনেব মধ্যেই তোলপাড় করছে। কিন্তু বাইরে দু'জনেরই তাব কোনো চিহ্ন নেই।

হঠাৎ এক সময় ভুজঙ্গ বললে, আরও একদিন এই ঘরে, এই খাটে রাত কাটিয়েছি, না দিদি? সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

ভুজঙ্গের কণ্ঠস্বরে কি ছিল কে জানে, ব্রততীর বুকের ভিতরকাব উদ্বেলতা যেন ধীরে ধীবে শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। তবু সে কোনো সাড়া দিতে পারলে না।

ভুজঙ্গ বললে, সেদিন বাইরে কী ঝড়-বৃষ্টি মনে পড়ে?

ব্রততী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

কিছুক্ষণ পবে ভুজঙ্গ বললে, বাড়িতে খাবার যা ছিল, দুই ভাই-বোনে ভাগ ক'রে চমৎকার খাওয়া গেল। কিন্তু ভাই-বোনে শুধু কি আনন্দই ভাগ ক'রে নেয়, আর কিছু নয়?

—আর কি আছে?

—কেন দুঃখ। তাকেই বা তুমি তুচ্ছ করছ কেন?

ব্রততী গুম হযে কিছুক্ষণ ব'সে বইল। তাবপর ধীরে ধীবে বললে, আমাব যে দুঃখ তা কারও সঙ্গে ভাগ করার নয়।

—তবে থাক। আমাব দুঃখ কোথায় জান? আমার জীবনে যখন দুঃখ এসেছে, তোমাকে ডাকিনি। নিজের জোবে তুমি সেই দুঃখের অংশ আদায় ক'রে ছেড়েছ। সেই জোর আমাব মধ্যে নেই ব'লে দুঃখ পাই। আমাব ন্যায্য অংশ আমি আদায় করতে পাবি না। শুধু নিঃশব্দে দুঃখ পাই।

ব্রততীর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। কিন্তু কোনো সাড়া দিলে না।

ভুজঙ্গ নিজের ঝোঁকেই বলতে লাগলো: তাছাড়া আবও একটা দুঃখ এই যে, শ্রী

ব্রততী চীৎকার ক'রে বাধা দিলে: ওর কথা থাক। ভুজঙ্গদা, আমাদেব দুই ভাই-বোনের মধ্যে ওর কথা নয়।

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে রইল। ব্রততীকে এমন উত্তেজিত সে কখনও দেখেনি।

ব্রততী ধীরে ধীরে বলতে লাগলো : আমার গাড়ি নেই এইটেই আপনার চোখে পড়েছে। কিন্তু আমার নিঃস্বতা যে কতদূর পৌঁছেচে, জানেন না। জানার দরকারও নেই। কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন?

—কিন্তু কিছু কিছু জানি বই কি বোন। নইলে কষ্ট পাচ্ছি কেন?

—জানেন? কি জানেন? কতটুকু জানেন?—ব্রততী হেসে বললে,—কিছুই জানেন না।

—তুমি না বললে জানব কি ক'রে ব্রততী? আমি ভেবেছিলাম, সেই কথা বলবে বলেই আজ টেনে নিয়ে এলে। কিন্তু

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, সত্যিই তাই। ভেবেছিলাম, বলব। কিন্তু দেখলাম বলা যায় না। কি বলব? তিনি আসেন, হাসেন, গল্প করেন। কালকেও ওই হীরের ব্রোচটা কিনে দিয়েছেন,—কোথায় রাখলাম যেন ওই খানে। এই কথা বলব? এই কি কথা?

—এরও গভীরে? সেখানেও কি কোনো কথা নেই?

—না দাদা। আপনাকে সব কথা বলব ব'লে নিয়ে এসে দেখলাম, সেখানেও কোনো কথা নেই। বোধ করি কথা সেখানে পৌঁছয় না। সেখানে শুধুই অনুভূতি। তাই চুপ ক'রে রয়েছি।

ভুজঙ্গের সমস্তই হেঁয়ালি বোধ হচ্ছিল। এবং সেই দুঃসহ অন্ধকারে সে হাঁপিয়ে উঠছিল। দুর্দমনীয় আবেগে ব্রততীর একখানা হাত চেপে ধ'রে সে বললে, তুমি আমার সঙ্গে চল ব্রততী। আমি বাকি জীবনটা সত্যিই কাপাসতলার আশ্রমে কাটাব স্থির করেছি। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে না।

ব্রততী ওর হাত ছাড়িয়ে নিলে না। ম্লান হাস্যে বললে, তা হয় না।

—কেন হয় না? আমি তোমার দাদা। আমি নিয়ে গেলে কে বাধা দেবে?

—দেবে। বাইরে থেকে নাও যদি কেউ দেয়, বাধা আমার নিজের ভিতর থেকেই আসবে।

—কেন ?

—তা বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি, ওঁকে যদি সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে পারতাম, হয়তো বেঁচে যেতাম। তাছাড়া আর কোনো পথেই আমার মুক্তি নেই।

ভুজঙ্গের কাছে এও দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। সে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

ব্রততী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, শুভেন্দুদা দুঃখ-সুখের অতীত লোকে বাস করেন। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি আপনাদের দুজনের কথা বুঝতে পারি।

—আর একজন কে ?—ভুজঙ্গ প্রশ্ন করলে।

—ঠাকুরপো। জানেন ভুজঙ্গদা, আমার চাবির রিঙের ওপর তার লোভ ছিল প্রবল। যখনই কোনো কারণে টাকার তার প্রয়োজন হোত, আমি বুঝতে পারতাম রিঙের দিকে তার ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে। ভুলে তখন রিঙটা ফেলে রাখতাম তার দৃষ্টি পড়ে এমন কোনো জায়গায়। প্রয়োজন মিটলে আবার সেটা আঁচলে বাঁধতাম। ঠাকুরপো এখানে নেই বটে, কিন্তু প্রায় রোজই আসে। আবোল-তাবোল আজে-বাজে আগের মতোই বকে। কিন্তু চাবির দিকে আর চায়ও না। জানেন ?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, বোধ হয় বুঝেছে, তোমার বাক্স-আলমারী খালি।

—খালি ? আগের চেয়েও অনেক বেশি ভর্তি। আগে কত টাকা কতদিকে খরচ করতাম, এখন সংসারের নিছক প্রয়োজন ছাড়া আর একটা পয়সাও খরচ করিনা। শুভেন্দুদার চিকিৎসায় যা খরচ করেছি, তিনি মাইনে পাওয়া মাত্র তা কিছু কিছু ক'রে আদায় করে নিই।

—তাই নাকি ?—ভুজঙ্গের বিস্ময়ের সীমা নেই।

—হ্যাঁ। কেন নোব না ? আমার দাদার কি পয়সার অভাব আছে যে, পরের পয়সা শোধ করবেন না ?

—পরের পয়সা !

—না তো কি বলুন ?

একটু চুপ ক'রে থেকে ভুজঙ্গ বললে, আমারও তো পরের কাছে অনেক দেনা হয়ে রয়েছে ব্রততী,—কত টাকা তাও জানি না। সেও তো শোধ দিতে হবে ?

—আপনার আবার কিসের জন্যে দেনা ?

—হয়েছিল। বম্বেতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সময়।

—কার কাছে ? আমার কাছে ? আমি কি পর ?

—তবে শুভেন্দু বাবুর বেলায়

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, সেদিন আর এদিন এক নয় ভুজঙ্গদা। আপনি ওসব বুঝবেন না ভুজঙ্গদা। থাক

—ব্রততী, তোমার এই কথাটা বোঝবার জন্যে গত ক'দিন থেকে আমি যে কী প্রচণ্ড চেষ্টা করছি তাও তুমি বুঝবে না। যত বুঝতে পারছি না, ততই আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছি। তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না ব্রততী।

তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং সজল।

ব্রততী চমকে ওর দিকে চেয়ে রইলো। তারপরে ধীরে ধীরে বললে, তাহ'লে শুনুন। ওঁর ঐশ্বর্যের অংশ নিতে আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। তবু কিছু কিছু নিতে হয়, পাছে ব্যাপারটা বাড়ির লোকজন দাস দাসীর চোখে ঠেকে। এ যে কত বড় যন্ত্রণাদায়ক তা ব'লে বোঝাবার নয়।

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো সেদিনের কথা যেদিন ব্রততীর শাণিত ইঙ্গিতে পানোন্মত্ত নৃপেনও উঠতো বসতো। তার একটা হুকুমে বিনাপ্রতিবাদে নৃপেন হাজার টাকা বের ক'রে দিয়েছে এও তার চোখে দেখা।

জিগ্যেস করলে, তোমার যে ইঙ্গিতে নৃপেন উঠতো-বসতো সে-ইঙ্গিত গেল কোথায় ?

ব্রততী ম্লান হেসে বললে, সেও ওঁরই একটা ঐশ্বর্য ভুজঙ্গদা! তাও আর স্পর্শ করি না।

ভুজঙ্গের বুঝতে বাকি রইলো না নিঃস্বতার শেষ প্রান্তে এসে ব্রততী পৌছেচে। পৌছেচে স্বেচ্ছায়, নিঃশব্দে, তার আত্মসম্মানের আভিজাত্যে।

তবু, নিষ্ফল জেনেও আরও কিছু যেন সে বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় বিপিন এল।

বিপিন আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। তার মুখে এবং শরীরে সেই কমনীয়তা আর নেই। চোখের দৃষ্টিও তেমন শান্ত নয়। তাতে কি রকম একটা উগ্র রুক্ষতা এসেছে। এই পরিবর্তন এমনই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ যে ভুজঙ্গ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেই দিকেই চেয়ে রইল।

বিপিন বললে, আমি আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করতে যেতাম। ভালোই হোল, এখানে দেখা হয়ে গেল।

তার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ, কথাতেও আর জড়তা নেই।

ভুজঙ্গ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে! কেন বল তো?

—শুনলাম আপনি নাকি কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন?

—তাই নাকি। আমি এখনও শুনিনি তো!

এই উত্তরেও বিপিন কিন্তু অপ্রস্তুত হোল না। হেসে বললে, আমি কিন্তু শুনলাম, কলকাতা ছেড়ে আপনি বাইরে কোন আশ্রমে নাকি চ'লে যাচ্ছেন?

—কোথা থেকে শুনলে?

—সে শুনে কি করবেন। যাচ্ছেন কিনা বলুন না?

—যাওয়ার চেষ্টা করছি বিপিন।

—কি করবেন সেখানে গিয়ে?

—কিছুই করব না ভাই। রাজনীতিতে যখন যোগ দিই তখন সেইখানে একটা আশ্রম আমরা করেছিলাম। অনেক দিন ছিলাম সেখানে। তারপরে কাজের টানে ধীরে ধীরে চ'লে আসি এখানে। ভাবছি আবার সেখানেই ফিরে যাব।

—কিছুই করবেন না? করবার কি কিছুই নেই?

—করবার তো অনেক কিছুই আছে বিপিন। কিন্তু আমার শক্তি কই?

বিপিন হো হো ক'রে হেসে উঠল : বলেন কি! আপনার শক্তি নেই? আপনার যে শক্তি এখনও রয়েছে তার এক কড়া থাকলে আমরা বেঁচে যেতাম।

মাথা নেড়ে ভুজঙ্গ বললে, না বিপিন, আমার আর শক্তি নেই। তাছাড়া কাজ অনেক করেছি। কাজের তাগিদে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি এতকাল। কিছুই হয়নি। সব মিথ্যা প্রমাণিত হোল।

— সে ভুল কি সংশোধন ক'রে যাবেন না?

—না। সে তাগিদ আর ভেতরে অনুভব করছি না। কাজ আমাকে আব টানছে না। আর কাজ নয় বিপিন, বাকি জীবনটা শুধু মানুষকে ভালোবাসবার চেষ্টা করব, সুখে দুঃখে তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবার চেষ্টা করব।

বিপিন নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। ওকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাবপর বললে, একে কি আপনি অবসাদ বলবেন না ভুজঙ্গদা?

—না। মনে আমার যতক্ষণ আশা রয়েছে, ভারতবর্ষের কল্যাণ সম্বন্ধে যতক্ষণ আমি হাল না ছাড়ছি, ততক্ষণ আমি একে অবসাদ বলব না। তুমি ভুল সংশোধনের কথা বলছিলে? একেই আমি বলব ভুল-সংশোধন।

ভুজঙ্গ বলতে লাগলো: আমার কেবলই মনে হচ্ছে বিপিন, ভুল আমরা যেখানে কবেছি সে এইখানে। ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতিব সংখ্যাতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য রাজনীতির বড় বড় তত্ত্ব আমাদের বোধ হয় অভিভূত ক'বে ফেলেছিল। তাব উপর ছিল মতবাদের কলহ-কোলাহল। তার ফলে আমরা নিজের অহঙ্কাবকেই শুধু ভালোবেসেছিলাম। আর তাব পরিণতি তো চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

—তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনাব কথাও ঠিক বুঝতে পারছিনা।

—কিছুই বিচিত্র নয়। তোমার বয়সে আমিও বুঝতে পারিনি। অনেক ঘা খেয়ে এখন বুঝছি।

ভুজঙ্গ হাসলে।

বিপিন অসহিষ্ণুভাবে বললে, মানুষকে ভালো কি আমরাই বাসি না ভুজঙ্গদা ? কিন্তু সেইটেই তো কোনো কাজ নয়। তার সঙ্গে কাজ না করলে কি ক'রে চলবে ?

প্রশান্ত হাস্যে ভুজঙ্গ বললে, চলবে। অন্ততঃ সেই পরীক্ষাই করতে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার খবর বল।

—আমার আর খবর কি ? কিছু কিছু কাজ করছি।

—আনন্দ পাচ্ছ ?

—কিছু কিছু পাই বই কি।

—মনে কোনো সংশয়, কোনো দুর্বলতা বোধ কর না ?

বিপিন তখনই তার জবাব দিতে পারলে না।

ভুজঙ্গ ওকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আবার বললে, বল। লুকিও না।

বিপিন ধীরে ধীরে বললে, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না ভুজঙ্গদা, মাঝে মাঝে সংশয় আসে, দুর্বলতাও বোধ করি। কিন্তু কেন করি তা জানি না।

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, কাজের ধর্মই তাই। এতে সংশয় আসে, দুর্বলতা আসে। কিন্তু আমি যে নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে ডুব দিতে চলেছি, আশা করি তাতে এ বালাই থাকবে না।

ভুজঙ্গ চ'লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বিপিনও উঠে দাঁড়ালো।

বললে, আমি এসেছিলাম আপনাকে আমাদের মধ্যে পাবার জন্যে। বুঝলাম সে সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি তো আমাকে আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে ডাক দিলেন না !

ভুজঙ্গ হেসে বললে, আমি তো সেখানে দল গড়তে যাচ্ছি না বিপিন যে, পাঁচজনকে ডাক দোব। আমার তো কাউকে দরকার নেই। আজকে উঠলাম ভাই।

বিপিন তাড়াতাড়ি ওর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, আমাকে কি আশীর্বাদও করবেন না ?

—না ভাই। তোমরা সমস্ত আশীর্বাদের ঊর্ধ্বে। কর্মের প্রবাহে তোমরা গা ঢেলে দিয়েছ, বিধাতার আশীর্বাদও আজ তোমাদের কাছে অনাবশ্যক।

বিপিন আবার জিজ্ঞাসা করলে, আপনি যাওয়ার আগে ঠিকানা দিয়ে যাবেন তো?

তেমনি প্রশান্ত হাস্যে ভুজঙ্গ জবাব দিলে, তারও আবশ্যক হবে না বিপিন। যদি সত্যিই কোনোদিন আমার প্রয়োজন বোধ কর, ঠিকানার জন্যে সে প্রয়োজন আটকাবে না।

ঊনত্রিংশ

জাতি শুধু তলোয়ারের জোরেও বড় হয় না, শুধু অর্থ-সম্পদের জোরেও না। জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নৈতিক বলের উপর। কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা এনেছে ব'লে যারা দম্ভ করে, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তাদেরই আজ জাতির জনক গান্ধীজির জীবনাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং সর্বাঙ্গীন সংযোগ রক্ষা ক'রে চলা প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখা আবশ্যক, সেই আদর্শ বিলাস, ব্যসন ও দুর্নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

এই বিষয়বস্তু নিয়ে ভুজঙ্গ সাত দিন ধ'রে পর পর সাতটি অত্যুগ্র প্রবন্ধ লিখলে 'কৃশানু'তে। ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং আন্তরিকতার মাধুর্যে সেগুলি যেন পাঠকদের পাগল ক'রে তুললো। সত্যহরির দলে সোরগোল প'ড়ে গেল। তারা সবাই নৃপেনকে নিয়ে টানাটানি করে। কিন্তু নৃপেন অসহায়। ভুজঙ্গকে কিছু বলার সাহস তার নেই। এ সময় যদি ভুজঙ্গকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে, পাঠকদের যে রকম মনের ভাব, তাতে কাগজ ডুববে। তাছাড়া নৃপেনের আরও একটা মুস্কিল হয়েছে, প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কাগজের বিক্রি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আরও যদি বাড়ে তাহ'লে সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন বাড়ারও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। নৃপেন ব্যবসাদার মানুষ। 'লাভ' বস্তুটাই তার সমস্ত কর্মপ্রেরণার চরম চরিতার্থতা। তার জন্যে

সে দলগত এবং ব্যক্তিগত সকলভাবেই গালাগালি খেতে প্রস্তুত। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে সে এই জটিল ব্যাপারের মধ্যে মাথা গলাতে প্রস্তুত হোল না।

সে পরিষ্কার বললে, সত্যহরিবাবু, ভুজঙ্গ যেমন আমার বন্ধু তেমনি আপনাদেরও। আমি তাকে যেমন চিনি, আপনিও তেমনি চেনেন। সে যখন লিখতে আরম্ভ করেছে তখন সহজে থামবে ব'লে মনে হয় না। অন্ততঃ আমার সাধ্য নেই যে থামাই। আপনারা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন।

সত্যহরি চুপ ক'রে রইল। কারণ সেও ভালো ক'রে জানে, তার অনুরোধও নিস্ফল হবে। বরং যা এখন মতান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, অনুরোধ করার ফলে তা মনান্তরে দাঁড়াবে। তবু বললে, শ্রী চেষ্টা করলে পারেন না?

শ্রীর সম্বন্ধে ভুজঙ্গের সাম্প্রতিক মনোভাব সত্যহরির অজ্ঞাত, কিন্তু নৃপেনের নয়। বললে, বোধ হয় না। তবু তিনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন।

শ্রীকে ডাকা হোল। সে নৃপেনের কথাই সমর্থন করলে।

নৃপেন বললে, কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি ওর মনে একটা অস্বস্তি এসেছে। ও 'কৃশানু' ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সেই পুরোনো আশ্রমে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সত্যহরি বললে, কথাটা আমাকেও একদিন বলেছে। কিন্তু সত্যিসত্যিই সেই মশা আর ম্যালেরিয়া আর কচুরীপানার দেশে ও যে ফিরে যেতে পারে, এ আমি সেদিনও বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না।

শ্রী সায় দিলে, আমিও না।

নৃপেন বললে, কিন্তু আমি করি। এবং বহু সাধ্যসাধনায় ওকে কোনোমতে আটকে রেখেছি।

সত্যহরি জিজ্ঞাসা করলে, আর কে যাচ্ছে ওর সঙ্গে?

নৃপেন বললে, বোধ হয় আর কেউ না। আমি যতদূর জানি, ছেলেদের কাছেও প্রস্তাবটা ও পেড়েছিল। তারা রাজি হয়নি।

সত্যহরি সবিস্ময়ে বললে, তাহ'লে? ও একলা সেখানে গিয়ে থাকবে? পাগল হয়েছেন আপনি?

নৃপেন হাসলে। বললে, পাগল আমি হইনি। সত্যিই সে যাবে। আমার মনে প্রবল আশঙ্কা, আমিও তাকে শেষ পর্যন্ত ধ'রে রাখতে পারব না।

গুরুতর চিন্তার বিষয়।

—কিন্তু করা যায় কি ?—সত্যহরি অবশেষে জিজ্ঞাসা করলে।

কারও মাথায় কিছুই আসছে না।

—একটা চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে, যদিও সে বিষয়েও আমার গভীর সন্দেহ আছে।—অনেকক্ষণ পরে নৃপেন বললে।

—কী চেষ্টা ?—সত্যহরি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

—ওকে মন্ত্রিসভায় নিন।—নৃপেন ধীরে ধীরে বললে।

—মন্ত্রিসভায় !

সত্যহরি এবং শ্রী একসঙ্গে গভীর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলো।

—সে কি সম্ভব নয় ?—নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে।

সত্যহরি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার ফলে অনেকেই আমাদের ওপর বিরক্ত হয়েছে সত্যি। অনেকেই প্রবল ক্ষোভে আমাদের মধ্যে থেকেই আমাদের সম্বন্ধে সত্যি-মিথ্যে অনেক কথা রটনা ক'রে বেড়াচ্ছে। আপনার কি সন্দেহ হয় নৃপেন বাবু, ভুজঙ্গও তেমনি ব্যর্থতার জ্বালায় এই সব লিখছে ?

—আমি ঠিক জানি না।—নৃপেন উত্তর দিলে,—কিন্তু এমন হওয়া বিচিত্র নয়। সকল মানুষেরই এ রকম দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। সত্যি বলতে কি, আমাদের অনুমান সত্যি কিনা, প্রস্তাব দিলেই তারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সত্যহরি আবার ভাবতে বসলো।

মন্ত্রিসভায় ভুজঙ্গকে নেওয়া সম্বন্ধে তার আগ্রহ খুব বেশি বোধ হোল না। বললে, তাহ'লেই তো মুস্কিল নৃপেনবাবু। সবাই মন্ত্রী হ'তে চায়,—যোগ্যতা থাক বা না থাক।

বাধা দিয়ে নৃপেন বললে, কিন্তু ভুজঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে না।

—তা ওঠে না।—সত্যহরি বললে—ভুজঙ্গের সম্বন্ধে আমি সে কথা বলছিও না। আমি বলছি, সকলেই মন্ত্রী হ'তে চায়। এবং তারা যদি বুঝতে পারে, গালাগালি দিতে পারলেই মন্ত্রিসভায় প্রবেশ সহজসাধ্য হয়, তাহ'লে সকলেই সেই পথ অবলম্বন করবে। তখন তো দল রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে নৃপেনবাবু।

সে কথা সত্য, তা নৃপেনকেও স্বীকার করতে হোল। রক্তের স্বাদ দেওয়া বাঘকে শান্ত করার উপায় নয়। অথচ এক্ষেত্রে করাই বা যায় কি! ভুজঙ্গ যদি ক্রমাগত দিনের পর দিন এইভাবে লিখতে থাকে, তাহ'লেই কি দলের সম্মান বাড়বে? না হয় তাকে 'কৃশানু' থেকে সরানো গেল, কিন্তু তার হাত থেকে কলম তো আর কেড়ে নেওয়া যাবে না। তাকে অসন্তুষ্ট রেখে দলের কতখানি লাভ, কতটাই বা লোকসান হ'তে পারে তাও বিবেচনার বিষয়।

সত্যহরি বললে, দেখি আরও সকলের সঙ্গে আলোচনা ক'রে। তারপরে যা হয় স্থির করা যাবে।

রেলগাড়িতে অত্যন্ত ভিড় থাকলে দেখা যায়, গাড়ি ষ্টেশনে এসে থামলেই যাত্রীরা মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করে। যার গায়ে জোর আছে সে বল-প্রয়োগের সাহায্যে, যে কৌশলী সে কৌশলের সাহায্যে এবং যে দুর্বল সে বাক্‌পটুতায় আরোহীদের করুণা আকর্ষণ ক'রে গাড়িতে একটুখানি ঠাঁই করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠাঁই পাওয়ামাত্র তাদের জোর, কৌশল এবং যুক্তি-তর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা গ্রহণ করে। নৃপেন দেখলে, মন্ত্রিসভার অবস্থাও সেই রকমই। যারা বাক্‌পটুতায় কৌশলে অথবা বল-প্রয়োগের দ্বারা কোনোক্রমে মন্ত্রিসভায় একটু ঠাঁই পেয়েছে, সে সেইখানে আর একজনকে ঠাঁই দেবার নামে খড়্গহস্ত। যারা বাইরে আছে এবং ভিতরে একটুখানি স্থানলাভের জন্যে লালায়িত, তারাও অন্যকে ঢুকতে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী।

কিন্তু নৃপেন অসামান্য কৌশলী। সে বহু কৌশলে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মত আদায় করলে। বিনিময়ে তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হোল যে, এই

জন্যে দলের মধ্যে গাত্রদাহ-জনিত কোনো বিরোধিতা দেখা দিলে তার সে সন্তোষজনক সমাধান করবে। অবশ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রতিশ্রুতির যে কোনো মূল্যই নেই তা মন্ত্রিসভার সদস্যেরাও জানে, সে নিজেও জানে। রাজনীতিতে ন্যায় অথবা অন্যায় কোনো একটা জিনিষ একবার ঘটে গেলে প্রথমে একটা তুমুল গণ্ডগোলের সম্মুখীন হ'তে হয় বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। বিরোধীপক্ষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা শেষ পর্যন্ত মেনেই নেয়। তবু আপাতত প্রতিশ্রুতি তাকে একটা দিতেই হোল।

পরের দিন রাত্রে সে ভুজঙ্গকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে।

ভুজঙ্গ একটু অবাক হোল। নৃপেনের গৃহে খাওয়া তার এই প্রথম নয়। বহুদিন খেয়েছে এবং আরও বহুদিন খাওয়ার প্রত্যাশা রাখে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে নিমন্ত্রণ কেউ কখনও করেনি,—না নৃপেন, না ব্রততী। সুতরাং তার অবাক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার হে! কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান আছে না কি?

—না, না। এমনি দুটো ডাল-ভাত খাওয়া আর কি।

—কিন্তু তার জন্যে এত আগে থাকতে নিমন্ত্রণ তো এর আগে কখনও করনি।

—আজও করছি না। শুধু কোনো কাজে বেরিয়ে না যাও, সেইজন্যেই জানিয়ে রাখলাম।

—ও।

বিস্ময় তার যত বেশিই হোক না কেন, কৌতূহল বস্তুটা তার স্বভাবতই কম। সুতরাং একটা 'ও' শব্দের দ্বারাই এই পরিচ্ছেদের সে সমাপ্তি টানলে।

কিন্তু নৃপেনকে জের টানতে হোল অনেকখানি। প্রথমত নিমন্ত্রণের আগের রাত্রে সে একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। এবং সাধারণত একটা পা ভেঙে গেলেও যে লোক নিঃশব্দে শুয়ে শুয়ে রসিকতা করে, এই কাল্পনিক শিরঃপীড়া নিয়ে সে এমন হৈ চৈ আরম্ভ করলে যে, ব্রততীকেও সভয়ে তার শিয়রে এসে বসতে হোল, তখনই টেলিফোনে ডাক্তারকে ডাকতে হোল এবং বহুদর্শী প্রবীণ চিকিৎসককেও প্রচুর ফি'র লোভে

প্রায় তিন-কোয়ার্টার যাবৎ বুক, পিঠ, পেট, জিভ, নাড়ী পরীক্ষা ক'রেও এত বড় যন্ত্রণার কোনো কারণ নির্ণয় করতে না পেরে ভাবতে হোল কি প্রেসক্রিপশন করা যায়। অবশেষে মাথা-ধরার দুটো ট্যাবলেট প্রচুর জলসহযোগে গলাধঃকরণের ব্যবস্থা ক'রে তিনি ব'লে গেলেন, ভয়ের কিছুই তিনি পেলেন না। তবু এত যন্ত্রণা যখন হচ্ছে এবং ইতিপূর্বে এ রকম যন্ত্রণা যখন হয়নি তখন কাল সকালে আর একবার এসে তিনি ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে যাবেন।

তাই হোল। সে রাত্রে এক গ্লাস বার্লির সরবৎ ছাড়া আর কিছুই নৃপেনকে দেওয়া হোল না। ধীরে ধীরে তার চিৎকার কমে আসতে লাগলো। আরও খানিক পরে যেন একটু তন্দ্রার মতোও এলো। কিন্তু নিজে দু'টি খেয়ে নিয়ে অনেক রাত্রে ব্রততী আবার যখন এলো তখন চকমক ক'রে চেয়ে নৃপেন কাকে যেন খুঁজছে। ব্রততী কাছে এসে দাঁড়াতেই নৃপেন তার একখানা হাত ধ'রে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, বোসো।

ব্রততী ওই খাটখানির শেষ প্রান্তে নিঃশব্দে বসলো।

নৃপেন তাকে আরও কাছে আকর্ষণ ক'রে বললে, আর একটু স'রে এস। যন্ত্রণা আর নেই বটে, কিন্তু জোরে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

ব্রততী আর একটু স'রে এল। বললে, কথা বলতে যখন কষ্ট হচ্ছে তখন কথা বলার দরকার কি! ঘুমোও। আমি বরং মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

ব্রততী নৃপেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। নৃপেনও চোখ বন্ধ ক'রে সম্ভবত একটু ঘুমুবারই চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মিনিট দশ-পোনেরো মাত্র। তারপরেই মাথা থেকে ব্রততীর হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললে, রাজনীতি আমি ছেড়ে দোব ব্রততী। নইলে ম'রে যাব দেখছি।

ব্রততী অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। নৃপেন কি প্রলাপ বকছে?

নৃপেন বলতে লাগলো: চারদিন ধ'রে কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। মাথার যন্ত্রণা সেই জন্যেই।

ব্রততী তখনও তেমনিভাবে চেয়ে।

নৃপেন ব'লে চললো : দেখ লোকে ওঁদের যত নিন্দা করে, তেমন নিন্দার লোক ওঁরা নন। এ আমি ভেতরে থেকে নিঃসন্দেহে বুঝেছি। ওঁরা অসাধু নন, আসলে দুর্বল। চারিদিকে যে সব অন্যায় ঘটে তার অনেক কিছুই ওঁরা টের পান না। যা টের পান, দুর্বলতার জন্যে তাও চেপে যান। এই হোল আসল কথা। বুঝলে?

ব্রততী আর থাকতে পারলে না। সভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো : কি আবোল-তাবোল বকচ তুমি? কাদের কথা বলছ?

—আবোল-তাবোল নয় গো, কর্তাদের কথা বলছি। চারদিন ধ'রে সেই নিয়ে ঝগড়া।

—কি নিয়ে ঝগড়া?

—ওই দুর্বলতা নিয়ে। বললাম, একজন বলিষ্ঠ লোক মন্ত্রিসভায় নাও।

ব্রততী তখনও ঠিক নিঃসংশয় হতে পারেনি যে, নৃপেন প্রলাপ বকছে না। বললে, তারপরে?

—তারপরে শেষ পর্যন্ত রাজি হোল।

—কিসে রাজি হোল?—ব্রততীর সংশয় অনেকখানি কেটে এসেছে।

—ভুজঙ্গকে নিতে।

ব'লে নৃপেন নির্নিমেষে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

ব্রততী কিন্তু নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বললে, ভুজঙ্গদাকে? আমাদের ভুজঙ্গদাকে?

—হাঁ। বাংলা দেশে ভুজঙ্গবাবু বললে শুধু ওকেই বোঝায়।—নৃপেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে।

ব্রততীর বুকের ভিতরটা উত্তাল হয়ে উঠেছে। সে কি বলবে, কি করবে, ভেবে না পেয়ে শুধু চঞ্চল নেত্রে চারিদিকে চাইতে লাগলো।

নৃপেন বললে, কিন্তু সমস্যার এইখানেই শেষ নয়।

—কেন?

—আসল সমস্যাটাই এখনও প'ড়ে রয়েছে।

—কি সেটা?

—ভুজঙ্গকে রাজি করা।

তাইতো! আনন্দের অতিশয্যে আসল সমস্যাটাই ব্রততীর চোখে পড়েনি। অর্থের লোভ, সম্মানের লোভ, প্রভুত্বের লোভ তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তার অন্তর সাড়া না দিলে সে কোনো কাজেই হাত দেবে না। তাহ'লে?

—কাল রাত্রে তাকে এখানে খেতে বলেছি।—নৃপেন বললে।

—আমাদের এখানে?

—হ্যাঁ।—নৃপেন গম্ভীর ভাবগর্ভ কণ্ঠে বলতে লাগলো,—এই জন্যেই। নিজের ওপরে ভরসা পাই না। আমাব ভরসা তুমি। পৃথিবীতে কেউ যদি তাকে রাজি করাতে পারে, সে তুমি। এবং তুমি যদি রাজি করাতে পারো বাংলা দেশ বেঁচে গেল।

আনন্দে ব্রততীর মনে হোল তার শরীরে যেন কোনো ভার নেই। যেন পালকেব মতো হালকা হয়ে গেছে।

পরক্ষণেই নৃপেন বললে, কিছু খাবার আছে ব্রততী? বড় ক্ষিধে পেয়ে গেল যে!

ব্রততী হেসে ফেললে। এক গাস বার্লিতে এই দৈত্যটার কি হবে! বললে, দেখি কি আছে।

রাত্রে ভুজঙ্গ যখন খেতে এল, মনে তার নানা সন্দেহ দোলা দিচ্ছে। কৌতূহলও প্রবল। মন তার সকল সময়েই সতর্ক। যখন সে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল তখন তার মনের অবস্থা অনেকটা এই রকম ছিল। গান্ধীজির যে প্রকাশ্য আন্দোলন তার মধ্যে সতর্কতার স্থান ছিল না। সবই তার প্রকাশ্য, গোপন কিছুই নেই। কিন্তু বিপ্লবের একটা বড় অঙ্গই হোল সতর্কতা। তাকে সব সময় সতর্ক এবং তৎপর থাকতে হয়, যাতে মুহূর্তের অসতর্কতায় ধরা না পড়ে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ভুজঙ্গের হাতে-খড়ি গান্ধীজির আন্দোলনে। সুতরাং সতর্কতার শিক্ষা তার ছিল না। ১৯৪২-এর অগষ্ট বিপ্লবের সময় এই শিক্ষা মানুষের আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবেই দেখা দেয়। সেই প্রবৃত্তি, যা তার মনের অতলে আবার ডুবে গিয়েছিল, যেন নতুন ক'রে দেখা দিল।

ব্রততীর কাছে এলে তার মনের বাঁধন যেন ঢিলে হয়ে যায়। উচ্ছ্বসিত উদার হাস্যে নিজেকে সে পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত ক'রে দেয়। কিন্তু, কোথায় কি যে ঘটেছে, আজ আর সে নিজেকে যেন তেমন পরিপূর্ণ ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারছে না। নৃপেন ওর এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, কখনও সামনে কখনও বা পিছনে সোফায় ঠেস দিয়ে কথা বলছে,—ওর চোখও সতর্কভাবে যেন তার গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

অবশেষে কথাটা উঠলো।

নৃপেন বললে, তোমার গত ক'দিনের সম্পাদকীয় পড়লাম।

মুহূর্ত মধ্যে ভুজঙ্গের মন এবং বুদ্ধি যেন কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পড়লে? কেমন লাগলো?

—ভালো। খুব ভালো।—নৃপেন উচ্ছ্বসিতভাবে উত্তর দিলে,—দেখ ভুজঙ্গ, লেখা-টেখা আমি যে খুব পড়ি কিংবা বুঝি তা নয়। আমি যে ভালো বললাম তার মানে এই একটা সপ্তাহেই কাগজের বিক্রি হাজার কয়েক বেড়ে গেছে। আমার ভালো-মন্দ হচ্ছে কাগজের বিক্রি বাড়া-কমা নিয়ে।

নৃপেন হাসতে লাগলো।

—তাই নাকি!—ভুজঙ্গ একটু বিস্মিতই হোল,—আমি ভেবেছিলাম তোমরা এতে উত্তেজিত হয়ে উঠবে আমার বিরুদ্ধে।

—তোমরা মানে?

—তুমি এবং তোমার কর্তৃপক্ষ।

ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীরভাবে নৃপেন কি যেন ভাবলে। বললে, কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে তোমার অনুমান একেবারে অমূলক নয়। তবে তাঁরা যতখানি উত্তেজিত ব'লে তুমি সন্দেহ করছ ততখানি উত্তেজিত হয়তো নন।

—না হ'লেই ভালো। চাকরীটা থাকে তাহ'লে। বাঙ্গালী-সন্তান, চাকরী যাওয়াটা আমাদের কাছে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয়।

ভুজঙ্গ হাসতে লাগলো।

ব্রততী চা আর একটা প্লেটে ক'রে কিছু হালকা খাবার নিয়ে এল।

ভুজঙ্গ বললে, এ কি! আর কিছু খাওয়াবে না?

ব্রততী হেসে ফেললে। বললে, ভয় নেই। আরও আছে। কিন্তু তার এখনও দেরিও আছে। ইতিমধ্যে এইগুলোর সাহায্যে একটু ধৈর্য ধারণ করুন।

—তা মন্দ নয়।

ভুজঙ্গ প্লেটটা টেনে নিলে।

নৃপেন বললে, কিন্তু গালাগালি না হয় অনেক দিলে। কিন্তু সমাধান কোথায়?

—সমাধান গ্রামে চ'লে যাওয়া।

—সেখানে গিয়ে কি হবে?

—তাদের চিনতে হবে, জানতে হবে, তাদের অভাব-অভিযোগ বুঝতে হবে।

—আচ্ছা, অন্যের সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু সত্যহরিবাবু তো গ্রামের লোকদের চেনেন, জানেন, তাদের অভাব-অভিযোগও বোঝেন।

—বুঝতেন। এখন ভুলে গেছেন।

—বেশ। কিন্তু সবাই যদি গ্রামে চ'লে যান তাহ'লে গভর্ণমেণ্ট চালাবে কে?

ভুজঙ্গ হেসে উঠলো। বললে, এঁরাই চালাবেন। নৃপেন, সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এঁরা বনবাসী হবেন এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি, গ্রামের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্যাণ-রাষ্ট্র চালানো যায় না।

নৃপেন কথাটা যেন কিছুক্ষণ বোঝবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, এ সম্বন্ধে তুমি কোনো পরিকল্পনা দিতে পার?

—না। কারণ কাজ যাঁরা করেন, নিজেদের পরিকল্পনা তাঁরা নিজেরাই তৈরী ক'রে নেন। একের পরিকল্পনা অন্যের কোনো কাজেই আসে না। আমার পরিকল্পনা মাত্র আমাকেই সাহায্য করতে পারে, অন্যকে নয়।

নৃপেন পট্ ক'রে বললে, বেশ তো। তুমিই এস না মন্ত্রিসভায় তোমার পরিকল্পনা নিয়ে।

ব'লেই ব্রততীকে ইঙ্গিত করলে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রততীও সুর মেলালে: বেশ তো। তাই আসুন না ভুজঙ্গদা।

ভুজঙ্গ অবাক। কোনো রকমে তার মুখ থেকে বের হোল: কোথায়?

—মন্ত্রিসভায়।—উভয়েই সমস্বরে ব'লে উঠলো।

ভুজঙ্গ সতর্ক ছিল বটে, কিন্তু এ রকম একটা প্রস্তাব সম্বন্ধে সে কল্পনাও করেনি। সুতরাং এই অতর্কিত এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সামলাতে তার কয়েক মিনিট সময় দরকার হোল।

তারপর পরিহাস-তরল কণ্ঠে ব্রততীর দিকে চেয়ে বললে, তোমার কর্তা আমাকে মন্ত্রিসভায় থাকতে দেবেন কেন? আমি গেলে তো তাঁর অসুবিধাই হবে।

নৃপেন অম্লান বদনে স্বীকার করলে, হবে। তোমার মতো লোক আসে এ আমি চাইব না। কিন্তু অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, তুমি না এলে আমি আরও অসুবিধা ভোগ করব। সুতরাং তুমি এস, এ আজ আমিও চাইছি।

ব্রততী বললে, তাহ'লে?

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, কি তাহ'লে?

—আর আপনার আপত্তির কি আছে?

ভুজঙ্গ বললে, আমাকে কি তোমার কর্তার সুবিধা-অসুবিধার বাহন মনে কর? আমার নিজের কি কোনো পৃথক সত্তা নেই?

ওর কথায় এবং কণ্ঠস্বরে ব্রততী চমকে গেল। কিন্তু নৃপেন এ প্রশ্নের জন্যেও যেন প্রস্তুত ছিল।

হেসে বললে, আমার সুবিধার জন্যে আমি তোমাকে মন্ত্রিসভায় ডাকছি না ভুজঙ্গ। তুমি বললে, আমি তোমার যাওয়ায় বাধা দোব। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম, কেন আমার পক্ষ থেকে বাধা পাবে না। এই মাত্র।

ব্রততী করুণ নেত্রে ভুজঙ্গের দিকে চাইলে।

ভুজঙ্গ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নৃপেনের দিকে চাইলে। মৃদুহাস্যে বললে, তুমি যখন আমাকে নিমন্ত্রণ করলে তখনই আমার মনে নানা

সম্ভাবনার কথা উঠেছিল। কিন্তু স্বীকার করব, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা আমার কল্পনায় প্রান্তেও আসেনি।

নৃপেন তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বললে, এবারও তুমি ভুল করলে ভুজঙ্গ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন আসলে ব্রততী,—আমি নই এবং এ রকম একটা প্রস্তাব তোলবার জন্যেও নয়।

—তাই নাকি ?

ভুজঙ্গ ব্রততীর দিকে চাইলে।

ব্রততী স্বামীর মিথ্যায় সায় দিতেও পারলে না, আপত্তি জানাতেও পারলে না। নিঃশব্দে পায়ের নখ দিয়ে মেঝেয় দাগ কাটতে লাগলো। নৃপেন এ পর্ব এখনই আর টানতে চাইলে না। ভুজঙ্গকে একটু ভাববার সময় দেওয়া দরকার। লোভ তখনই-তখনই কাজ করে না। সময় পেলে ধীরে ধীরে বিরুদ্ধতাকে জারিয়ে আনে।

সুতরাং ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার রান্নার কি বেশি দেরি আছে ?

ব্রততী ব্যস্তভাবে বললে, না না। মোটেই দেরি নেই।

নৃপেন বললে, তাহ'লে তুমি সেই ব্যবস্থা দেখ। ইতিমধ্যে আমি স্নানটা সেরে নিই। একটুক্ষণ তুমি একলা থাক ভুজঙ্গ, আমার বেশি দেরি হবেনা।

ব্রততী খাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে গেল, নৃপেন স্নানের। ভুজঙ্গ একা ব'সে ব'সে সমস্ত বিষয়টি ভাবতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে এই প্রসঙ্গ আবার উঠলো এবং ব্রততী জেদ ধ'রে বসলো, এ প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে!

ভুজঙ্গ হেসে বললে, প্রস্তাবটা কোথায় ? নৃপেন বলছে এবং তুমি জেদ করছ। অথচ কেউই প্রস্তাব তোলার মালিক নও।

ব্রততী বললে, কিন্তু প্রস্তাবটা সত্যিই কর্তাদের কাছ থেকে আসছে। ডাকব ওঁকে ?

নৃপেন ইচ্ছা ক'রেই আসেনি। ব্রততীর উপর ছেড়ে দিয়েছে সমস্ত ভার।

ভুজঙ্গ বাধা দিয়ে বললে, না, ওকে আর ডাকতে হবে না।

ব্রততী অদূরে একটা চেয়ারে চেপে ব'সে বললে, তাহ'লে সমস্তটা বলি শুনুন। আপনি বলছিলেন, উনি আপনার মন্ত্রিসভায় যাওয়ায় বাধা দেবেন? কিন্তু উনিই আজ চারদিন থেকে কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন আপনাকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার জন্যে।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ আমাকে নেওয়ার প্রশ্নই বা উঠছে কেন?

—উঠছে কি সাধে?—আনন্দে এবং গর্বে চোখ-মুখ বিস্ফারিত ক'রে ব্রততী বলতে লাগলো,—কি লেখাটা ক'দিন ধ'রে লিখছেন! চারদিকে সাড়া প'ড়ে গেছে যে। কর্তাদেরও টনক নড়ে উঠেছে। কাজেই

বাধা দিয়ে ভুজঙ্গ সহাস্যে বললে, কাজেই যে-লোকটা লিখছে ঘুস দিয়ে তার মুখ বন্ধ কর, কেমন?

প্রথমটা ব্রততী এই প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে বললে, দূর, তা কেন!

—তবে?

—ওঁরা বুঝেছেন, আপনার মতো একজন আদর্শনিষ্ঠ শক্ত লোক না গেলে এই অবস্থার উন্নতি হবে না।

—অর্থাৎ আমার অভাবেই এই কাজটা আটকে আছে?

—আছেই তো!—ব্রততী উৎসাহের সঙ্গে বললে।

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, এই কথাটা তুমি যত সহজে বুঝছ, আমি তত সহজে বুঝতে পারছি না ব্রততী। তুমি রাজনীতি কর না, বোঝও না। তাই এর পিছনে যে গভীর খেলা আছে তা ধরতে পারছ না।

—বেশ। সেইটেই আমাকে বুঝিয়ে দিন। তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ওখানে যাবার জন্যে জেদ করব না।

ভুজঙ্গ আবারও হাসলে। ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললে, না ভাই, তোমার বুঝেও কাজ নেই। আমার একটি বোন অন্তত থাক যে রাজনীতির কদর্য পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে।

ব্রততী কিন্তু এতেই বিগলিত হোল না। বললে, না, ও সব বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। মন্ত্রিত্ব না নিয়ে সেই দূর গাঁয়ে আপনি

কী করবেন? সেখানে গিয়ে কি মন্ত্রিত্ব নেওয়ার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবেন?

—হ্যাঁ। অনেক বেশি, যদি আমি কাজে নামি। কিন্তু আমি সেজন্যেও যাচ্ছিনা ব্রততী।

—কি জন্যে যাচ্ছেন তবে?

—কিছুই না করবার জন্যে।

ওর উত্তর শুনে ব্রততী অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে ভুজঙ্গ বললে, তুমি অবাক হচ্ছ ব্রততী, বিপিনও অবাক হয়েছিল এমনি। তোমাদের বয়সে আমিও কাজ ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না। মানুষ নিষ্কর্ম থাকতে পারে এ আমি তখন ভাবতেই পারতাম না। আর আজ

ভুজঙ্গ চুপ করলে।

একটুক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, আর আজ?

—আজ বুঝেছি কাজেরও উর্ধ্বে আছে নৈষ্কর্ম্য।

—সে কি রকম?

—তা ঠিক জানি না। আমার মনে সামান্য একটু উপলব্ধি এসেছে মাত্র, সামান্য একটু আলো। কাপাসতলার আশ্রমে অবশিষ্ট জীবন আমি সেই পরীক্ষাই করব।

ভুজঙ্গ চুপ করলে। তারপর আবার বলতে লাগলো:

সারাটা জীবন কাজে পাগল হয়ে ঘুরলাম। আজ তার পরিণতিও দেখছি। বুঝেছি প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়াও আছে। জমার অঙ্কে আমরা যত কাজ জমাই, খরচের অঙ্কে ঠিক সমপরিমাণ অকাজও জমাই। আমাদের কাজে আমরা যত কর্মী সংগ্রহ করেছি, নিজের অজ্ঞাতসারে ততোধিক 'স্পাই'ও সৃষ্টি ক'রে গেছি। যত সাধু বানাবার চেষ্টা করেছি, তত অসাধুও সৃষ্টি করেছি। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। কাজ করতে গেলে অকাজের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। এবারে করব নৈষ্কর্ম্যের পরীক্ষা। শুধু ভালোবেসে যাব, ভালো করবার মিশনারী বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে সমস্ত মানুষকে পরমাত্মীয় ভাববার চেষ্টা করব। এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না।

ব্রততী বললে, ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি কিছু এগিয়েছে ?

—অনেকখানি। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়া পরে দু'বার ওখানে গেছি। ওখানকার যাদের আমরা চিনতাম, তাদের অনেকেই আর ইহলোকে নেই। কিন্তু তাদের ছেলেরা আমাকে চিনতে পেরেছে। গয়ারামের ছেলে কাণিকুড়ো। গয়ারামের স্ত্রী ছিল মৃতবৎসা,—ছেলে হয়ে কিছুতে বাঁচতো না, আঁতুরেই মারা যেতো। আমি তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করি। অবশেষে এই কাণিকুড়ো হোল। এখন সে জোয়ানমর্দ। বিয়ে-থা করেছে। সে কি বললে জানো ? বললে, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি খুড়োঠাকুর। আপনি আসুন। আমার এই কালো গাইটার দুধ রইল আপনার জন্যে। হেসে বললাম, না বাবা, সবটা আমাকে দিও না। তা'হলে তোমার কচি ছেলেটা গালাগালি দেবে। ও দুধ আমরা দুই ভাইএ ভাগ ক'রে খাব বরং। হেসে কাণিকুড়ো বললে, তাই হবে। আপনি আসুন তো আগে।

ব্রততী বললে, আমি যখন আপনার আশ্রমে যাব, দেখাবেন তো এই কাণিকুড়োকে ?

—আমাকে দেখাতে হবে না ভাই, সেই এসে সকলের আগে দেখা দেবে। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবছি ব্রততী।

—কি কথা ?

—আমি যেদিন গেলাম, ওদের মাঠে সেদিন প্রথম বর্ষার বৃষ্টি নামলো অনেক প্রতীক্ষার পরে। কাণিকুড়োর বুড়ি মা আমাকে প্রণাম ক'রে বললে, তুমি যখন এসে গেছ দাদাঠাকুর, আর আমাদের ভয় নেই।

হেসে বললাম, সে কি গো ছোট-বৌ, ভয় নেই কেন ?

বললে, আমি জানি আর ভয় নেই। তোমার দয়ায় আমি যেমন ক'রে ওই কাণিকুড়োকে পেয়েছি, তোমার দয়ায় ওরাও তেমনি মাঠ-ভরা ফসল পাবে। আমার মন বলছে পাবে গো, তুমি শুধু আর দেরি কোরো না।

ব্রততীর দিকে চেয়ে ভুজঙ্গ বললে, স্থির করেছি দেরি আর করব না। কিন্তু ভয় পাই তারপরে যদি ওরা মাঠ-ভরা ফসল না পায় ! কাপাসতলায় যাওয়ার

দুঃখ কেউ কখনও পায়নি। আজ পাচ্ছে। অবর্ণনীয় দুঃখ। আমি যাওয়ার পরেও যদি এমনি দুঃখই পায় ব্রততী!

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে ব্রততী জোর ক'রে বললে, তা পাবে না ভুজঙ্গদা। ওদের মন যখন ডেকেছে, সে ডাক মিথ্যা হবে না, তুমি দেখে নিও।

এই প্রথম ব্রততী ভুজঙ্গকে তুমি বললে।

ত্রিশ

ভুজঙ্গ মন্ত্রিত্ব না নেওয়ায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠতো এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তাছাড়া কখন যে কি ক'রে বসতো তারও ঠিকানা নেই। হয়তো মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে উঠতো। এ আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা শ্রীও স্বীকার করে। তবু কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দিনরাত সে ছটফট করতে লাগলো। অবশেষে নৃপেনকে একদিন ধ'রে বসলো ভুজঙ্গকে মন্ত্রিসভায় আনতেই হবে। সে যে শ্রীদের থেকে দূরে, শ্রীদের থেকে উঁচুতে মুনি-ঋষির মতো ব'সে থাকবে এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। পরিষ্কার ব'লে দিলে সে কথা।

নৃপেন ওর যন্ত্রণার হেতু বুঝলে। কিন্তু কি করতে পারে সে? বললে, সে নিজে রাজি না হোলে আমি কি করতে পারি বল? আমি নিজে কত চেষ্টা করলাম, দেখলে তো? আর কি করা যেতে পারে?

ঝুঁকি মেয়ের মতো মাথা নেড়ে শ্রী বললে, তা জানি না আমি। কিন্তু তুমি অঘটন ঘটাতে পার। এও তোমাকে করতে হবে।

নৃপেন বিব্রতভাবে বললে, এখানে আমি কি করতে পারি বল? আমার জোর তো টাকার জোর, মূলধন মানুষের অর্থলোভ। অঘটন যদি আমি ঘটাতে পারি তো সেখানেই পারি। কিন্তু অর্থ যাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, তার কাছে আমি অসহায়, এ তুমি বোঝ না কেন?

শ্রী রেগে বললে, ও। তার মানে আমরা লোভী, আমাদের নিয়ে তুমি খেলাতে পার। আর ভুজঙ্গদা নির্লোভ, তার কাছে তুমি অসহায়। এই তো? বেশ!

শ্রী নৃপেনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দিলে।

এত বড় বিপদে নৃপেন জীবনে কখনও পড়েনি। নৃপেন আবার ব্রততীর শরণ নিলে। ব্রততী পরিষ্কার জবাব দিলে, তিনি মনঃস্থির ক'রে ফেলেছেন একটা নতুন জীবন যাপন করার জন্যে। পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই তাঁকে টলাতে পারে।

—নতুন জীবন, নতুন জীবন করছ, কিন্তু সেই নতুন জীবনটা কি আমাকে বুঝিয়ে দাও দিকি।—অসহিষ্ণুভাবে নৃপেন প্রশ্ন করলে।

—তা আমি জানি না। তাঁর নিজের কাছেও সে রূপ খুব স্পষ্ট নয় বললেন। শুধু আভাষ জেগেছে মাত্র।

—সেই আভাষের জন্যে ধাবধাড়া-গোবিন্দপুরে গিয়ে লোকটা মশা তাড়াবে? আর আমরা তার বন্ধু, আমাদের কিছুই করবার নেই? এ একটা কথা হোল?

—করবার কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

অসহায়ভাবে ব্রততী জবাব দিলে। মশা-মাছির ভয়ে তার মনটা বেদনায় একটু দুলেও উঠলো।

নৃপেন তা লক্ষ্য করলে। বললে, তুমি আর একবার চেষ্টা করবে না?

—না।

—কেন?

—কারণ বুঝেছি তাতে লাভ হবে না।

নৃপেন চুপ ক'রে রইলো।

ব্রততীর মনটা তখনও দুলছিল। বললে, তুমি তো দিনকে রাত কর, রাতকে দিন। তুমিই আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

নৃপেন রেগে গেল। বললে, আমার ওই একটা ক্ষমতাই তোমরা দেখেছ। কিন্তু আমিও যে সব পারি না, তা তোমরা বুঝবে না।

সে বেরিয়ে গেল। এবং ঘুরতে ঘুরতে ভুজঙ্গের কাছেই গেল।

ভুজঙ্গ তখন তার শোবার ঘরে খোলা-গায়ে মেঝের উপর ব'সে। তার এক পাশে কয়েকখানি বই একটা ন্যাকড়ায় পুঁটলী-বাঁধা, অন্য পাশে বইএর একটা স্তূপ। সামনে কতকগুলো ছেঁড়া চিঠি। আর কয়েকখানা চিঠি তার কোলের উপর।

নৃপেন জিজ্ঞাসা করলে, কি ওগুলো ?

—জীবনভোর কত জঞ্জাল জমিয়েছি তারই খতিয়ান করছি।

ভুজঙ্গ হাসলে।

—কি হবে ওগুলো ?

—ওই বইগুলো বিলি ক'রে দোব আমার সহকর্মীদের মধ্যে। ছেঁড়া চিঠিগুলো পুড়িয়ে দোব। আর এইগুলো

ভুজঙ্গ একটা অদ্ভুত করুণভাবে হাসলে।

—এগুলো কি হবে ?—নৃপেন প্রশ্ন করলে।

—এগুলোর মমতা এখনও কাটাতে পারলাম না। অগষ্ট বিপ্লবে আমাদের দলের যে ছেলেগুলি মারা গেছে, এর মধ্যে তাদের কয়েকজনের চিঠি আছে। পুলিশের তাড়া খেয়েও কি ক'রে যে এই চিঠিগুলো রক্ষা পেয়েছে কে জানে !

—তুমি সত্যিই যাবে ?

নৃপেন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে। ভুজঙ্গ স্থাণুর মতো স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারও চোখ শুষ্ক নয়।

বললে, হ্যাঁ ভাই। আমাকে মিথ্যে আটকাবার চেষ্টা কোরো না। যাওয়া সম্বন্ধে আমার আর কোনো দ্বিধা নেই। শুধু যাওয়ার আগে একটি অনুরোধ তোমার কাছে করতে চাই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নৃপেন বললে, অনুরোধ নয় আদেশ বল।

—না অনুরোধই। ওখানে আমার খরচ খুব সামান্যই হবে। তাও সেখানকার লোকেরাই বহন করতে রাজি হয়েছে। আমি সংকল্প করেছি শুধুশুধু তাই বা নোব কেন ? ওদের ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্যে একটা পাঠশালা খুলব। কিন্তু ওরা অত্যন্ত দুঃস্থ নৃপেন। খুব ভালো হয়,

নৃপেন কথাটা আর ওকে শেষ করতে দিলে না। বললে, ঠিক আছে। এখান থেকে মাসে মাসে দুশো টাকা ক'রে তোমার কাছে যাবে।

ওর উদারতায় ভুজঙ্গ এক মুহূর্তের জন্যে অভিভূত হয়ে পড়লো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, অত টাকার দরকার হবে না ভাই। আমার প্রয়োজন ত্রিশটি টাকার। খাওয়া-দাওয়ায় পোনেরো টাকার বেশি যাবে না, আব পোনেরো টাকার বই। তাও আমি অমনি নোব না, তোমার কাগজে কিছু কিছু লেখা পাঠাব মাঝে মাঝে। রাজনীতি বিষয়ে নয়, সুতরাং ছাপতে আপত্তির কোনো কারণ থাকবে না।

ভুজঙ্গ হাসলে।

নৃপেন করুণভাবে বললে, তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি জানি না, কেবলই আঘাত দিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আমি স্থির করেছি, তোমার কোনো ব্যবহারেই আমি দুঃখ করব না। সে যাই হোক, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, দুশো টাকা ক'রেই তোমার কাছে যাবে। তোমার নিজের হয়তো প্রয়োজন হবে না, কিন্তু আরও কত প্রয়োজনে লাগতে পারে।

ভুজঙ্গ হাত জোড় ক'রে বললে, না নৃপেন, দশের প্রয়োজনে আবশ্যক হোলে আমি তোমার কাছে অসঙ্কোচে হাত পাতবো, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে একটি পয়সাও ভিক্ষা নোব না।

নৃপেন যেন জ্যামুক্ত ধনুকের মতো ছিটকে লাফিয়ে উঠলো : তুমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা নেবে না? কে ভিক্ষা নেবে তা'হ'লে? আমরা কাকে ভিক্ষা দোব?

ভুজঙ্গ চমকে উঠলো।

নৃপেন বললে, তুমি শুধু জেনে রেখেছ আমরা ভিক্ষা দিই অনুগ্রহ করবার জন্যে। কিন্তু তা নয়। যদি বলি ভিক্ষা দিই দশের কাছে আমাদের যে দেয়, একের হাত দিয়ে সেই দেয় পৌঁছে দেবার জন্যে?

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে রইলো। বললে, এভাবে কথাটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি নৃপেন। তবু মন আমার এখনও প্রস্তুত নয়। ত্রিশ টাকার কথাই রইলো, মন প্রস্তুত হোলে অবশ্যই তোমার কাছে ভিক্ষা নোব। ভালো কথা, শুভেন্দুবাবু কেমন আছেন জানো? আমি ক'দিন যেতে পারিনি তাঁর কাছে।

নৃপেনের মুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া খেলে গেল। বললে, ভালো নয়।

—কেন ?

—আমার নিজের খুব ভালো লাগছে না ভুজঙ্গ। ভয় হয়, যক্ষ্মায় না দাঁড়ায়।

—যক্ষ্মা !—ভুজঙ্গ চমকে উঠলো।

দু'জনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

তখন শেষ অপরাহ্ন। পাশের বাড়ির দেওয়ালে গোধূলির আলো একেবারে মিলিয়ে যায়নি,—কিন্তু বিদায় বেদনায় মলিন।

না, কাজটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। নতুন জীবনের জন্যে এই কয় সপ্তাহ মনকে সে প্রস্তুত করছিল। সে কাজটা যতই জরুরী হোক, শুভেন্দুকে দেখতে যাবার প্রয়োজন তারও চেয়ে নিশ্চয়ই জরুরী। কে তাকে দেখাশুনা করছে, তাই বা কে জানে ? ব্রততী আছে নিশ্চয়ই। সমস্ত কাজের মধ্যেও একবার ক'রে সে ছুটে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু শ্রী কি করছে ? অফিসের কাজ ফেলে সে কি শুভেন্দুর দিকে মনোযোগ দিতে পারছে ? কথাটা নৃপেনকে জিজ্ঞাসা-করা হয়নি। মনে যে আসেনি তা নয়, কিন্তু ওদের দুজনের ব্যাপারটা নিয়ে প্রকাশ্যে এখন এমনই ঘোঁট চলছে যে, এ নিয়ে প্রশ্ন করতে তার সঙ্কোচে বাধলো। তা সে যাই হোক, এখনই একবার যাওয়া দরকার। বই, কাগজ পত্র মেঝেতে যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে রইল। ভুজঙ্গ একটা পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো।

যখন সে গিয়ে শুভেন্দুর বাড়িতে পৌছুল তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। শোবার ঘরে খাটের উপর শুভেন্দু শুয়ে। ব্রততী পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফিডিং বট্‌ল্ ক'রে কি যেন ওকে খাওয়াচ্ছে।

ভুজঙ্গকে দেখে তেমনি প্রসন্ন হাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে শুভেন্দু বললে, আসুন, আসুন। অনেকদিন আসেননি। আজ সকালেই আমি ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, ভুজঙ্গবাবুর অসুখ-বিসুখ করেনি তো ? বললে, ভালোই আছেন।

ভুজঙ্গ হেসে জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ অসুখের কথা আপনার মনে হোল কেন ?

—কি জানি ! নিজে বিছানা নেওয়ার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেন আমারই মতো বিছানায় শুয়ে। পৃথিবীটা যেন হাসপাতালে ব'নে গেছে !

শুভেন্দু হাসলো। আবার বললে, তারপরে ? আপনার শিমুলতলায় যাওয়ার কদ্দুর ?

ভুজঙ্গ হেসে বললে, নামের ভুলটা আপনার আর শোধরাবে না। সে চেষ্টাও করব না। ব্যাপারটা এগিয়েছে অনেক দূর। এখন এঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে হয় !

ব'লে ব্রততীর দিকে ইঙ্গিত করলে।

—যা বলেছেন ! আমিও ওই উৎপাতের মধ্যে রয়েছি !—শুভেন্দু হাসলে।

শুভেন্দুর খোঁচাটা ব্রততী গায়ে মাখলে না। ডাক্তারে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলার পর থেকে ব্রততী তাকে আর খাট থেকে নামতে দিচ্ছে না। নিজে তো নয়ই, যখন সে থাকে না তখন চাকরটা পাহারা দেয়। অনিয়ম করলে ব্রততীকে লাগায় এবং ব্রততী বকাবকি করে। সুতরাং শুভেন্দুর খোঁচা দেবার সঙ্গত কারণ আছে। কাজেই ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে বললে, আমি তো তোমার যাওয়ায় আর বাধা দিই নি ভুজঙ্গদা।

শুভেন্দু ধমক দিলে। বললে, তুই থাম ! তোরই অত্যাচারে সবাই পালাচ্ছে তা কি বুঝতে পারিস না ?

শুভেন্দু হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ বললে, তুমি বাধা না দিলে কি হবে ? এইমাত্র তোমার কর্তা এসে এক রাশ কেঁদে গেলেন।

শুভেন্দু বললে, তবে ! বাধা দিস না বলছিলি ?

ব্রততী জবাব দিলে, অপরাধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই ফলের রসটুকু খাওয়ার জন্যে আমি কি সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থাকব ? চালাকি আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছ ?

শুভেন্দু অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেললে। বললে, বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা দে, যতটা আছে সবটা একসঙ্গে দিয়ে পালা।

ব্রততী সবটা ওর মুখে ঢেলে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে পাত্রটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ভুজঙ্গও বেরিয়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারে কি বলছে?

—ভালো নয়।

—যক্ষ্মা?

ব্রততী কথা বলতে পারলে না। ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই বটে।

—কি ব্যবস্থা হচ্ছে?

—চিকিৎসা চলছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে সীটেব চেষ্টাও হচ্ছে।

—সে আব বেশি কথা কি। শ্রী ব'লে দিলে,

—হ্যাঁ। অসুবিধা হবে না। দিন কয়েকেব মধ্যেই একটা কেবিন পাওয়া যাবে আশা করছি।

শ্রীব প্রসঙ্গ উঠতে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, তার খবর কিছু জান?

—ইউরোপ যাচ্ছে।

—ইউরোপ? কি ব্যাপার।

—সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি নাকি জানবাব জন্যে। এতদিন চ'লে যেত, শুভেন্দুদাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে যেতে পারছে না।

ব্রততী ভুজঙ্গের দিকে চাইলে। ভুজঙ্গ চুপ ক'রেই রইল।

ব্রততী আবার বললে, একটু আগে ওঁব সঙ্গে দেখা হযেছে বললে না?

—হ্যাঁ।

—নিজের কথা কিছু বললেন?

—নিজের কি কথা?

—ইউরোপ যাওয়ার কথা?

—নৃপেনও কি ইউরোপ যাচ্ছে না কি?—ভুজঙ্গ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—তাই তো শুনছি। এক সঙ্গেই না কি।

—সেও কি সেচ-ব্যবস্থা দেখতে যাচ্ছে ?

ব্রততী হেসে ফেললে। বললে, না। ব্যবসা সম্পর্কে কি নাকি প্রয়োজনে।

ভুজঙ্গ আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। স্বাভাবিকভাবেই বললে, কই, কিছু বললে না তো।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। একটু পরে ব্রততী বললে, ভাবছি কি নিয়ে থাকব ?

ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা অবসাদের সুর বেজে উঠলো যে, ভুজঙ্গ চমকে উঠলো। বললে, কেন ?

ব্রততী বললে, শুভেন্দুদা ছিলেন, ওঁকে শুশ্রূষা ক'রে কিছুটা সময় কাটতো। উনি তো হাসপাতালে চ'লে যাচ্ছেন। তুমিও চ'লে যাচ্ছ। একা কি ক'রে যে দিন কাটবে !

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে রইলো। জবাব খুঁজে পেলে না।

ব্রততীর কথাগুলি ঘুঘু-ডাকা ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের মতো ভুজঙ্গের মনে একটা উদাস সুরের ঝঙ্কার তুলে দিল। দিন কাটানো যে এত বড় একটা ভয়ানক সমস্যা এর আগে সেকথা ভাবার উপলক্ষ্য ভুজঙ্গের জীবনে কখনও আসেনি। তার দিন কেটেছে ঝড়ের পাখায়, নয়তো অন্ধকারে। সাথীহারা জীবনে সময়ের তরঙ্গ যে হঠাৎ জমে বরফ হয়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, এ সম্ভাবনা কোনো দিনই তার মনে আসেনি।

শুভেন্দু থাকবে না, ভুজঙ্গ থাকবে না, ব্রততীর দিন কি ক'রে কাটবে ? কিন্তু আরও যার কথা সে বললে না সেই নৃপেনের নামও কি এর মধ্যে লুকিয়ে নেই ? কথাটা তারই ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালেই তো উঠলো।

আশ্চর্য মেয়ে ব্রততী। ওকে যতই বোঝবার চেষ্টা করে ততই ভুজঙ্গের দুর্বোধ্য ঠেকে।

বাড়ি ফিরে ভুজঙ্গ দেখে বিপিন একখানা সোফায় নিদ্রামগ্ন। রাত বেশি হয়নি। বোধ করি সওয়া দশটা। এর মধ্যে বিপিন এল কখন, ঘুমিয়েই বা

গেল কখন, জানবার জন্তে ভুজঙ্গ চাকরটাকে ডাকলে। সে বললে, ভুজঙ্গ চ'লে যাবার একটু পরেই এসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল ভুজঙ্গ কখন ফিরবে। চাকরটা বলতে না পারায় সে অপেক্ষা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তারপরে কখন যে ঘুমিয়ে যায় তা সে বলতে পারে না।

—চা দিয়েছিলি?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—উনি চা চান নি।

—তা তো চাননি। কিন্তু অতক্ষণ যে ভদ্রলোক বসে আছেন তাকে চা দেবার কথা তোর মনে হয়নি?

চাকরটা লজ্জা পেয়ে বললে, এখন করব চা?

—থাক। ও হয়তো এখনই চ'লে যাবে।

ভুজঙ্গ কাঁধের উপর একখানা হাত রাখতেই বিপিন চমকে চোখ মেললে। বললে, আপনি!

—হ্যাঁ। তুমি কি মনে করেছিলে?

চোখ মুছে লজ্জিত হাস্তে বিপিন বললে, পুলিশ!

তারপর বললে, অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন এলেন আপনি?

—এই মাত্র। শোনো, এখন আর চা খেয়ে কাজ নেই। রান্না যা আছে দুই ভাই মিলে খাওয়া যাক।

—রান্না?—বিপিন ভিতরে ভিতরে লোভার্ত হয়ে উঠলেও মুখে বললে,—কিন্তু আপনার কম পড়বে না তো?

—পড়লোই বা! আমাদের সঞ্চয় কেড়ে নেওয়াই তো তোমাদের রাজনীতি।

—আপনাদের সঞ্চয়! আপনিও কি নিজেকে পুঁজিপতি ভাবতে আরম্ভ করলেন না কি?

—করাই তো উচিত। আমি বৈষ্ণব। আমাদের শাস্ত্রে বলে, যে-লোক কালকের জন্তে আধখানা হরিতকী সঞ্চয় ক'রে রাখে, সেও ক্যাপিটালিষ্ট। আমি আধখানা হরিতকীর চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয় করেছি।

ভুজঙ্গ হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চ'লে গেল। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলে, তার খাবার রেখে বাকি যা থাকবে তাতে দুজনের হবে কি না। হ'তে পারে শুনে ও আশ্চর্য হোল না। বললে, তবু দোকান থেকে কিছু দই মিষ্টি নিয়ে আয়।

খেতে ব'সে বিপিন এমন ক'রে খেতে লাগলো যে, ভুজঙ্গ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো। ক্ষুধার্তের খাওয়া সে চেনে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সে বিষয়ে যথেষ্ট। জিজ্ঞাসা করলে, কখন বেরিয়েছিলে বিপিন ?

খাওয়া থেকে মুখ না তুলেই বিপিন উত্তর দিলে, ভোরে। ক'লকাতার বাইরে অনেক দূরে যেতে হয়েছিল।

—খাওয়া হয়নি ?

—কি ক'রে বুঝলেন ? আমার খাওয়া দেখে ?—বিপিন মুখ তুলে ধূর্তের মতো হেসে আবার চোখ নামিয়ে আহারে মনোনিবেশ করলে।

ভুজঙ্গ সে প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, যেখানে গিয়েছিলে সেখানে খাবারের দোকান ছিল না বুঝি ?

—থাকবে না কেন ? কিন্তু সময় পেলাম না মোটে।

—এমন প্রায়ই হয়, না বিপিন ?

—হ্যাঁ। হয় বই কি !

—আজকে পয়সা ছিল সময় পাওনি। আবার অনেকদিন সময় পাওয়া যায় কিন্তু পয়সা থাকে না, না বিপিন ?

বিপিন হেসে ফেললে। বললে, আপনার তো সবই জানা। মিথ্যে জিগ্যেস করছেন কেন ?

ভুজঙ্গ বললে, হ্যাঁ ভাই, সবই জানা। যখন পয়সাও থাকে সময়ও থাকে তখন কি হয়, তাও জানা গেল।

তার কণ্ঠস্বরে কিন্তু পরিহাসের বাষ্পটুকুও নেই। বললে, কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ নেই। এবারে জানতে হবে যাকে বলে অজগর বৃত্তি।

বিপিন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সে আবার কি বৃত্তি ?

—সে এক আশ্চর্য রকমের বৃত্তি। সকল বৃত্তির সেরা।

—কি রকম ?

—তুমি তো অনেক বৃত্তির কথা শুনেছ ? কেরাণীবৃত্তি, ব্যবসাবৃত্তি ও চিকিৎসাবৃত্তি, আরও কত কি। এও এক রকমের বৃত্তি,—কেউ কেউ বলেন আকাশবৃত্তি।

—কি করতে হয় তাতে ?

—কিছুই করতে হয় না। অতিকায় অজগর সাপের মতো আকাশের দিকে মুখব্যাদান ক'রে নিশ্চেষ্ট প'ড়ে থাকতে হয়, এই জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে যে, তার যখন ক্ষিধে পাবে ভগবান অবশ্যই তখন একটি পাখি তার মুখের বিবরে ফেলে দেবেন।

বিপিন বড় বড় চোখ মেলে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, এই বৃত্তিটাই সবচেয়ে লোভনীয়।

"All things have rest ; why should we toil alone,
…And make perpetual moan,
Still from one sorrow to another thrown :
Nor ever fold our wings,
And cease from wanderings".

ভালো। মন্দ নয়। কিন্তু আমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ভুজঙ্গদা। আমাকে খেটে যেতেই হবে, যদিও অন্নের জন্যে নয়, কিন্তু এক দুঃখ থেকে আর এক দুঃখে। আমার জন্যে রয়েছে অন্য কবির বাণী :

"দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
এখনই অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

বিপিন হাসতে লাগলো।

ভুজঙ্গ বললে, অজগর-বৃত্তি তোমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়নি বিপিন। তোলে বুঝতে ওটা 'সুখবাদে'র বস্তু নয়, অবসাদেরও নয়। কিন্তু তোমার পেট এখনও ভরেনি বিপিন। আর গোটাকয়েক সন্দেশ নাও।

—না না। পেট আমার খুব ভ'রে গেছে দাদা। আর চলবে না।

—চলবে।—ভুজঙ্গ জোর দিয়ে বললে,—আজকের জন্যে না চলে, কালকের জন্যেও গোটা কয়েক পেটের মধ্যে রেখে দাও।

প্রতিবাদ ক'রে বিপিন বললে, না দাদা। আমরা পুঁজিবাদের বিরোধী। পেটের মধ্যেও কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখি না।

খাওয়া দাওয়ার শেষে ভুজঙ্গ বললে, বিপিন, নিদ্রাটাও এইখানেই হয়ে যাক। এত রাত্রে কষ্ট ক'রে ফিরে গিয়ে লাভ কি?

বিপিন বললে, লাভের জন্যে নয়। পেটটা লোভের ঠেলায় এমন বোঝাই হয়েছে যে, যাওয়া সম্ভব হবে কি না তাই ভাবছি। কিন্তু সে যা হয় হবে দাদা। আপাতত কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। বোঝাই তারপরেও যদি না কমে তখন দেখা যাবে বরং।

—বেশ। তাই হবে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি তাহ'লে আশ্রম-জীবনে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—মন্ত্রিত্ব নিলেন না কেন?

—কই আর নিতে পারলাম?

—এই ব্যাপারে আমাদের দলের সকলেরই আপনার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে।

—কেন?

—আপনার আদর্শনিষ্ঠা দেখে।

ভুজঙ্গ চুপ করে রইলো।

বিপিন বলতে লাগলো, আপনাকে যদি আমরা পেতাম দাদা।

—কি হোত তাহ'লে?

—কত বল যে আমাদের বাড়তো!

ভুজঙ্গ হেসে বললে, তা জানি না, কিন্তু আমার ওপর শ্রদ্ধা যে অনেক কমতো তাতে আর ভুল নেই।

—কেন, শ্রদ্ধা কমতো কেন?

—কমতো, আমার আদর্শনিষ্ঠার অভাব দেখে। কিন্তু সে যাক বিপিন। সময় পেলে একবার আশ্রমে এস, নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলাম।

—কবে যাচ্ছেন ?

—তার ঠিক নেই। তবে বেশি দেরি হবে না ব'লেই আশা করি। একটা কথা তোমাকে বলব বিপিন ?

—বলুন।

—কাজ-কর্ম যাই কেন না কর, তার ফাঁকে ফাঁকে তোমার বৌদির ওপর একটু দৃষ্টি রেখ।

—রাখি তো। প্রায়ই ওঁর কাছে যাই।

—এখন আরও বেশি যেতে হবে। শুনেছ বোধ হয়, শুভেন্দুবাবুর যক্ষ্মা হয়েছে।

—যক্ষ্মা ?

—হ্যাঁ। শীগগির তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন। আমিও থাকব না। শুনছি তোমার দাদাও নাকি মাসকয়েকের জন্যে ইউরোপ যাচ্ছে।

—তাই নাকি! কবে ?

—তা জানি না। শীগগির যাচ্ছেন শুনলাম। এই অবস্থায় ওর দিন কাটানো খুব কঠিন হবে, যদি না তুমি সঙ্গ দাও।

বৌদির প্রসঙ্গে বিপিনের মুখে একটা গভীর বেদনার ছায়া নামলো। অনেকক্ষণ সে নিঃশব্দে চুপ ক'রে বসে রইলো। তারপর বললে, আমি বলছিলাম কি,

—বল।

—আপনি বৌদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। আপনি তো জানেন, জীবনে ওঁর আর আনন্দ নেই। একটা মস্ত বড় আত্মসম্মানজ্ঞানের ওপর কোনোমতে উনি নিজেকে খাড়া রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সেই মর্যাদাজ্ঞান যেমন ওঁর বাইরটাকে শক্ত ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তেমনি নিরন্তর ওঁর ভেতরটাকেও পোকার মতো কুরে-কুরে খাচ্ছে। আপনারা দুজনেই চ'লে গেলে যে-অসুখ শুভেন্দুদার হয়েছে, সেই অসুখে উনি নিজেই পড়বেন, এই আমার ভয়।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আমারই কি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি?

—জানি না। এখানে থাকলে ওঁকে বোধ হয় কেউই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

—তাহ'লে?

—তাই বলছিলাম, যদি ওঁকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

—সে কি সহজ! ও নিজেই তো রাজি হবে না।

—না। আমি একদিন বলেছিলাম সে কথা। রাজি হননি।

—আমিও বলেছিলাম। ও কি বললে জান?

—কি?

—বলেছিল, যদি ওঁকে ঘৃণা করতে পারতাম তাহ'লে বেঁচে যেতাম। তা ছাড়া আমার পরিত্রাণের কোনো পথই নেই। তাও তো পারছে না। জানো, শ্রীও এই সঙ্গেই ইউরোপ যাচ্ছে?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ব্রততীর কাছেই এইমাত্র শুনলাম সে কথা।

—বৌদির কাছেই? আমাকে কিন্তু বলেননি। বলতে পারেননি বোঝা যাচ্ছে। তাহ'লে? তাহ'লে বৌদি কি ক'রে বাঁচবেন?

বিপিন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ভুজঙ্গ স্তব্ধ।

বিপিন বললে, বৌদি এসব কথা কখনও আমার কাছে তোলেন না। বোধ হয় কারও কাছেই না। বুঝি তাঁর মর্যাদায় বাধে। সেইটেই আরও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ বিপিন বললে, আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছা হয় জানেন?

ভুজঙ্গ নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

দুই হাত মুঠিবদ্ধ ক'রে বিপিন বললে, ইচ্ছা হয় এই পৃথিবী থেকে দাদাকে দিই সরিয়ে।

ভুজঙ্গ শিউরে উঠলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই বিপিন বললে, কিন্তু পারিনা। জানি তাতে বৌদিরই মৃত্যুকেই এগিয়ে আনা হবে। আমি কী করতে পারি বলুন তো?

ভুজঙ্গ জবাব দিতে পারলে না। শুধু বিস্ফারিত চোখে বিপিনের দুই ব্যাকুল প্রজ্বলন্ত চোখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

একত্রিশ

হাসপাতালে কেবিনের সমস্ত বন্দোবস্ত যখন সম্পূর্ণ তখন শুভেন্দু আবার একটা গোলমাল বাধালে। সন্ধ্যার পর শ্রী এল খবরটা দিতে। শুধু খবরটা নয়, দু-এক দিনেব মধ্যে যাতে শুভেন্দু সেখানে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে। কিছু কিছু ঔষধপত্র সমেত আরও যে সব টুকিটাকি জিনিস রোগীর জন্যে কিনতে হবে, হাসপাতাল থেকে তারও একটা ফর্দ শ্রীর কাছে এসেছে।

কিন্তু শুভেন্দু বেঁকে বসলো।

বললে, কেবিনের খরচ চালাবার সামর্থ্য তার নেই। কলেজে মাষ্টারী ক'রে যে অর্থ সে পায় তাতে কেবিনের খবচ চলবে না। অনুপস্থিত থাকলে কলেজই বা ক'মাস মাইনে দেবে কে জানে!

শ্রী বোঝালে, খরচের কথা তুমি ভাবছ কেন? তোমার মাইনেতে না কুলোয়, আমাব মাইনে তো আছে। তাতে কুলোবে না?

—তোমার মাইনে আমি প্রাণরক্ষাব জন্যেও স্পর্শ করব না।

শ্রী থমকে গেল: কেন করবে না?

—না, করব না। আমি কাল সাধাবণ ওযার্ডে একটা বেডের জন্যে দরখাস্ত দোব।

শ্রী রেগে বললে, তুমি ফ্রি বেডে গিযে থাকতে পার, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমার টাকা স্পর্শ করবে না কেন, জানতে চাই।

শুভেন্দুর চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। তাব রোগজীর্ণ দেহ রাগে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো। দুই কনুযেব উপর ভব দিয়ে সে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলে যেন। তার শীর্ণ মুখবিবরে দুটো দাঁত নেকড়ের দাঁতের মতো ঝকমক ক'বে উঠলো।

বললে, জানতে চাও? জানবার সাহস আছে তোমার?

শুভেন্দুর এই রূপ শ্রী জীবনে কখনও দেখেনি। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে উঠলো। সে ভয়ব্যাকুল দুই বাহু দিয়ে শুভেন্দুকে জড়িয়ে ধ'রে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেল। কাশতে কাশতে শুভেন্দুর মুখখানা কি রকম হয়ে গেল। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠলো মুখ দিয়ে এবং তারপরেই সে বিছানায় এলিয়ে পড়লো।

ভয়ে শ্রী চিৎকার ক'রে উঠলো। ছুটে এলো চাকরটা। শ্রী তাকে গাড়িখানা নিয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের বাড়ি যেতে ব'লে দিয়ে ছুটলো ডাক্তারকে টেলিফোন করতে। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার এলেন। একটা ইনজেকসন দিলেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ওঁকে বিছানা থেকে একেবারে উঠতে দেবেন না। ঘণ্টা দুই পরে আবার যেন তাঁকে ফোন ক'রে অবস্থা জানানো হয়। দরকার মনে করলে উনি আবার আসবেন। ইতিমধ্যে ঘরের মেঝে লাইজল দিয়ে যেন বেশ ক'রে পরিষ্কার করা হয়।

আধঘণ্টা পরে ডাক্তার যখন চ'লে গেলেন, শুভেন্দু তখন শান্তভাবে শুয়ে। কিন্তু শ্রীর এমন সাহস নেই যে তার কাছে ব'সে একটু সেবা করে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ক'রে সে চাকরটাকে টেলিফোনে এই অসুখের কথাটা ব্রততীকে জানাতে ব'লে নিজে একটা ভালো নার্সের সন্ধানে চ'লে গেল।

ভুজঙ্গকে এই খবরটা টেলিফোনে জানিয়ে ব্রততী তখনই ছুটে এল। তার পিছনে পিছনে ভুজঙ্গও এসে পড়লো।

শুভেন্দুর মুখে তখন আর উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই।

ওদের দেখে শিশুর মতো প্রসন্ন হাস্যে ব'লে উঠলো: কেমন ভয় দেখালাম!

ওরা কিন্তু হাসতে পারলে না।

ব্রততী রোগীর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলো। ভুজঙ্গ গেল চাকরটাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করতে।

চাকরটা সকল কথা জানে না। বিশেষ শ্রীর কথায় শুভেন্দু যখন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন সে রান্না-ঘরে। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, বাবু কোনো কারণে রেগে গিয়েছিলেন। তারপরে ডাক্তার আসা থেকে

চ'লে যাওয়া পর্যন্ত সমস্তক্ষণই সে ঘরে ছিল। সে বিষয়ে সে নিখুঁৎ বিবরণই দিলে।

শুভেন্দু রেগে গিয়েছিল শুনে ভুজঙ্গ অবাক হয়ে গেল। শুভেন্দুকে কখনও সে রাগতে দেখেনি। এই আত্মভোলা সদাশিব লোকটির মুখে সকল সময়েই সে একটি নির্মল প্রসন্নতা দেখে এসেছে। চাকরটার কথা বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হোল।

জিজ্ঞাসা করলে, বাবু রেগে গিয়েছিলেন বুঝলি কি ক'রে?

—উনি চেঁচিয়ে উঠলেন যে। এ রকম চেঁচাতে কখনও দেখিনি।

—চেঁচিয়ে উঠেছিলেন? কি ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন?

—তা আমি ঠিক শুনতে পাই নি বাবু। শুধু জোর গলাটাই শুনেছিলাম। তাই শুনে যখন ছুটে গেলাম, তখনও বাবু রাগে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলেন। তখনই মুখ দিয়েও

—আচ্ছা তুই যা।

ভুজঙ্গের আর অবিশ্বাস হোল না। বুঝলে, কোনো কিছু নিয়ে স্ত্রীর উপর শুভেন্দু চটে গিয়েছিল। যদিচ সাধারণত সে এ রকম আত্মবিস্মৃত হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর শুভেন্দুর পক্ষেও এ রকম আত্মবিস্মৃতি অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু এ নিয়ে ব্রততীর সঙ্গে কোনো আলোচনা সে করলে না। রোগীর ঘরে নিঃশব্দে ফিরে এল।

শুভেন্দু তখন অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে থেমে থেমে ব্রততীকে বলছে, আমাকে নিয়ে তোরা এমন ছোঁয়াছুয়ি করিস, আমার ভালো লাগে না। রোগটা তো ভালো নয়। যত শীগগির পারিস আমাকে হাসপাতালে হোক, যেখানে হোক, পাঠিয়ে দে। শুধু একটা অনুরোধ, আমার সামর্থ্যে কুলোয় না এমন কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাকে বাঁচাবার জন্যেও করিস নে। তাতে আমি মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা পাব। বুঝলি?

ভুজঙ্গ বললে, এ সব আলোচনা পরে হবে শুভেন্দুবাবু। ডাক্তারে কথা বলতে নিষেধ ক'রে গেছেন। সুতরাং কথা বলবেন না।

পরিহাসের ভঙ্গিতে শুভেন্দু চোখ টিপে বললে, তথাস্তু।

একটু পরেই একটি নার্স নিয়ে শ্রী এসে উপস্থিত হোল। ঘরের মধ্যে ভুজঙ্গ এবং ব্রততী। তাদের যেন সে লক্ষ্যই করলে না। শ্রীর মুখখানি গম্ভীর, বিষণ্ণ, একটু যেন উত্তেজিতও।

সে গম্ভীরভাবে নার্সকে তার কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগলো: এই আপনার রোগী। ডাক্তারে ইনজেকশন দিয়ে গেছেন। ওষুধ খাওয়াবার কিছু নেই। শুধু পথ্য। এই দুধ একটু একটু খাওয়াবেন আর ফলের রস। প্রয়োজন বুঝলেই ডক্টর সেনকে ফোন করবেন। রোগীর কথা বলা নিষেধ। আমি এখন চললাম। রাত্রে মাঝে মাঝে ফোন ক'বে খবর নোব। প্রয়োজন বুঝলে আমাকেও ফোন করতে পারেন। আচ্ছা, আমি চললাম।

শ্রীর হাই-হিল জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে সিঁড়ির শেষ ধাপে মিলিয়ে গেল।

শুভেন্দু নিঃশব্দে চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে ছিল। আরও কিছুক্ষণ তেমনি ক'রেই শুয়ে রইল। তারপর ধীরে চোখ মেলে চারিদিকে চাইতে লাগলো।

ব্রততী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। তার পিছু পিছু নার্সও।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, কি নেবে বল?

শুভেন্দু তার কথার উত্তর না দিয়ে নার্সের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ইনি কে?

ব্রততী বললে, নার্স। রাত্রে তোমার কাছে একজন নার্স থাকা দরকারও। চাকরটার ওপর ঠিক নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু এ সমস্ত কথা যেন শুভেন্দুর কানেই গেল না। জিজ্ঞাসা করলে, এঁর ফি কত?

নার্স বললে, রাত্রে দশ টাকা নিই, আর দিনে

বাধা দিয়ে শুভেন্দু বললে, দিনের দরকার নেই। ওই ড্রয়ার থেকে দশটা টাকা বের ক'রে এঁকে দিয়ে দে তো দিদি।

ব্রততী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে উঠলো। কিন্তু শুভেন্দুর চোখে কলহ ঘনিয়ে আসছে দেখে ভুজঙ্গ তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে নার্সের হাতে দিয়ে ইঙ্গিত করলে, চ'লে যান।

সে আবার কি! নার্স বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেল। তার জীবনে এ রকমটি আর কখনও ঘটে নি! সারারাত্রি খাটিয়ে নিয়ে কি দেয়নি এমন ঘটেছে। কিন্তু আসামাত্র ফি দিয়ে পত্র-পাঠ বিদায়, এমন ঘটে নি।

ভুজঙ্গ বাইরে নিয়ে এসে তাকে বোঝালে রোগীর স্ত্রী যদিও প্রয়োজন বিবেচনায় তাকে নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু রোগী নিজে বাইরের কারও সেবা নেন না। নার্সের থাকা মানেই রোগীর উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং তার ফলে শুশ্রূষা সত্ত্বেও খারাপ হ'তে বাধ্য। এ রকম অবস্থায় ফি নিয়ে নার্সের চ'লে যাওয়াই রোগীর মানসিক অবস্থা বিবেচনায় বাঞ্ছনীয়।

নার্সের তাতে কোনো আপত্তির কারণ নেই। সারারাত্রি রোগীর সেবা কারোই ভালো লাগে না। তার উপর অসুখটা ভালো নয়।

তবু বললে, কিন্তু উনি (মানে স্ত্রী) যে রাত্রে টেলিফোনে খবর নেবেন?

ভুজঙ্গ বললে, আমরা কেউ তো থাকব, সে জবাব আমরাই দোব।

নার্স চ'লে গেল।

ভুজঙ্গ ভিতরে এসে শুভেন্দুকে শুনিয়ে ব্রততীকে বললে, তোমার ওই চাকরটার কি যে নাম আমি রোজ ভুলে যাই। ওকে ব'লে দাও, হাঁড়িতে আমার জন্যেও দুটো চাল নিতে।

ব্রততী এই কথাটাই ভাবছিল। নার্সকে তো বিদায় দেওয়া হোল। এখন এই অবস্থায় রোগীকে তো একটা চাকরের জিম্মায় একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। রাত্রে থাকবে কে?

ভুজঙ্গের কথায় উল্লসিত হয়ে বললে, তুমি থাকবে ভুজঙ্গদা? আমিও তাই ভাবছিলাম। খুব ভালো হয় তা'হলে।

ভুজঙ্গ বললে, ইচ্ছে তো থাকবার। কিন্তু একজনকে তো দশ টাকা দিয়ে পত্র-পাঠ বিদায় করলে। আমাকে আবার ক'টাকা দিয়ে বিদায় না ক'রে দাও।

শুভেন্দু হেসে ফেললে। বললে, আপনাকে ফি দিয়ে বিদায় করি এমন সামর্থ্য আমার নেই।

—থাকলে করতেন নিশ্চয়?

—জানি না। কিন্তু থাকার কি সত্যিই দরকার হবে ভুজঙ্গবাবু?

—হবে। নইলে সখ ক'রে আর কে রাত জাগতে চায় বলুন?

—তাহ'লে থাকুন। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার খুবই কষ্ট হবে।

ব্রততী তাড়াতাড়ি বললে, না, না। ভুজঙ্গদার খাবার আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি। ওঁর গাড়িটা নিয়ে যাব আর আসব।

ব্রততীর ফিরতে বেশি দেরিও হোল না।

পাশের ঘরে ভুজঙ্গের খাবার জায়গা ক'রে ডাকলে, এস ভুজঙ্গদা। তোমার গাড়িটাও ছেড়ে দিলাম। ভোরে আসতে ব'লে দিয়েছি।

ভুজঙ্গ বিস্মিতভাবে বললে, খুব বুদ্ধি তো তোমার! তুমি ফিরবে কি ক'রে? বাসে?

ব্রততী বললে, ভাবছি আমিও থাকব এখানে।

শুভেন্দু চমকে উঠল: তুইও থাকবি কেন? দু'জন থাকার কি দরকার?

ব্রততী হেসে বললে, একটা ট্রেণ্ড নার্সের বদলে দু'জন আন-ট্রেণ্ড দরকার।

—যা খুসি কর!—ব'লে শুভেন্দু পাশ ফিরে শুলো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি খেয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ। সবাইকে ব'লেও এসেছি, রাত্রে ফিরব না।

খেতে ব'সে ভুজঙ্গ বললে, সমুদ্রেও আগুন আছে!

ইঙ্গিতটা ব্রততী বুঝলে। বললে, এ রকম রাগ আমি ওঁর কখনও দেখিনি। ভয়ে আমি কথা বলতে পারছিলাম না।

—এর আগে আরও এক পশলা হয়ে গেছে। চাকরের কাছে শুনলাম।

ব্রততী বললে, শুনেছিলাম শ্রী ওঁর জন্যে একটা কেবিন ঠিক করেছেন। একটু আগেকার কথা শুনে মনে হোল, তাতে উনি রাজি নন। উনি নিজের সামর্থ্যমত সাধারণ ওয়ার্ডে থাকবেন। নার্সের ব্যাপারেও রাগ সেই জন্যে। শ্রীর টাকায় উনি জীবন বাঁচাতেও চান না।

ভুজঙ্গ বললে, শ্রীর আচরণটা ওঁর চোখেও খারাপ ঠেকছে।

ব্রততী চুপ ক'রে রইলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওরা দু'জনেই এসে রোগীর ঘরে বসলো। এমন সময় টেলিফোনটা পাশের ঘরে বেজে উঠলো। ব্রততী উঠতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে ভুজঙ্গ বললে, তুমি থাক। আমিই যাচ্ছি।

শ্রীর টেলিফোন।

জিজ্ঞাসা করলে শুভেন্দু কেমন আছে?

ভুজঙ্গ বললে, সেই রকমই। এখন শান্তভাবে ঘুমুচ্ছেন।

—নার্স টা আছে?

—না। তাঁকে ফি দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়া হয়েছে।

—কেন?

—জানোই তো, উনি কারও সেবা পছন্দ করেন না। উত্তেজিত হচ্ছিলেন। সুতরাং

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু রাত্রে কি তাহ'লে উনি একা থাকবেন?

—না, আমি আছি।

ব্রততীর নাম আর সে উল্লেখ করলে না।

—ও।

শ্রী তৎক্ষণাৎ রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলে।

ব্রততীকে আড়ালে ডেকে ভুজঙ্গ বললে, প্রস্তুত হও। ঝড় আসন্ন।

—সে আবার কি?—ব্রততী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—শ্রী টেলিফোন করেছিল।

—তারপরে?

—নার্সকে বিদায় ক'রে দেওয়া হয়েছে শুনে সে প্রীত হোল না। তার ওপর রাত্রে আমি থাকছি শুনে আরও ক্রুদ্ধ হোল। তবু তো তোমার নাম করিনি।

ব্রততী চিন্তিত মুখে শুনতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলে, সে কি আসছে?

—বললে না তো কিছু।—তারপর বললে,—আমার মনে হয় আসবে না। এখানে এসে আমাদের সামনে রোগীর ঘরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টির সাহস তার হবে না। কিন্তু আজ তুমি না থাকলেই পারতে। এ তো একদিনের

কাজ নয়। কাল আছে, পরশু আছে, কতদিন আছে কে জানে। তারপরে দিনেও কারও থাকা দরকার।

ব্রততী বললে, আমি থাকতাম না। কিন্তু কি যে করতে হবে জানি না তো। প্রথম দিন তোমার সঙ্গে থেকে শিখে নোব ব'লেই থাকলাম। কাল থেকে আর দু'জনের থাকবার দরকার হবে না।

—দিনে?

—কাল দিনে ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দোব। হাসপাতালে যতদিন না পাঠানো হচ্ছে, পালা ক'রে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠাকুরপো হয়তো আরও দু'এক জন লোকের ব্যবস্থা করতে পারবে।

—তাই হবে। কর্তা যদি না বেগড়ান, সেবা করবার লোকের খুব অসুবিধা হবে না। এখন ডাক্তারকে টেলিফোন করতে হবে।

আর রক্ত পড়েনি শুনে ডাক্তার অনেকটা আশ্বস্ত হোলেন। বললেন, তাহ'লে রাত্রে তাঁর আর যাওয়ার দরকার হবে না। সকালে আসবেন। তাঁর মনে হয়, আর একটা এক্স-রে নেওয়া উচিত। এবং যদি আরও রক্ত পড়ে তাহ'লে কিছু রক্ত দেওবাও আবশ্যক হ'তে পারে। কিন্তু সে সব পরের কথা। সকালে এসে সে সব ব্যবস্থা উনি করবেন। এখন ওঁকে মোটে কথা বলতে দেবেন না, এমন কি নড়া-চড়া পর্যন্ত না। ওঁর দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম,—দেহ এবং মন উভয় দিক দিয়েই।

ঔষধের গুণেই হোক, অথবা যে কারণেই হোক, সমস্ত রাত্রি শুভেন্দু একটানা চমৎকার ঘুমুলো। ভোরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো। সামনেই দু'খানা চেয়ারে ওরা পাশাপাশি ব'সে ছিল। কিন্তু নরম নীল আলোয় ওদের চিনতে বোধ হয় তার কষ্ট হচ্ছিল।

ব্রততী কাছে এসে বললে, কি খুঁজছ বল।

—তোকেই খুঁজছিলাম। শোন্!

—বল।

—রেখে যাবার মতো বিশেষ কিছু আমার নেই। বইগুলো আমাদের কলেজের লাইব্রেরীতে দিয়ে দিস্।

ব্যাকুল কণ্ঠে ব্রততী বললে, এ সব কী যা-তা বলছ!

শুভেন্দু হাসলে। কি একটা বলতে যেতেই ব্রততী বাধা দিয়ে বললে, না। একটা কথাও তুমি বলতে পাবে না। ডাক্তারে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

—জানি। শুধু একটা কথা বলব। কথা বলা কখন ফুরিয়ে যাবে বলা তো যায় না। আমার সাধ ইচ্ছা শুনে রাখবি না?

ব্রততী চুপ ক'রে রইল।

শুভেন্দু চোখ বন্ধ ক'রে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো: ইলারা এখনও বোধ হয় গোয়ালিয়রেই। তাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে, যেন আর দেরি না ক'রে ফিরে আসে। তাকে আমার এই আংটিটা দিবি, আর তার ছেলে হোলে সে পাবে আমার কলমটা। কিন্তু তোকে কি দিই বল তো?

শুভেন্দু একবার চোখ মেলেই আবার যেন সেই কথাটা ভাববার জন্যেই চোখ বন্ধ করলে।

ব্রততী ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, আমাকে কিছুই দিতে হবে না দাদা। তুমি সেরে ওঠ, তারপরে যা খুশি দেবে।

শুভেন্দু এক গাল হেসে বললে, সেরে ওঠার আশা তুই এখনও করিস রে বোকা! যা দেবার এখনই দিয়ে যেতে হবে। নইলে আর দেবার সময় পাব না। শোন্ তোকে দোব, ওঘরের কোণে টিপয়ের ওপর যে শ্বেত-পাথরের মহাদেব আছে, সেইটে। বাবা ওটা নেপাল থেকে এনেছিলেন। দেখেছিস্? স্ফটিকের চোখ, ললাটের বাঁকা চাঁদ আর হাতের ত্রিশূল সোনার। অদ্ভুত মহাদেবের মূর্তি! অমনটি এদিকে দেখা যায় না। ওইটে তোকে দোব।

—ও নিয়ে আমি কি করব বল?

—পূজো করবি। যতক্ষণ না ওই স্ফটিকের চোখ দিয়ে ধ্বক্ ধ্বক ক'রে আগুন বেরোয়। ও তো তোরই কাজ! তুই ছাড়া আর কেউ তা পারবে ব'লে আমি তো জানি না।

বলতে বলতে শুভেন্দু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভুজঙ্গ বললে, আর আমাকে? আমাকে কি দেবেন?

শুভেন্দু সভায় জিভ কেটে হাত জোড় করলে। বললে, ওরে বাবা! আপনাকে কিছু দেবার সাধ্য আমার আছে! আপনার কাছে সবাই নেবে। নেবার জন্যে হাত পেতে ব'সে রয়েছে। আমিই সময় পাব না নেবার।

—বাবাঃ! কী যে সময় সময় বলেন আপনি, যার কোনো মানে হয় না।

—মানে হবে। দেখবেন মানে হবে।

শুভেন্দু আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময় ফিক ক'রে একটু হাসলে। বললে, আমার কিন্তু হাসপাতালে যাবার মোটেই ইচ্ছা নেই ভুজঙ্গবাবু। কিন্তু এরা তো ছাড়বে না, পাঠাবেই। নইলে আমার ইচ্ছা ছিল,

শুভেন্দু থামলে। ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলো।

—কি ইচ্ছা ছিল?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—ইচ্ছা ছিল, শেষ ক'টা দিন আপনার ওই শিমূলতলার আশ্রমে গিয়ে কাটাই। ছায়ায় ঢাকা আমগাছের নিচে একটা খাটিয়ার শুয়ে শুয়ে জীবনের পাত্রে তলানি যেটুকু প'ড়ে আছে চেখে চেখে তারিয়ে তারিয়ে তার আস্বাদ নিই।

ভুজঙ্গও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে, আমার তাতে খুব সম্মতি আছে। কিন্তু তা তো হবার নয়। সেখানে তো চিকিৎসা হবে না।

—যেন এখানেই হবে!—শুভেন্দু ব্যঙ্গভরে হাসল,—ওখানে তবু মনের চিকিৎসা, আত্মার চিকিৎসাটা হোত। এখানে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ!

ভুজঙ্গ বললে, সত্যি কথা বলতে কি সে আশঙ্কা আমারও আছে। আপনাকে যতই দেখি, সংস্কৃত কাব্যের সেই চাতকের কথা মনে পড়ে।

—সেটা কি, জানি না তো।—শুভেন্দু বললে।

—এক চাতক ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটায় গঙ্গার জলে এসে পড়েছে। বেচারা ঝড়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই ক'রে ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত। স্বভাববশে যারে

বারে তৃষ্ণার জলের জন্যে আকাশের দিকে মুখ তুলছে। কিন্তু বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। তখন তার অবস্থা দেখে এক হাঁস বললে, বন্ধু, তোমার মতো বোকা তো কখনও দেখিনি। গঙ্গার পবিত্র জলে ত্রিতাপ জ্বালার নিবারণ হয়। সেই পুণ্য সলিলে ভাসতে ভাসতেও তুমি তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছ আর বারে বারে আকাশের দিকে মুখ তুলছ!

ব্রততী হেসে বললে, সত্যিই তো!

ভুজঙ্গ বলতে লাগলো: চাতক বললে, বাপু জলের হাঁস, চাতকের ধর্ম তুমি কি জানবে? গঙ্গার জল তোমার শাস্ত্রে যত পবিত্রই হোক, আমার শাস্ত্রে যে জল মাটি স্পর্শ করে, অমৃত হোলেও তা আমার গ্রহণীয় নয়। এই আমার পিতৃপিতামহের ধর্ম। তুচ্ছ জীবনের জন্যে সেই ধর্ম আমি পরিত্যাগ করব!

সবাই হাসতে লাগলো।

শুভেন্দু বললে, এর সঙ্গে আমার মিলটা কোথায় খুঁজে পেলাম না তো।

—পেলেন না? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, যা মাটি স্পর্শ করে জীবনাত্যয়েও তা কিছুতেই আপনি স্পর্শ করেন না। এইটেই আপনাব আভিজাত্য।

শুভেন্দু আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়লো কি না বোঝা গেল না।

সকাল বেলাতেই বিপিন এসে উপস্থিত।

—রাত্রে শুভেন্দুদা কেমন ছিলেন বৌদি?

—ভালো। বেশ ঘুমিয়েছিলেন।

—আচ্ছা, তাহ'লে আমার ওপর কি হুকুম?

ভুজঙ্গ বললে, দিনের শুশ্রূষার ভার তুমি নাও। রাত্রিটা আমরা দু'জনে পালা ক'রে থাকব।

বিপিন ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, আজ্ঞে না। ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই। হয় দিনরাত্রি সমস্ত সময়ের ভার আমি নোব। আপনারা আসবেন-যাবেন

দেখবেন আমরা কেমন কাজ করছি। নয় সব ভারই আপনারা নিন, আমাকে রেহাই দিন, আমার অন্য কাজ আছে।

ভুজঙ্গ হেসে বললে, কেন, ভাগাভাগিতে তোমার আপত্তিটা কি?

—গুরুতর আপত্তি। কোয়ালিশনে আমি বিশ্বাস করি না।

—বেশ। তাহ'লে সব ভারই তুমি নাও।

—তাই নিলাম। শুধু এক ঘণ্টা আমাকে ছুটি দিন। আমি বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে আসি।

—তাই এস।

যেন সত্য সত্যই একটা মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ভার পেয়েছে এই রকম দৃপ্ত পদক্ষেপে বিপিন চ'লে গেল। ভুজঙ্গ ওর দৃপ্ত পদক্ষেপের দিকে কৌতুকের সঙ্গে চেয়ে রইলো। ঘরের ভিতর শুভেন্দুর নড়াচড়ার সাড়া পেয়ে ব্রততী তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল। তার পিছনে পিছনে ভুজঙ্গও।

ওদের দেখে শুভেন্দু একটা অদ্ভুত রকমে হাসলে।

ভুজঙ্গ এ রকম হাসি কোনো মানুষের মুখেই দেখেনি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি হোল?

—একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম!

স্বপ্ন! তবু ভালো!

ভুজঙ্গ আশ্বস্তভাবে বসলো। জিজ্ঞাসা করলে, কি এমন আশ্চর্য স্বপ্ন?

—খুবই আশ্চর্য স্বপ্ন ভুজঙ্গবাবু।

—আমরা শুনতে পাব না?

—কেন পাবেন না? স্বপ্ন দেখছি, আমার এই দেহটার পাশে যেন আমি শুয়ে রয়েছি।

ব্রততী চমকে উঠলো: সে আবার কি!

—হ্যাঁ রে! এই যে দেহটা—যাকে তুই দাদা বলিস, ব্যাধির আক্রমণ থেকে যাকে রক্ষা করার জন্যে তোদের যত্ন আব আগ্রহের অবধি নেই,—এটা এইখানে শুয়ে। আর ঠিক তার পাশেই শুয়ে আমি। সে একটা আশ্চর্য অনুভূতি! কত কথাই দুজনে হোল তার সব এখন মনেও নেই। আমি

ওর দিকে ফিরেও চাইছিলাম না দেখে দেহটা যখন আমাকে 'অকৃতজ্ঞ' বললে, ভারি লজ্জা পেলাম রে, দুঃখও হোল। কত আদর করলাম ওকে, এখন ভাবতেও হাসি পাচ্ছে।

শুভেন্দু তেমনি ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো। ভুজঙ্গ এবং ব্রততী বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি মনে হয় ওটা স্বপ্ন?

—তা ছাড়া আর কি হবে?

—কাল রাত্রে আপনার দেহের উত্তাপটা খুব বেড়েছিল। জ্বরের ধমকেও অমন হ'তে পারে।

—তাও হ'তে পারে। কিন্তু অনুভূতিটা আশ্চর্য! যখন ভাবছি এই দেহটা এবং আমি এক নই, পৃথক, এবং আমরা পাশাপাশি বন্ধুভাবে শুয়ে থাকতে পারি, তখন কি রকম অদ্ভুত লাগছে! আপনাদের ব'লে বোঝাতে পারব না। সমস্ত শরীরে যেন একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে, হাওয়ায় যেমন ক'রে হালকা পালক ভেসে বেড়ায়, আলোর তরঙ্গে আমিও তেমনি ক'রে ভাসছি।

ভুজঙ্গ চুপ ক'রে রইল।

শুভেন্দু বললে, মৃত্যু কত সহজ ভুজঙ্গবাবু! শুধু ঘরের থেকে বাইরে এসে দাঁড়ানো। শামুকের মতো খোলাটাকে আমরা আমাদেরই অংশ ব'লে মনে করি। বাইরে থেকে স্বতন্ত্রভাবে খোলাটার দিকে চাইলেই ভুলটা ধরা পড়ে।

—মমতা হয় না ছেড়ে যেতে?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—কিছুমাত্র না। অন্ততঃ আমার তো হোল না।—শুভেন্দু বললে,—বোধ হয়, যতক্ষণ ঘরের ভেতরে থাকি মমতা ততক্ষণই থাকে। বাইরে এলেই মমতা আর থাকে না। বোধ হয়।—আবার বললে,—মৃত্যু কত সহজ!

ব্রততী তাড়াতাড়ি সভয়ে ওর মুখ চেপে ধরলে। বললে, ওসব থাক। ও আমি সইতে পারছি না। তোমরা অন্য কথা বল।

অন্য কথা? অন্য কি কথা? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা বুদ্ধিজীবী মানুষ অন্য কি কথা ভাবতে পারে! আশ্চর্য! শুভেন্দু এর মধ্যে স্ত্রী সম্বন্ধে ভালো-মন্দ একটা কথাও বললে না।

ব্রততীর বাড়ি ফিরতে প্রায় বারোটা হোল। যারা এই রকম কঠিন অসুখে শুশ্রূষা করতে সম্মত হবে, তারা সকলে এক জায়গায় থাকে না। সুতরাং তাদের সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরতে বিপিনের দেরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অথচ বিপিন না আসা পর্যন্ত শুভেন্দুকে একা রেখেও চ'লে আসা ব্রততীদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিপিন ফিরলেও ওরা তখনই তখনই চ'লে আসতে পারে না। ঔষধ পথ্য এবং ডাক্তারের অন্যান্য নির্দেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসা দরকার। ব্রততীর বাড়ি ফিরতে এত দেরি হোল সেইজন্যেই।

যখন সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে, তখন প্রথম সে উপলব্ধি করলে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। দোতালার বারান্দায় ইংরাজি পোযাক প'রে নৃপেন একটা ঈজি চেযারে অর্ধশাযিত, চোখ বন্ধ, কিন্তু মুখে সিগারেট! এই পোষাকে এত বেলা পর্যন্ত নৃপেন সাধারণত বাড়ি থাকে না। ব্রততীর সন্দেহ হোল হয় তো তারই জন্যে সে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন ভযে ও উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। নৃপেনের সঙ্গে তার দেখা আজকাল খুব বেশি হয় না। বাড়িতে সে বেশিক্ষণ থাকে না। কাজ, কাজ, সমস্ত-ক্ষণই বাইরে তার অসংখ্য কাজ। সকালের দিকে যেটুকু সময় সে থাকে, ব্রততী পারৎপক্ষে তাকে এড়িয়েই চলে। নৃপেনও নিতান্ত প্রয়োজন না হোলে তাকে ডাকাডাকি করে না। সেই নৃপেন এত বেলা পর্যন্ত অফিস না গিয়ে সত্য সত্যই যদি তারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে তাহ'লে ভয় এবং উৎকণ্ঠার কারণ আছে বই কি।

কিন্তু সে ভাব সে বাইরে প্রকাশ করলে না। নৃপেন যে ওখানে ব'সে আছে এটা যেন সে দেখেইনি, এমনিভাবে সে ব্যস্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লো। অসুখটা ভালো নয়। সুতরাং কাপড়-চোপড়গুলো গরম জলে

ঝুটিয়ে না নিয়ে এবং বেশ ক'রে স্নান না ক'রে ঘরে ঢোকা ঠিক নয়। কিন্তু বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে গিয়েই নৃপেনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

নৃপেন গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমি তোমার জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছি।

ব্রততী বাথরুমের দরজা বন্ধ না ক'রে সেইখানে থেকেই বললে, কি বল।

—তুমি কি শুভেন্দুবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—রাত্রে ওখানেই ছিলে?

—হ্যাঁ।

—একা ছিলে?

—না। ভুজঙ্গদাও ছিলেন।

—ও।—নৃপেনের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির একটা ঝিলিক খেলে গেল, —এখন সেখান থেকেই আসছ?

ব্রততী সেই ব্যঙ্গপূর্ণ কুটিল হাসি যেন দেখলেই না। সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

—আবার কি এখনই সেখানে বেরুবে?

—না।

—বিকেলে বেরুবে?

—ঠিক নেই।

—এখন কার জিম্মায় রোগীকে রেখে এলে?

—ক'টি ছেলের জিম্মায়।

—নার্সের চেয়ে তারা কি ভালো শুশ্রূষা করবে?

—কি ক'রে বলব?

—কারা তারা? চেন তাদের?

—এক-আধ জনকে চিনি।

—মাত্র ? অথচ নার্সকে তাড়িয়ে তাদেরই জিম্মায় ওই রকম কঠিন রোগীকে রেখে এলে ?

—উপায় কি ?

—উপায় যদি নেই, তবে নার্সকে তাড়ালে কেন ?

—আমি তাড়িয়েছি তোমাকে কে বললে ?

—সেই নার্সই বললে। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।

রাগে ব্রততী এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর উত্তর দিলে, তুমি ভুল শুনেছ। আমি তাকে তাড়াইনি।

—তবে ?

—সেকথা শুনে তোমার লাভ নেই। আমি তাড়াইনি, এইটেই জেনে রাখ। কিন্তু তোমার কথাটা কি, যার জন্যে এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছ, তাই বল।

ব্রততীর কথার ঝাঁঝ নৃপেনের কণ্ঠেও সংক্রামিত হোল। বললে, হ্যাঁ, সেইটেই বলি। শুভেন্দুবাবুর অসুখ যত গুরুতরই হোক, তাঁকে শুশ্রূষার অছিলায় সারারাত্রি তুমি বাইরে কাটাও এটা আমি পছন্দ করি না।

চক্ষের পলকে ব্রততীর সমস্ত মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো। চোখ দিয়ে যেন এক ঝলকে আগুন বেরিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে চাকর-বাকর আছে এবং কথাটা এমনই কদর্য যে, এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ খানিক কেলেঙ্কারী সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করবে না, এই কথা ভেবে তখনই সে নিজেকে সংযত ক'রে নিলে।

বললে, আর কিছু কথা আছে ?

—এইটেই কি যথেষ্ট নয় ?

ব্রততী আর কোন কথা না ব'লে দরজাটা দুম ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। নৃপেন অপমানের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। একবার বারান্দায় পায়চারী করলে। কিন্তু তখনই তরতর ক'রে নিচে নেমে গেল। পরক্ষণে মোটরের হর্ণে বাথরুম থেকেই ব্রততী টের পেলে নৃপেন বেরিয়ে গেল।

তারও অনেক পরে ব্রততী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখের অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। শোবার ঘরে আসতেই পিছু পিছু ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার ভাত বাড়ি মা?

তাড়াতাড়ি ব্রততী বললে, না ঠাকুর, ক্ষিধে মোটে নেই। তোমরা খেয়ে নাওগে বরং।

—দু'টিখানি খাবেন না মা?

—না, না।

ঠাকুর আর জেদ করলে না। ব্রততীও দরজা খিল বন্ধ ক'রে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বহু ভাবের সংঘাতে তার দেহে এবং মনে যেন চৈতন্যের লেশমাত্র নেই। ওবাড়ি থেকে যখন সে বার হয় তখন তার একটি অনুভূতিই ছিল, ক্লান্তি। কেবলই মনে হচ্ছিল, মাথায় জল ঢালামাত্র ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসবে। আশ্চর্য! সেই ঘুম যেন কোথায় উবে গেল! তার বদলে দুর্বিষহ জ্বালায় তার চোখদুটো নিদাঘ-মধ্যাহ্নের আকাশের মতো শুকিয়ে উঠেছে! তারই দাহ ছড়িয়ে পড়েছে তার পায়ের নখ থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। বিছানায় নির্জীবের মতো চোখ বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ সে প'ড়ে রইলো। না, ঘুম এল না। ঘুম আসবে না। কে জানে চিরজীবনের মতো ঘুম তাকে পরিত্যাগ করল কি না।

দুজনের মধ্যে মেঘ জ'মে আসছে অনেক দিন থেকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ক্রোধে বারুদের মতো ফেটে প'ড়ে মুখে যা আসে তাই বলা এবং পরক্ষণেই সমুদ্র তরঙ্গের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো মেয়ে সে নয়। ও দুটোই তার আত্ম-সম্মানে বাধে। কিন্তু যে কোনো সময়েই এই দুটোর যে-কোনো একটা অথবা উভয়টাই ঘটতে পারে এই ভয়ে নৃপেন সমস্ত সময় সংকুচিত হয়ে থাকত। সেই নৃপেন কী নির্লজ্জ স্পর্ধায় আজ তাকে ফণা তুলে ছোবল মারতে সাহস করে, ভেবে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বত্রিশ

যথানির্দিষ্ট দিনে শুভেন্দু যক্ষ্মা-হাসপাতালে চ'লে গেল। শ্রী নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল। তার ইচ্ছা ছিল শুভেন্দু একটা কেবিন নিয়ে থাকে। কিন্তু শুভেন্দু যখন কিছুতেই রাজি নয়, পরন্তু এ প্রসঙ্গে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তখন জেদ ক'রে লাভ নেই। বিশেষ ওরা যখন কিছুকালের জন্যে ইউরোপ চ'লে যাচ্ছে, তখন যাওয়ার আগে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটাই বাঞ্ছনীয়।

ওরা যাচ্ছে ২৭শে তারিখে প্লেনে। ২৮শে বিকালে শ্রী হাসপাতালে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। এই ক'দিনের চিকিৎসাতেই শুভেন্দুর কিছুটা উন্নতি হয়েছে। রক্ত আর পড়ে না। ডেপুটি মিনিষ্টারের স্বামী, সুতরাং ডাক্তারে যে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে সেটা বলাই বাহুল্য। তবে শারীরিক দুর্বলতা প্রায় তেমনি আছে। ওটা যেতে নাকি এখনও কিছু সময় নেবে।

শ্রী বললে, এসে যেন দেখি তুমি সেরে উঠে বাড়ি ফিরেছ। কোনো রকম অনিয়ম করবে না।

শুভেন্দুও হাসলে। বললে, চেষ্টা করব সেরে ওঠার। তবে দেখা কার সঙ্গে কোথায় হয় কেউ কি বলতে পারে?

শ্রীর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। ওর শীর্ণ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, ওসব কথা ব'লে যাবার সময় মন খারাপ ক'রে দিও না। আমার ঠিকানা সব সময়েই পাবে। সুতরাং নিয়মিতভাবে চিঠি দেবে। দেবে তো?

—চেষ্টা করব। সমস্তই শরীরের উপর নির্ভর করছে।

—সেইটেই তো উদ্বেগের কারণ। চিঠি না পেলেই ভয় হবে, হয় তো তুমি ভালো নেই। ব্রততীদিকেও ব'লে গেলাম। ভুজঙ্গদাকেও বললাম, কিন্তু সে তো থাকছে না।

সাগ্রহে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কি শীঘ্রিই চ'লে যাচ্ছেন ?

—সামনের রবিবারে। অন্ততঃ তোমার জন্যেও যাতে আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তার জন্যে কত বললাম, কিছুতেই রাজি হোল না।

শুভেন্দুর মুখে যেন অল্প একটু হাসির রেখা মুহূর্তের জন্যে খেলে গেল। বললে, কি বললে ?

—বললে, ওঁর জন্যে চিন্তা কোরো না শ্রী। উনি ঠিক লোকের জিম্মাতেই রয়েছেন। জীবনে অথবা মৃত্যুতে ওঁর সম্বন্ধে উদ্বেগের কিছু নেই।

—তাই বললেন ?—শুভেন্দু চোখ বন্ধ করলে এবং তার সমস্ত মুখের উপর যেন একটা অপার্থিব আলো ঝলমল ক'রে উঠলো।

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই শ্রী বলতে লাগলো: থাকলে ভালো হোত। কিন্তু ওর জেদ তো জানোই, 'না' বললে আর 'হ্যাঁ' করানো যায় না।

ইতিমধ্যে নৃপেন এল। শ্রীর কথাগুলো সে শুনতে পেয়েছিল। বললে, ভুজঙ্গের কথা হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—এতক্ষণ সেইখানে তারই সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলাম। কিন্তু মত ঘুরলো না। সেই রবিবারেই বাহাল রইল। শুভেন্দুবাবুর কথা বললাম, ব্রততীর কথা বললাম, কিন্তু সেই এক কথা !

নৃপেন হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল।

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, ব্রততীর আবার কি হোল ?

—ওর হার্টটা খুব ভালো যাচ্ছে না তো। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। তবু আমি থাকব না। বিপিনটারও পাত্তা নেই। ভুজঙ্গ থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু রাজি হোল না ? অকৃতজ্ঞ !—শ্রী উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

শান্ত কণ্ঠে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, ব্রততীর কথায় কি বললেন তিনি ?

নৃপেন বললে, বললে আমার মাথা! আমার মনে হয় ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। কি বললে জানেন?

শুভেন্দু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

নৃপেন বললে, বললে, না নৃপেন আমার ওপর ভার চাপিও না। অভিভাবক-গিরি আর আমি করব না। অন্যের তো নয়ই,—নিজেরও না। আর শুনবেন পাগলের প্রলাপ!

শুভেন্দু ভালো-মন্দ কোনো উত্তরই দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের প্লেন ছাড়বে কখন?

—আজ দুপুর রাত্রে।

—আকাশ থেকে পৃথিবীটাকে দেখতে খুব অদ্ভুত লাগে, না?

—ম্যাপের মতে মনে হয়।

—কল্পনা করতে পারি: উই-ঢিপির মতো পাহাড়, সরু রূপোর হারের মতো নদী, কাঠের নক্সার মতো জনপদ, সুন্দর 'লনে'র মতো শস্যক্ষেত্র: কল্পনা করতে পারি।

শুভেন্দু কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর হেসে বললে, মানুষের কল্পনা এ পর্যন্ত পৌছয, কিন্তু পরলোকের পথের নক্সা কেউ দিতে পারেনি। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? মরবাব সময় পূর্ণ চৈতন্য নিয়ে সেই পথটি যদি দেখে যেতে পারি এবং পৃথিবীর মানুষকে ব'লে যেতে পারি!

নৃপেন হাসলে: কি হয় তাহ'লে?

শুভেন্দু বললে, কিছুই হয না। বৈজ্ঞানিকরা হয় তো সে রাজ্যও জয় ক'রে ফেলবে তাহ'লে! ওদের সব ভালো, কেবল জীবনে রহস্য কোথাও রাখতে দেয় না, এই তো দোষ!

—ভালোই তো! জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে!

—ছাই হচ্ছে! রহস্যই হোল জীবনেব নুন। এই রহস্য না থাকলে জীবনের স্বাদই চ'লে যায়। নৃপেনবাবু, সমস্ত জানার মধ্যে গৌরব আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। আদিম মানুষের কথা ভাবুন। প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান তাদের ছিল না। তার ফলে, ঝড় যেদিন উঠতো, মেঘ ডাকতো, বজ্র হাঁকতো,

বনে জলে উঠতো দাবানল,—কী থ্রিল তারা পেতো বলুন তো? পৃথিবী সভ্য হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু জীবন থেকে সেই থ্রিল গেছে চ'লে। সে লোকসানও সামান্য মনে করবেন না।

শুভেন্দু হাসলে। তারপর বললে, কেবল একটি জগৎ সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যেমন দুরধিগম্য ছিল, আজও তেমনি রয়ে গেছে।

—কি সেটা?

—মৃত্যু। রোগ শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর কথাটাই বেশি ভাবি।

নৃপেন এবং শ্রী উভয়েই চমকে উঠলো।

বিরক্ত কণ্ঠে শ্রী বললে, ওসব কথা ভাব কেন?

হেসে শুভেন্দু বললে, ওর চেয়ে ভালো কথা আর খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে! জীবনভোর যত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গবেষণায় কাটালাম। অথচ মৃত্যু, এ রহস্যের কিনারা কেউ করতে পারলে না! জানো শ্রী, নচিকেতা জীবন-রহস্য জানবার জন্যে যমের কাছে গিযেছিলেন। তার মানে, জীবনের রহস্য মৃত্যুর গুহাতেই লুকোনো রযেছে। এই তত্ত্ব জানা হোলেই সমস্ত জ্ঞান অধিগত হয়।

নৃপেন হেসে বললে, কিন্তু জানতে তো কেউ পারলে না!

—তাই বা কেমন ক'রে বলবেন? এক এক রকম ক'রে এক একজন ঋষি এর কিনারা করেছেন। হয় তো পূর্ণতত্ত্বে কেউ পৌছুতে পারেন নি। জানেন নৃপেনবাবু, নচিকেতাকে যম এই জ্ঞান বাদে আব সব দিতে চেয়েছিলেন। মরণশীল মানুষ মৃত্যুর তত্ত্ব জানুক এ তিনি চাননি। কারণ অমৃত রয়েছে এরই মধ্যে। মৃত্যুর দরজা থেকে, কেন জানি না, সেই অমৃতই আমাকে ডাকছে। চোখ বন্ধ ক'বে মৃত্যুব অন্ধকাব যবনিকাব দিকে চেযে থাকি। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎশিখা যদি সেই অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে সেই অমৃতলোকেব একটুখানি আমার গোচরে আনে, আমি আর কিছুই চাই না।

শুভেন্দু শান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে।

একটু পরে আবার বললে, আমার কি মনে হয় জানেন, যে-অমায়া দিযে পরলোককে জানা যায়, তার কিছুটা ভুজঙ্গবাবু পেয়ে গেছেন।

—ভুজঙ্গ !—নৃপেন যেন আকাশ থেকে পড়লো,—সে তো রাজনীতিক। এ সব চর্চা সেও করে নাকি ?

শুভেন্দু হাসলে : হাঁসের বাচ্চাকে সাঁতার শেখবার জন্যে জলের কাছে যেতে হয় না। ও বিদ্যাটা না শিখেই সে জন্মের সঙ্গে পেয়ে যায়।

শুভেন্দু আবার চোখ বন্ধ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলো।

নৃপেন শ্রীকে ইশারা করলে।

শ্রী বললে, আমরা এই বার উঠবো। তৈরি হয়ে নিয়ে এগারোটার মধ্যেই এরোড্রোমে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। কাষ্টম্‌সের হাঙ্গামা আছে।

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি বললে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তোমরা আর দেরি কোরো না। তোমাদের পথ শুভ হোক !

শুভেন্দু হাসতে লাগলো,—ওরাও।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শ্রী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—কি হোল ?—নৃপেন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।—শ্রীর চোখ ছল ছল করছে।

—সে আবার কি ! নৃপেন বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

শ্রী নিরুত্তরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

—তোমার কি মন খারাপ করছে ?

—হ্যাঁ। ভয় হচ্ছে ফিরে এসে আর দেখতে পাব না হয় তো।

—বেশ তো। চল না, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা যাক।

ডাক্তারের সঙ্গে শুভেন্দুর অসুখ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হোল। ডাক্তার বললেন, এ সব রোগ সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা কঠিন। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এটা রোগের গোড়ার দিক। অধিকাংশ রোগীই এ অবস্থায় এসে নিরাময় হয়ে ফিরে যায়। অন্ততঃ দু'তিন মাসের মধ্যে রোগ কঠিন দাঁড়াবে না এ নিশ্চিত। আপনারা সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে আসতে পারেন।

ওরা চ'লে এল। নৃপেন শ্রীকে অনেক বোঝালে। কিন্তু শ্রীর মন খুব নিশ্চিন্ত হোল ব'লে মনে হোল না।

তথাপি যথানির্দিষ্ট প্লেনে তারা চ'লে গেল এবং প্লেন ভারতের সীমানা পার হ'তেই শ্রীর মন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ওদের তুলে দিতে অন্য বন্ধুরা অনেকেই এরোড্রোমে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ কিংবা ব্রততী যেতে পারেনি। বিপিনও না। ওরা যে আসবে না, একথা ওরা জানতো। তবু এরোড্রোমে ওদের না দেখে নৃপেন এবং শ্রী উভয়েই ওদের অনুপস্থিতি অনুভব করছিল। অথচ মুখ ফুটে ওরা নিজেদের মধ্যেও এ প্রসঙ্গ তুলতে পারছিল না।

পরদিন সকালে বিপিন এল ভুজঙ্গের কাছে।

—কি খবর বিপিন ?

—বৌদির হার্টটা কষ্ট দিচ্ছে।

ভুজঙ্গ সহাস্যে বললে, খুবই দুঃসংবাদ বিপিন! ওই মেয়েটির হার্ট ছাড়া আর কীই বা আছে বল? সেটাই যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, আর ওর কি রইল ?

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বিপিন বললে, আপনি হাসছেন!

—হাসিরই তো কথা বিপিন! আমার হাত দুটোই যদি আমার দেহের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিমান হয় এবং হঠাৎ একদিন সেই হাত দুটোই আমার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়, তাহ'লে এই বয়সে হাসা ছাড়া আর কি করবার আছে বলো? চল, একবার তাকে দেখে আসি।

দোতালার ঘরে ব্রততী নিঃশব্দে শুয়ে।

আগের দিন থেকেই ও বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিল। নৃপেন একজন ডাক্তারকে 'কল' দেয়। তার প্রবাস-যাত্রার প্রাক্কালেই ব্রততীর এই অসুখে সে ভিতরে ভিতরে বিরক্তই হয়েছিল এবং সেই বিরক্তি আর কারও চোখে না পড়লেও ব্রততীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

ডাক্তারটি প্রবীণ এবং বহুদর্শী। কিন্তু নিজে তিনি হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ নন। ঔষধ একটা তিনি দিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করার জন্যেও পরামর্শ দিলেন।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, আজ রাত্রের মধ্যেই ভয়ের কোনো কারণ নেই তো ?

—না, না। সে রকম কিছু নয়। তবে অসুখটার ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে গেলে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো দরকার।

ব্রততীর ভয় হয়েছিল মধ্যরাত্রে ওদের প্রবাস যাত্রার আগেই কিছু না হয়ে বসে। তাহ'লে ভীষণ লজ্জা পেত সে। সে রকম ভয় নেই শুনে সে আশ্বস্ত হোল। কিন্তু সকালে এসে এই কথা শুনে বিপিন আশ্বস্ত হোল না। সে তৎক্ষণাৎ একজন হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞকে, ব্রততীর প্রচণ্ড প্রতিবাদ সত্ত্বেও, নিয়ে এল।

তিনি এসে অনেক রকম যন্ত্র দিয়ে অনেক রকম ক'রে ব্রততীকে পরীক্ষা করলেন। নিযমিত ভাবে ঔষধ সেবনেব ব্যবস্থা কবলেন এবং সপ্তাহ কাল বিছানা থেকে ওঠা বন্ধ ক'রে দিলেন। এব° এই সমস্ত ব্যবস্থায বিপিন ভয় পেয়ে গেছে দেখে চ'লে যাবার সময তাকে অনেক আশাব কথাও ব'লে গেলেন।

বিপিনেব পিছু পিছু ভুজঙ্গকে আসতে দেখে ব্রততী হেসে ফেললে।

সাগ্রহে বিপিন জিজ্ঞাসা কবলে, এখন ভালো বোধ হচ্ছে বৌদি ?

—খুব ভালো।—ব্রততীর চোখে দুষ্টুমিভবা হাসি।

আনন্দে বিপিনের চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো : খুব বড় ডাক্তার যে বৌদি ! অত বড় ডাক্তাব ক'লকাতায আর নেই। একটি মাত্রা ওষুধেই কি রকম ফল পাওযা গেল দেখলেন তো ?

ব্রততী বললে, এক মাত্রার পরেও অসুখ একটুখানি ছিল। তোমার কবলে ভুজঙ্গদাকে দেখে সেটাও গেছে।

ব'লে ব্রততী ফিক ক'বে হাসতেই ভুজঙ্গ হো হো ক'রে হেসে ফেললে।

বিপিন চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাসছেন ! এর মধ্যে হাসির কি আছে ?

—কিছু না বিপিন। তুমি বোসো।—ভুজঙ্গ তাকে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে বলতে লাগলো,—এইটেই মেয়েটার রোগ,—হাসি আর কান্না, কান্না আর হাসি। লোকে যখন ওর দুঃখে কাঁদে, ও হাসে। আর লোকে

যখন নিজের দুঃখে হাসে, ও তখন কেঁদেই আকুল। ওর এই অসুখটারই আগে চিকিৎসা দরকার ছিল।

বিপিন বুঝলে এটাও পরিহাস। গুম হয়ে ব'সে রইল।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, শুভেন্দুদা কেমন আছেন ?

ভুজঙ্গ উত্তর দেবার আগেই বিপিন কামানের মতো গর্জন ক'রে উঠলো: কে কেমন আছে সে চিন্তা বাদ দিয়ে নিজে কেমন থাকেন সেই চিন্তা করুন।

এক ঝলক হাসি ব্রততীর গলা পর্যন্ত উঠে এসেছিল। কিন্তু বিপিনের মুখ-চোখেব ক্রুদ্ধ অবস্থা দেখে হাসতে সাহস করলে না। শান্ত কণ্ঠে বললে, আমার আর থাকা-থাকি কি ঠাকুরপো! ম'রে যাব কাঁধে ক'রে ফেলে দিয়ে আসবে। তারপরে আবার নতুন বৌদি আসবে, তার সঙ্গে নতুন আনন্দেব সম্পর্ক হবে।

বিপিন রেগে উঠে চ'লে গেল।

ভুজঙ্গ বললে, না, না। ওকে রাগিও না ব্রততী, ও এখন পরিহাস বোঝবার অবস্থায় নেই। ডাক্তারে তোমার সম্বন্ধে কি ব'লে গেল ?

—কিছু ভালো, কিছু মন্দ,—যা তাঁরা ব'লে থাকেন। কিন্তু সে যা হয় হবে, আপাতত সাত দিন বিছানা থেকে ওঠা নিষেধ হয়েছে। সেইটেই বিপদ। অবশ্য ঠাকুরপোর সতর্ক পাহারার জন্যেই বিপদ। নইলে সকালেই তোমাব কাছে ছুটে পালাতাম।

—আর সেখানে আমার কাছে বকুনি খেতে না ?

—তুমিও বকতে? সর্বনাশ! তাহ'লে আমাব বন্ধু আজ কে আছে?

—কেউ নেই। ডাক্তারের হুকুম মেনে তোমাকে চলতেই হবে। সেবে ওঠ, তারপরে যা খুসি কোরো।

—সেরে উঠতেই হবে? কিসের জন্যে ভুজঙ্গদা?—ব্রততীর একচোখে হাসি, অন্য চোখে জল।

ভুজঙ্গ এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে বিব্রত হয়ে উঠলো। এবং যেন তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই ব্রততী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, শুভেন্দুদা'র খবর জানো ?

—জানি।—ভুজঙ্গ যেন সরস হয়ে উঠলো,—হাসপাতালে চমৎকার আছেন। অন্য রোগীদের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলেছেন। যেগুলি কঠিন রোগী তাদের অল্প-স্বল্প শুশ্রূষাও করছেন। আর অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে গবেষণা করছেন।

—কি সম্বন্ধে?

—মহারাজ প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে নয়। এখন তারও চেয়ে শক্তিধর সম্রাটকে নিয়ে পড়েছেন।

—তাঁর নাম?

—ধর্মরাজ যম। গবেষণা খুব দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, বুঝিবা উভয়ের মিলন ঘটে।

ব্রততী তাড়াতাড়ি বললে, ওসব কথা বোলো না ভুজঙ্গদা। তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না?

ভুজঙ্গ লজ্জিত হাস্যে বললে, না, বলিনি ওসব কথা। শুধু মনের আশঙ্কাটা প্রকাশ করছি। আজ বিকেলে তাঁকে দেখতে যাবার ইচ্ছা আছে। তোমার কিছু বলবার আছে?

—কি আর বলবার থাকবে?—তারপর হেসে বললে,—বোলো, আজ আমিও দেখতে যাব ভেবেছিলাম। শুধু তোমাদের বকুনির ভয়ে পারলাম না। ইচ্ছে করলে, ঠাকুরপোর গল্পও করতে পার।

বলতে বলতে তার বড় বড় দুটি চোখ স্নেহে কোমল হয়ে উঠলো।

ভুজঙ্গ সজোরে বললে, নিশ্চয়ই বলব। সম্প্রতি ওইটেই তো সব চেয়ে বড় আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সে রেগে চ'লে গেল কোথায়? পালালো না তো?

নিশ্চিন্তভাবে ব্রততী বললে, সে মুরোদ নেই। মুবগীর দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কিন্তু ওকে বেশি রাগাতেও ভয় হয়।

—কেন?

—কেন? দেখলে তো রাগের ভঙ্গি। রাগের ঝোঁকে হয়তো মালিশের ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে খাওয়ার ওষুধটা নিয়ে মালিস করতে বসবে!

উভয়েই হেসে উঠলো।

এমন সময় বিপিন বড় বড় পা ফেলে এসে উপস্থিত হোল। বলতে লাগলে: খবর ভালো নয়। শুভেন্দুদা'র আবার রক্তবমি হচ্ছে।

—সে কি!—ব্রততী চমকে উঠলো।

—হ্যাঁ। আমি সেখান থেকেই আসছি। আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিলে না। তবে বললে, ভয়ের কিছু নেই। কোনো রকম উত্তেজনায় এ রকম হয়ে থাকবে।

ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বললে, আমি জানতাম।

—কী জানতে?—ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে।

—যে এই রকম একটা কিছু হবে। ওদের ইউরোপ যাওয়ার ধাক্কাটা বেগ দেবে।

তিনজনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো। এ প্রসঙ্গে এর বেশি আর বলার কিছু নেই। ব্যাপারটা যতদূর এগিয়েছে তাতে ক্রোধও নিষ্ফল। স্তব্ধতাই এর একমাত্র সম্বল।

হঠাৎ ব্রততী বললে, আমি যাব ঠাকুরপো।

—কোথায়?—ভুজঙ্গ এবং বিপিন উভয়েই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

—হাসপাতালে। শুভেন্দুদাকে দেখতে। তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, আমাকে নিষেধ কোরো না। তোমরা আমার অবস্থা যত খারাপ ভাবছ, তত খারাপ সত্যিই নয়। বরং এখানে শুয়ে শুয়ে যদি এলোমেলো দুশ্চিন্তা পোয়াতে হয়, তাহ'লেই খারাপ হবে।

বিপিন বিব্রত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বৌদির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, কিন্তু আপনাকে তো দেখা করতে দেবে না।

—কেন দেবে না? আমি তাঁর বোন, আমাকে দেখা করতে দেবে না?

—না। এই অবস্থায় শুভেন্দুদা'র কথা বলা নিষেধ। তাঁর বোনকেও দেখা করতে দিলে না।

—ইলাদিকে! ইলাদি ফিরে এসেছেন?

—একটু আগেই এসেছেন। স্টেশন থেকে বরাবর হাসপাতালে গিয়েছিলেন। দেখা না পেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। ওকি! আপনি ওরকম করছেন কেন বৌদি? ওরকম করছেন কেন?

বিপিন চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে ভুজঙ্গও। একবার মনে হোল, বিপিন বুঝি হুমড়ি খিয়ে বৌদির উপর পড়ে। তার সমস্ত শরীর ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। একটা ছোট শিশি ভুজঙ্গের হাতে দিয়ে সে বললে, আমার হাত কাঁপছে। আমি পারব না। এ থেকে কুড়ি ফোঁটা ঢেলে আপনি বৌদিকে দিন, আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করি।

সে ছুটে পাশের ঘরে টেলিফোন করতে গেল। ওষুধটা ঢেলে ভুজঙ্গ একটু একটু ক'রে ব্রততীর মুখে দিতে লাগলো। যখন ডাক্তার এলেন, তখন ব্রততী একটুখানি সুস্থ হয়েছে। সুতরাং তাঁর করণীয় খুব বেশি ছিল না। সেইটুকু সেবে যাবার সময় ওদের দুজনকে ব'লে গেলেন: ওঁকে যদি বাঁচাতে চান তাহ'লে কথা বলতে কিংবা বেশি নড়াচড়া করতে একদম দেবেন না। আর সমস্ত রকম উত্তেজনা থেকে ওঁকে দূরে রাখতে হবে।

"কেন? সেরে উঠতেই হবে? কিসের জন্যে ভুজঙ্গদা?"—বাড়ি ফেরার সময় সমস্ত পথ, ডাক্তারের মূল্যবান নির্দেশ নয়, ব্রততীর এই কথাটাই ভুজঙ্গের কানে বারে বারে একটানা সুরে কেবলই ধ্বনিত হতে লাগলো।

বিকেলে ভুজঙ্গ হাসপাতালে গেল।

বিপিনের কথাই ঠিক। কাকেও শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কথা বলা নিষেধ। আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে উত্তেজনা বাড়তে পারে। তা ছাড়া, ভুজঙ্গ অনেকগুলি ডাক্তার ও নার্সের ঘোরাফেরায় অনুমান করলে, ইনজেকশন অথবা ওই জাতীয় কোনো চিকিৎসাও হয়তো চলছে।

কয়েকজন ডাক্তার এবং নার্সের সঙ্গে তার দেখা হোল, কথাও হোল। সকলেই একবাক্যে তাকে আশ্বাস দিলে যে, ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

হয় তো উঠবে। কিন্তু সেজন্যে ইলা ব্যস্ত হ'তে পারে, ব্রততী উদ্বিগ্ন হ'তে পারে, ভুজঙ্গ নয়। সে শুধু জানতে এসেছিল, মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দু কি জীবন-রহস্যের সন্ধান কিছু পেয়েছে? পেলে সেই তত্ত্বটাই সে জেনে যেত। কিন্তু তা যখন জানার উপায় নেই তখন ধীরে ধীরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল।

এবারে কোথায় যাওয়া যায়? ব্রততীর কাছে নয় নিশ্চয়ই, সেখানে গেলে শুভেন্দুর প্রসঙ্গ সে তুলবেই। আবার উত্তেজিত হবে এবং হয়তো বা সকালের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সুতরাং সেখানে নয়।

তাহ'লে কোথায়?

একদিন ছিল যখন ভুজঙ্গের যাবার জায়গার অভাব ছিল না, অসংখ্য তার বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মী ছিল, কোথায় যাবে না, এই ঠিক করাই কঠিন হয়ে পড়ত। আজ প্রথম তার মনে হোল, তার পৃথিবী একান্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বস্তুতঃ অনেক চিন্তার পর ইলাদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার থাকতে পারে ব'লেই সে স্মরণ করতে পারলে না। ধীরে ধীরে সেই দিকেই সে চলতে লাগলো।

অনেক পরে সেখানে যখন সে পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু ইলাদের বাড়ি অন্ধকার। তারা ফিরেছে এ খবর সে বিপিনের কাছে শুনেছে। তাহ'লে কি তারা কোথাও বেরিয়েছে? দরজার কড়া নাড়বে, কি না নেড়েই ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় একটা চাকর বাইরে থেকে এসে দরজার কড়া নাড়লে এবং ভুজঙ্গকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান?

—বাবু আছেন? কিংবা মাজী?

—আছেন। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—বল, ভুজঙ্গবাবু এসেছেন।

চাকরটা ভিতরে চ'লে গেল এবং তখনই ফিরে এসে বাইরের ঘর খুলে দিয়ে আলো জ্বলে দিলে। বললে, বসুন।

একটু পরেই শঙ্কর এল।

নমস্কার বিনিময়ের পর ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, আজ সকালে ফিরেছেন?

—হ্যাঁ। ওখান থেকে সটান হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

—তাও শুনেছি।

—কার কাছে শুনলেন?

—আমাদের বিপিন সে সময় হাসপাতালে ছিল।

—তা হবে। কিন্তু শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা তো হোল না।

—আমিও এই মাত্র ফিরে আসছি।

—দেখা হয় নি?

—না। তবে সকলেই বললেন, ভয়ের কিছু নেই।

—হুঁ।

—আপনারা টেলিগ্রাম পেলেন কবে?

—টেলিগ্রাম যখন গোয়ালিয়রে যায়, আমরা তখন আজমীরে। খবর পেতে সেজন্যে দেরি হয়। নইলে আরও আগে এসে পড়তে পারতাম। অসুখটা কি বলুন তো? বাঁচবে তো?

—ডাক্তারে তো ভরসা দিচ্ছেন।

ব'লে ভুজঙ্গ মোটামুটি অসুখের একটা বিবরণ দিলে।

—বৌদি কোথায়?—শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে।

—শ্রী তো উপ-মন্ত্রী হয়েছে। জানেন না?

—খবরের কাগজে দেখিছি। ভেবেছিলাম, হাসপাতালেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। হয় তো শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা হবে না জেনেই আসেনি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি তাকে প্রত্যাশা করছি।

ভুজঙ্গের মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়ল: সে তো এখানে নেই শঙ্করবাবু, ইউরোপ গেছে।

—ইউরোপ! তাহ'লে? তাকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—সে তো ওঁকে হাসপাতলে ভর্তি করিয়ে দিয়েই গেছে শঙ্করবাবু। অল্পদিনের জন্যেই গেছে। ডাক্তারে বললেন, ভয় নেই। তাই

ইলা যে কখন ঘরে এসেছে ওরা কেউ টের পায়নি। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে,

ডাক্তারে বললে, ভয় নেই, আর সে চ'লে গেল,—পাটনা নয়, কাশী নয়,—একেবারে ইউরোপ! আপনাদের কি হৃদয় ব'লে কিছুই নেই ভুজঙ্গবাবু?

ভুজঙ্গ নতমুখে এই তিরস্কার যেন শিরোধার্য ক'রে নিলে। বুঝলে, স্ত্রীর সম্বন্ধে অনেক কিছুই এখনও ইলাদের অপরিজ্ঞাত।

তারপর বললে, থেকেই বা কি করত বলুন। আপনি তো এসেছেন, এখনও দাদার সঙ্গে দেখাই হোল না।

শঙ্করও বললে, সত্যি ইলা। এ অসুখে থেকেও কোনো লাভ হ'ত না। তার চেয়ে যেখানে গেছে, তার ফলে দেশের উপকার করতে পারবে।

ইলা ক্রোধে চিৎকার ক'রে উঠলো: তুমি বল কি গো? দেখা হোক বা না হোক, রুগ্ন স্বামীকে ফেলে বাইরে যেতে কোনো মেয়ের ইচ্ছা হয়।

—ইচ্ছা হয়তো ছিল না। হয়তো বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছে। না কি বলেন ভুজঙ্গবাবু?—শঙ্কর শান্ত কণ্ঠে বললে।

—সম্ভবত।—ভুজঙ্গ কোনো রকমে উত্তর দিলে।

প্রতিবাদে ইলা আরও কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ব্রততীদির খবর কি?

—ভালো নয়।—ভুজঙ্গ বললে।

—কেন, কি হয়েছে?

—হার্ট। আজ সকালে শুভেন্দুবাবুর খবর শুনে এমন হোল যে, মনে হোল সব শেষ হয়ে গেল বুঝি। কী ব্যস্ত হয়ে উঠল বিপিন। নৃপেন নেই। বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-পুত্র সকলের অভাব যেন সে একাই পূরণ করতে চায়। পাগলের মতো হয়ে উঠেছে সে।

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, নৃপেনবাবু কোথায় গেলেন?

—ইউরোপ। ওরা দুজনে তো এক প্লেনেই গেছে।

ইলা তার স্ত্রীসুলভ সহজাত বুদ্ধিবশে যেন চমকে উঠল এবং কি রকম একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে রইল। একটা কথাও বললে না।

কিন্তু শঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, দেখ দুই উন্মাদের কাণ্ড! একজনের স্বামী আর একজনের স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত, আর কাজে-পাগল

দুটি লোক অক্লেশহীন চ'লে গেল ইউরোপ! এরকম পাগল আর ক'টি আপনাদের দলে আছে ভুজঙ্গবাবু?

ভুজঙ্গ জবাব দিলে না। ইলা নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আপনার খবর কি ভুজঙ্গবাবু? কাগজ কেমন চলছে?

—ভালো। কিন্তু আমিও তো রবিবারে চ'লে যাচ্ছি শঙ্করবাবু।

শঙ্কর যেন লাফিয়ে উঠল: কোথায়? ইউরোপে?

ভুজঙ্গ হেসে ফেললে। বললে, না ইউরোপে নয়। আমি যাচ্ছি আমাদের আগেকার আশ্রমে।

—সে কোথায়?

—কাপাসতলা ব'লে একটি গ্রাম আছে সেইখানে।

—কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন?

—ইচ্ছা আছে বাকি জীবনটা সেইখানেই কাটাব।

—আর আপনার কাগজ?

—কাগজ ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন?

শঙ্কর উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। শুভেন্দুর যক্ষ্মা, ব্রততীর হৃদরোগ এবং ভুজঙ্গের কলিকাতা-ত্যাগ, এর প্রত্যেকটি যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। ভুজঙ্গ তার প্রশ্নের উত্তর দিলে না দেখে সে আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলে।

উত্তরে ভুজঙ্গ বললে, ভালো লাগছে না।

—কেন, মাইনে তো শুনেছি বেশ ভালোই দেয়।

—তা দেয়।—ভুজঙ্গ হাসলে।

—তাহলে ভালো লাগছেনা কেন?—ভুজঙ্গের উত্তর শঙ্করের কাছে একটা হেঁয়ালির মতো বাজছে।

—কেন জানি না। কিন্তু ভালো মাইনে সত্ত্বেও ভালো লাগছে না শঙ্করবাবু। তাই চ'লে যাচ্ছি সেই মশা-মাছি-ম্যালেরিয়ার দেশে।—ভুজঙ্গ হাসলে।

কিন্তু শঙ্কর ভয়ে লাফিয়ে উঠল। বললে, ওসবও সেখানে আছে না কি?

—আছে বই কি!

—না, না ভুজঙ্গবাবু, ওসব পাগলামি করবেন না। মারা পড়বেন যে!—ভয়ে শঙ্করের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলে।

কিন্তু ভুজঙ্গকে এ প্রসঙ্গের আর জের টানতে হোল না। ইলা এসে বললে, দেখলাম আপনি গাড়ি এনেছেন। আমাকে ব্রততীদির বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?—শঙ্করের দিকে চেয়ে বললে,—তোমার যাবার দরকার নেই। বাড়িতে কেউ নেই।

ভুজঙ্গের বুঝতে বিলম্ব হোল না, ইলার মনে কি সন্দেহ উঠেছে। বিষয়টা সে নিরিবিলি ব্রততীর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় ব'লে শঙ্করকেও সে নিবে যেতে নারাজ। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি এই সব ব্যাপারে ক্ষুরধার।

শঙ্কর বললে, তাই যাও। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছাও করছে না। কিন্তু প্রস্তাবটা আধখানা বললে কেন?

—আধখানা আবার কি!—ইলা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—ব্রততীদির বাড়ি শুধু নিয়ে গেলেই তো হবে না, আবার এখানে ফিরিয়েও তো দিয়ে যেতে হবে।—শঙ্কর বললে।

ইলা তাড়াতাড়ি বললে, না, না, তার দরকাব হবে না। ফেববার সময় ব্রততীদির গাড়িখানা পেতে পারব।

কিন্তু ভুজঙ্গকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দিগ্ধভাবে ইলা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাব কি অসুবিধা হবে ভুজঙ্গবাবু?

—অসুবিধা কিছু নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কি কথা?

—আপনি কি জানবার জন্যে ব্রততীর কাছে যেতে চাচ্ছেন আমি জানি। কিন্তু তার হার্টের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। ডাক্তাব নড়া-চড়া, এমন কি কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এতটুকু উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

ইলা চুপ ক'রে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, আমি কিছুই জানতে যাচ্ছি না ভুজঙ্গবাবু। নিতান্ত মামুলী কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই জিগ্যেস করব না। আমি দশ মিনিট তার কাছে ব'সেই চ'লে আসব। আপনি আর আপত্তি করবেন না ভুজঙ্গবাবু।

এমন অনুনয় ক'রে কথাকয়টি সে বললে যে, ব্রততীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা ক'রেও ভুজঙ্গ আর আপত্তি করতে পারলে না। বললে, চলুন।

গাড়িতে উঠে ইলা জিজ্ঞাসা করলে, এরা কবে গেছে ভুজঙ্গবাবু?

ভুজঙ্গ বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, চমকে জিজ্ঞাসা করলে, কারা?

—নৃপেনবাবুরা।

—কাল রাত্রের প্লেনে।

—কবে ফিরবেন ঠিক নেই?

ভুজঙ্গ বললে, ওদের কাছে হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি জানি না।

—জিগ্যেস করেননি?

—না। আমার সঙ্গে কিছুদিন দেখাও হয়নি।

ইলা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। কিন্তু একটু পরেই বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

এর জন্যে ভুজঙ্গ প্রস্তুতই ছিল। বললে, করুন।

—আপনাদের মনে ওদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই?

—সন্দেহের ওপর তো নির্ভর করা যায় না ইলাদেবী। সন্দেহ অনেক সময় অমূলক হয় দেখা গেছে।

এই উত্তরই ইলার কাছে যথেষ্ট। সে আর কিছু বললে না।

গাড়ি ব্রততীর বাড়ি পৌঁছুলে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি অপেক্ষা করব?

—ওপরে যাবেন না আপনি?

—না। আপনি যান। আমি বরং অপেক্ষা করি।

—তাহ'লে আর অপেক্ষা ক'রে কি করবেন ? আমি তো ব্রততীদির গাড়িতে ফিরতে পারি।

—বোধ হয় না।

—কেন ?

ব্রততী যে গাড়ী চড়ে না, সে কথা বলার কোনো আবশ্যক নেই। এখন সে অসুস্থ, সেই অজুহাতেই ভালো। বললে, নৃপেন নেই। ব্রততীরও বাইরে বেরুনো নিষেধ। সুতরাং ড্রাইভারটা আছে না বেরিয়েছে, ঠিক তো নেই।

ইলা সভয়ে বললে, তাহ'লে আপনি একটু কষ্ট ক'রে অপেক্ষাই করুন। ফেলে পালালে মুস্কিলে পড়ব।

—বেশ। কিন্তু অনাবশ্যক দেরি করবেন না যেন।

—না।

ইলা চ'লে গেল।

ব্রততী তখন খাটে শুয়ে একখানা নভেল পড়ছিল। ইলাকে দেখে সে বিস্মিত হোল না। বরং মনে মনে যেন তার প্রত্যাশাই করছিল। বললে, আসুন। আপনার আসার খবর আমরা আগেই পেয়েছি।

তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। কিন্তু কালি-পড়া দুটি চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

—আপনার জ্বর নেই তো ?—ইলা জিজ্ঞাসা করলে।

—না। আমি ভালোই আছি। এরা জোর ক'রে আমাকে শুইয়ে রেখেছে। কী অত্যাচার দেখুন তো ?

ব'লে একবার হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ইলার ভয় হোল ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল না ঝ'রে পড়ে।

বললে, বিশ্রাম তো পান না। ওদের চাপে প'ড়ে নিন না দু'দিন অবসর।

—তাই নিচ্ছি।

ইলা যা দেখবার জন্যে এবাড়ী এসেছিল তা হয়ে গেছে। শ্রী ও নৃপেনের সম্বন্ধে যে সন্দেহ ভুজঙ্গের একটা কথায় তার মনে উঠেছিল, ব্রততীর মুখ, তার

চোখ, তার কণ্ঠস্বর সমস্তই সেই সন্দেহের অনুকূল সাক্ষ্যই দিচ্ছে। ব্রততী ওর চোখে চোখ রাখতে পারছিল না।

বললে, আপনি এসে পড়েছেন তাই বিশ্রাম নিচ্ছি। নইলে কারও সাধ্য ছিল না আমাকে শুইয়ে রাখে। দাদার অমন অসুখ, আমার কি এখন শুয়ে থাকার সময়!

—তাতেও লাভ হ'ত না ব্রততীদি। আজ সকালে আমরা গিয়েছিলাম, দাদার সঙ্গে দেখা করতে দিলে না। বিকেলে ভুজঙ্গবাবু গিয়েছিলেন, তাঁকেও না।

—কি বলছে?

—বলছে তো ভয়ের কিছু নেই।

—তাহ'লে দেখা করতে দিচ্ছে না কেন?

—রক্তপড়া বন্ধ করবার জন্যে ওঁরা চেষ্টা করছেন। তাছাড়া এসময় কথা বলা তো নিষেধ। আত্মীয়-স্বজন দেখলে রোগীর মানসিক উত্তেজনা হ'তে পারে। সেটাও রোগীর পক্ষে খারাপ। সেই জন্যে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না।—ভুজঙ্গের কণ্ঠস্বর—কিন্তু ওকে আর কথা বলতে দেবেন না ইলা দেবী। বিপিন হঠাৎ এসে প'ড়ে এই কাণ্ড দেখলে আর রক্ষা রাখবে না।

ব্রততী হেসে ফেললে। বললে, সত্যি ইলাদি, ও যে কি করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মুখখানা তো দিনরাত্রি পেঁচার মতো ক'রে রেখেছে। আর একটা হাঁই তুলছি তো ছুটছে ডাক্তারের কাছে! ডাক্তারও বুঝেছে, একটা রোগী পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু ও কোথায় খাচ্ছে জানো ভুজঙ্গদা?

—ঠিক জানি না। তবে যেখানে রোজ খায় সেইখানেই খাচ্ছে নিশ্চয়।

—সেটা কোন চুলোয় জানো?

—তা জানি না ব্রততী। তুমি কোনো দিন জিগ্যেস করনি?

—না। আমার তো সন্দেহ হয় ও রোজ খায় না!

—সে সন্দেহ আমারও আছে। কিন্তু কি করা যাবে বল?

ইলা এতক্ষণ অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিল। এখন জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বিপিনবাবু কি এখানে থাকেন না ?

ব্রততী চুপ ক'রে রইল। ভুজঙ্গ বললে, না।

—থাকেন না কেন ? ঝগড়া-ঝাঁটি করেছেন ?

ভুজঙ্গ জবাব দিলে, না। তবু কেন যে থাকে না তা সেই জানে।

—কোথায় থাকেন তাহ'লে ?

—তাও সেই জানে।

—তাহ'লেও একটা কোথাও থাকেন তো ?

—আশা করা যায়।

—কিন্তু রোজ খাওয়া হয় না এ সন্দেহ করছেন কেন ?

—ব্রততীর সন্দেহ হচ্ছে বোধ হয় চেহারা দেখে। চেহারাটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে।

এ বাড়ি যে দু'দিন এসেছে, বিপিনের সঙ্গে তারই পরিচয় হয়েছে এবং বিপিনের ব্যবহারে সেই মুগ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিপিনের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে শুনে ইলার মুখখানি ম্লান হোল।

ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে তো তিনি খুবই ভক্তি করেন। আপনার কথাও শোনেন না ?

—কই শোনে!—ব্রততী অস্বস্তির সঙ্গে উত্তর দিলে।

ইলা শেষ পর্যন্ত রায় দিলে: এখনকার ছেলেরা ওইরকমই হয়েছে! নিজেই কষ্ট পাবে, আপনার আর কি ব্রততীদি!

ভুজঙ্গ হেসে বললে, সে আর কি কষ্ট পাচ্ছে! কষ্ট পাচ্ছে ব্রততীই!

ইলা হেসে ফেললে। বললে, তা যা বলেছেন! বিপিনবাবুর কথা আপনি এখন ভাববেনই না ব্রততীদি।

—এখন তো ভাবছি না ইলাদি। যে-ক'টা দিন আমি বেঁচে আছি, আমার দিকে চেয়েও ও নিজের ওপর খুব বেশি অত্যাচার করতে সাহস করবে না। ভাবছি, আমি ম'রে গেলে ওকে বাঁচাবে কে ?

ব্রততী নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা বড় রকম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

ভুজঙ্গ ইলাকে ইসারা করলে, আর নয়। এবার উঠতে হয়েছে।

ইলা ব্রততীর একখানা হাত ধ'রে বললে, আজ আমি উঠি ব্রততীদি। আপনার খবর নিতেই আসা। কাল-পরশু আবার আসব।

—আসবেন। সঙ্গী-সাথী কেউ তো নেই, তার ওপর ঠাকুরপোর চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারা। এই দু'দিনেই হাঁফিয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে এলে বড় খুশী হব। তার ওপর চিন্তা শুভেন্দুদা'কে নিয়ে। আমাকে তো উঠতে দিচ্ছে না। ওঁর খবরটা নিবে আমাকে জানাবেন।

তারপর ভুজঙ্গের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার যাওয়া রবিবারেই ঠিক তো?

—এখন পর্যন্ত তার নড়চড় হবার কোনো কারণ তো ঘটেনি।

—তাই যাও। এখানকার হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। আমার শুভেন্দুদা সেই বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু তিনি যা পারেন তা তো আর কেউ পারে না। তোমাকে তাই আমি আটকাব না। তবু মাঝে মাঝে লোভ হয়,

ভুজঙ্গ আর থাকতে পারলে না। ওর খাটের একান্ত সন্নিকটে স'রে এসে ওর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে, কি লোভ হয় দিদি?

ব্রততী বলতে যাচ্ছিল, তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভুজঙ্গ আর বিপিনকে নিজের কাছে আটকে রাখা। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিলে। বললে, নাঃ! কিছু লোভ হয় না ভুজঙ্গদা। তুমি রবিবারেই যাও।

ভুজঙ্গ আর ইলা চ'লে এল।

গাড়িতে উঠে ইলা বললে, আশ্চর্য মেয়ে এই ব্রততীদি! আমাদের সঙ্গে কীই বা সম্পর্ক বলুন। অথচ মনে হয় যেন সহোদরার চেয়েও আপন। ওর কথা শুনে মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল!

ইলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ভুজঙ্গ কিন্তু যেমন নীরবে ব'সে ছিল তেমনি বসে রইল। কোনো সাড়া দিলে না।

একটু পরে ইলা আবার বললে, আপনি চ'লে যাচ্ছেন শুনেও মনটা খুব খারাপ হোল। আপনাদের সব কথা আমি জানি না। কিন্তু এইটুকু বুঝছি যে, এই ক'মাসে একটা ঝড়ের ঝাপটা আপনাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আপনাদের ঘরে আগুন লেগে গেছে,—এক একটা গাছতলায় আপনারা নিরাশ্রয় এবং নিঃসঙ্গ বসে।

ভুজঙ্গ এতেও সাড়া দিলে না।

ইলা বললে, রবিবার তো পরশুর পরের দিন। এর মধ্যে আর কি দেখা হবে ?

—তা তো নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না ইলাদেবী। কিন্তু চেষ্টা করব যাবার আগে দেখা করবার। যদি নিতান্তই কোনো কারণে দেখা করতে না পারি,

—তাহ'লে কোন্ ট্রেনে যাবেন বলুন। আমরা নিশ্চয় স্টেশনে দেখা করব।

—আবার অতদূর যাবেন কষ্ট ক'রে ?

—যাব না ? বলেন কি ! কোন্ ট্রেনে যাচ্ছেন বলুন।

—ঠিক করিনি। সন্ধ্যা আটটার ট্রেনে যাব এই রকম ভেবেছি।

—পৌঁছুবেন কখন ?

—কাপাসতলায় যেতে ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। কিন্তু এই গাড়িটা একটা লোকাল ট্রেন,—অতদূর যায় না। রাত্রিটা মধ্যেখানে কাটিয়ে ভোর চারটের একটা ট্রেন সেখান থেকে ছাড়ে, কাপাসতলা পৌঁছয় পাঁচটায়।

—তাহ'লে এ ট্রেনে যাচ্ছেন কেন ?

—কেন শুনবেন ? এখানকার দিনগুলি আমি এখানকার রাত্রির অন্ধকারেই রেখে যেতে চাই। নতুন প্রভাতে নতুন ক'রে সেখানকার জীবন আরম্ভ হোক। অনেক হিসাব ক'রে তাই সন্ধ্যার গাড়িটাই পছন্দ করেছি। বিগত জীবনটাকে আমি একটা দুঃস্বপ্নের মতোই ভুলতে চাই।

কপালে চোখ তুলে ইলা জিজ্ঞাসা করলে, সেই সঙ্গে আমাদেরও ? আপনি তো বড় সর্বনেশে লোক মশাই !

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, সে কি আজ জানলেন? আজীবন শুধু তো সর্বনাশের ঝাণ্ডাই বয়ে বেড়ালাম! তাছাড়া আর কি করলাম বলুন।

ইলাদের বাড়ি এসে গেল। সুতরাং তার আর বিতর্কের মধ্যে যাবার সময় রইল না। বললে, আপনি ভুলতে চাইলেই কি আমরা ভুলতে দোব ভেবেছেন? দাদার শরীর একটু ভালো হোলেই আমরা আপনার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হব।

—যাবেন সত্যি? গেলে ভারি খুসি হব। বরং আমি বলি কি, শুভেন্দুবাবু সেরে উঠলে ওঁকে শুদ্ধ নিয়ে যাবেন।

—তাই যাব। আচ্ছা নমস্কার!

ব্রততীর ঝামেলা মিটলো। তাকে নিয়েই ভুজঙ্গের ভয় ছিল। একে তার হার্টের এইঅবস্থা, তার উপর ভুজঙ্গের যাওয়া নিয়ে শেষ মুহূর্তে সে যদি ভেঙে পড়তো, তাহলে ভুজঙ্গের যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। কিন্তু ব্রততী মোটেই বাধা দিলে না। তার যাওয়া সম্বন্ধে এখন সে নিশ্চিন্ত।

সকালে যখন সে উঠলো, শুধু তার মন নয়, তার দেহও যেন হাল্‌কা বোধ হোল। আজ থেকে 'কৃশানু'তে সম্পাদক হিসাবে তার নাম আর প্রকাশিত হবে না। সকালের কাগজখানা উল্‌টে শেষের পাতার নিচের দিকে তার নাম নেই দেখে সে খুসি হয়ে উঠলো। একটা মস্ত বড় বোঝা স'রে গেল।

চাকরটা কিন্তু যথাপূর্ব চা এবং প্রাতরাশ নিয়ে হাজির হোল।

—আবার এই সব এনেছিস হারাধন! মুড়ি পাওয়া যায় না বাজারে? মুড়ি আনতে বলেছিলাম যে!

হারাধন সাড়া দিলে না।

—তুই কি কোথাও কাজ-কর্ম দেখলি? রবিবারের তো আর দেরি নেই। সোমবার থেকে এরা তো আর থাকতে দেবে না।

হারাধন তথাপি সাড়া দিলে না।

—দেখি, ব্রততীকে একটা টেলিফোন করে। আমি বললে সে হয়তো তোকে রাখতে পারে।

হারাধন এতক্ষণে সাড়া দিলে: কিন্তু সেখানে আপনাকে দেখবে কে?

ভুজঙ্গ হো হো করে হেসে উঠলো: সেখানে আর দেখাদেখি কি রে। খাওয়া-দাওয়া? তুই কি ভেবেছিস সেখানে আমি তোর মতো এমনি ক'রে বসে ব'সে পাঁচ-রকম রান্না করব? সকালে ডিমের পোচ আর রুটি? সেখানে জলখাবাব মুড়ি আর নারকেল। দিনে ভাতের সঙ্গে উচ্ছে, পটল, আলু, কাঁচকলা, যা থাকবে দিয়ে দোব, সিদ্ধ হোলে নামিয়ে নোব। রাত্রে এক বাটি দুধ, ব্যস্। দেখবি, শবীর সেবে যাবে।

হারাধন মনে মনে বললে, শরীব যা সেরে যাবে তা বেশ বুঝছি। প্রকাশ্যে বললে, সে কি হয? আমাকে নিযে চলুন।

—মাইনে নিবি না?

—এখান থেকে দুশো টাকা ক'রে তো পাঠাবে।

—সে খবরও সংগ্রহ কবেছ বাবা! কিন্তু সে টাকা আমি নোব না। আমি খালি ত্রিশ টাকা নোব। শোন্, ওসব পাগলামি ছেড়ে দে। আমি তোকে তিন মাসের মাইনে কাল দিযে দোব। তুই কিছুদিনেব জন্যে দেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদেব দেখে আয়। আমি ব্রততীকে বোলে রাখব, ফিবে এসে তুই তার ওখানে কাজ করবি। আর কোথাও চাকবী তোর পোষাবে না আমি বুঝছি। তোব পবকাল আমিই ঝরঝবে ক'রে দিযেছি। এক ওখানেই তোর পোষাবে। বুঝলি?

হারাধন বুঝলে। কিন্তু জীবনে তার ধিক্কার এল। বড় ছেলেটা যদি আব একটু লায়েক হ'ত, তাহ'লে তাকে ব্রততীর বাড়ি কাজ দিয়ে বাকি জীবনটা সে বিনামাইনেয় বাবুব কাছে কাটাতে পারত। কিন্তু তার লায়েক হবাব এখনও ঢের দেরি।

কিন্তু বাবুর কাছে এত কথা বলার তার সাহস নেই। সুতরাং চায়ের বাটি নিয়ে নিঃশব্দে সে নিজের কাজে চ'লে গেল।

সকালে ভুজঙ্গেব কোথাও বেরুবার ছিল না। সুতরাং ঈজি চেয়ারটাতে নিঃশব্দে শুয়ে কাটিয়ে দিলে। দুপুরে আহারান্তে নিদ্রা। দুপুরে একটুখানি

ঘুম তার বহুদিনের অভ্যাস। কিন্তু এ রকম ঘুম সে কখনও দেয়নি। চারটেয় যখন তার ঘুম ভাঙ্গলো তখনও আলস্য কাটেনি।

তার পাশ ফেরার শব্দ পেয়ে হারাধন এসে ডাকলে: চা হয়ে গেছে বাবু!

ভুজঙ্গকে বাধ্য হয়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে আসতে হোল।

চা খেয়ে ভুজঙ্গ আবার গিয়ে সেই ঈজি চেয়ারটায় বসলো। মাথায় তার কাপাসতলার স্বপ্ন: শীর্ণ কাদা-ভরা রাস্তা, খড়ে-ছাওয়া জীর্ণ কুটির, অনশন-খিন্ন রুগ্ন নরনারী, বন্ধ্যা মাঠ। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে টেরও পায়নি সে। চাকরটা এসে আলো জেলে দিতে ওর চমক ভাঙলো।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও কি বেরুবেন? ড্রাইভার জিগ্যেস করছে।

—না।

—আর একটু চা দোব তাহ'লে?

—দরকার নেই।

হারাধন চ'লে যাওয়ার পরেই শঙ্কর এবং ইলা এল। ওরা হাসপাতাল থেকে আসছে। শুভেন্দুর রক্তবমন এখনও বন্ধ হয়নি। ডাক্তারে ওর শরীরে রক্তদানের কথা বলছেন।

ভুজঙ্গ বললে, বেশ তো। কত রক্ত দিতে হবে?

শঙ্কর বললে, অন্ততঃ আড়াইশো সি সি.। পরে আরও লাগতে পারে।

—পরে তো আমি থাকব না শঙ্করবাবু। তাহ'লে আমার রক্তই আগে নেওয়া হোক।

—বেশ। তারপরে আমি দিলাম। কিন্তু আরও যদি দরকার হয়?

—তার জন্যে চিন্তা কি! আমাদের বিপিন রয়েছে তো। এই যে বিপিন! অনেক দিন বাঁচবে। এই মাত্র তোমারই নাম করছিলাম।

আসামাত্র এই সম্বোধনায় বিপিন হতচকিত হয়ে গেল। বললে, কি ব্যাপার!

ভুজঙ্গ বললে, শুভেন্দুবাবুর জন্যে কিছু রক্তের প্রয়োজন। তাই বলছিলাম, বিপিন যখন আছে তখন সে বিষয়ে কিছু অসুবিধা হবে না।

—কত রক্ত চাই ?

শঙ্কর বললে, তা তো এখনই বলা যাচ্ছে না। কাল ভুজঙ্গবাবু রক্ত দিচ্ছেন। পরে দরকার হোলে আমি দোব। তারপরে

বাধা দিয়ে বিপিন বললে, তার পরের কথাও ভাবতে হবে না, আগের কথাও না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করবার আমিই করব। কিন্তু আপনার পরশু যাওয়াই ঠিক তো ভুজঙ্গদা ?

—কেন, তোমার কি অন্য কোনো রকম আদেশ আছে ?

জিভ কেটে, অপ্রস্তুতভাবে বিপিন বললে, কি যে বলেন আপনি ! যাওয়ার আনন্দে আপনার মুখে আর কিছুই আটকাচ্ছে না। বৌদি বললেন, কাল দুপুরে আপনি ওবাড়িতে খাবেন। আপনাদের বাড়িও যাচ্ছিলাম শঙ্করবাবু। ভালোই হোল, এখানেই দেখা হয়ে গেল। আপনাদের দুজনকেও বৌদি নিমন্ত্রণ করেছেন।

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ব্রততীদি ?

—ভালোই।—বিপিন বিজ্ঞের মতো বললে,—কিন্তু, জানেনই তো, অসুখটা অত্যন্ত পাজি। মন্দ হবার আগে তো নোটিশ পাওয়া যায় না। সুতরাং সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।

ভুজঙ্গ বললে, তাহ'লে এ অবস্থায় আবার নিমন্ত্রণ না করলেই তো ভালো ছিল বিপিন।

ঘাড় নেড়ে বিপিন বললে, না তার জন্যে আব অসুবিধা কি ! তাছাড়া বুঝতেই তো পারছেন, যাওয়ার আগে সামনে ব'সে আপনাকে একদিন না খাওয়ালে আমারই ঝামেলা বাড়তো।

বিপিন হাসতে লাগলো।

শঙ্কর বললে, তাহ'লে এক্ষেত্রে আমরা নিতান্তই উপলক্ষ্য, না বিপিনবাবু ? আসল লক্ষ্য ভুজঙ্গবাবু।

বিপিন জবাব দিলে, তা হ'তে পারে। কিন্তু উপলক্ষ্যকেই বা তুচ্ছ ভাবছেন কেন ? তাও তো সামান্য নয়। জানেন শঙ্করবাবু, আমার বৌদির লক্ষ্যে উপলক্ষ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল কথা কাল দুপুর

থেকে বিকেল পর্যন্ত আপনাদের তিনি কাছে পেতে চান। সুতরাং সকাল-সকাল আসবেন আর দেরি ক'রে ফিরবেন। আচ্ছা, আমি তাহ'লে উঠি। অন্য জায়গায় আমার একটু দরকার আছে।

বিপিন উঠলো।

শঙ্কর বললে, আমরাও উঠি ভুজঙ্গবাবু। কাল দুপুরে তো দেখা হচ্ছেই।

ওরাও চলে গেল। বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ভুজঙ্গ সেই অন্ধকারে আবার স্বপ্ন দেখতে বসলো। একবার শুভেন্দুর কথাটাও মনে পড়লো। রক্ত এখনও বন্ধ হচ্ছে না, এটা খুব ভালো বোধ হোল না।

পরদিন দশটার মধ্যেই ভুজঙ্গ স্নান সেরে নিলে এবং ব্রততীর বাড়ি চ'লে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উপর-নীচে করা ছাড়া আর সমস্ত বাধা-নিষেধ ডাক্তার ব্রততীর উপর থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং ভুজঙ্গ যখন গিয়ে পৌছুল তখন ব্রততী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে রান্না সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ দিতে ব্যস্ত।

ভুজঙ্গকে দেখে ব্রততী হেসে বললে, ভেতরে বসবে, না এইখানেই বসবে ?

ভুজঙ্গ উত্তর দিলে, এইখানটাই তো ভালো ব্রততী, রান্নাঘর এবং খাবার ঘর দুটোই কাছে পড়ে।

—তাহ'লে এইখানেই বোসো।

—শঙ্করবাবুরা আসেন নি ?

—সকলেই তো তোমার মতো পেটুক নয় যে, একটায় নিমন্ত্রণ দশটায় এসে উপস্থিত হবেন !

—বিপিনকে দেখছি না ? সেও কি খাবার ঠিক দশ মিনিট আগে আসবে ?

ব্রততী হেসে ফেললে। বললে, না। সে গেছে ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে। সেখান থেকে যাবে সেই রক্ত পৌছে দিতে হাসপাতালে। তার অদৃষ্টে হয়তো খাওয়াই নেই। যত উড়ো-ছাই তার গায়েই এসে পড়ে।

ভুজঙ্গ বুঝলে, রক্তটা কার জন্যে দরকার তা আর বিপিন ব্রততীকে জানায়নি।

ব্রততী হাসপাতালের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, দাদার খবর জানো ?

—ভালোই।

—তুমি গেছলে নাকি ?

—না। শঙ্করবাবুরা কাল গেছলেন। সেখান থেকে তাঁরা আমার ওখানে যান। বিপিন বলেনি ?

ব্রততী বললে, বলেছে। আশ্চর্য দেখ, তাঁরা জানেন দাদার খবরের জন্যে আমি ছটফট করছি। অথচ তাঁরা তোমার ওখানে গেলেন, কিন্তু আমার কাছে আর আসতে পারলেন না !

অভিমানে সে ঘাড় বাঁকালে।

ভুজঙ্গ সান্ত্বনা দিলে, খবরটা দেবার জন্যে তাঁরা আমার কাছে যাননি ব্রততী, অন্য দরকার ছিল ব'লেই গেছলেন। যাকগে সেকথা। শোনো, আমার চাকরটাকে তোমার এখানে কাজ দেবে ?

—না।

—খুব ভালো চাকর। তোমার বাড়িতে কত চাকর-বাকর। আর একটা বেশি হোলেও কিছু যাবে-আসবে না।

ব্রততী সে কথার আর জবাব দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম ভালো চাকর শুনি ? সিকি না দু'আনা ?

ভুজঙ্গ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, সিকি-দু'আনি আবার কি ?

হেসে ব্রততী বললে, তাও জাননা ? কি রকম চুরি করে তাই জিগ্যেস করছিলাম,—টাকায় সিকি, না দু'আনা ?

—না, না। সে রকম ছোকরা সে নয়। আমি কি করি জান ? আন্দাজমত মাসের খরচটা তাকে আগেই দিয়ে দিই। তাইতেই সে চমৎকার চালিয়ে নেয়। কম পড়লে কখনও সখনও চেয়ে নেয়। নইলে

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, বেশি হোলে ফেরৎ দেয় ?

—বেশি হয়নি কখনও।

—কি ক'রে বুঝলে ?

—হোলে ফেরত দিত নিশ্চয়ই।

ব্রততী হেসে বললে, বুঝেছি। এ আর সিকি-দু'আনি নয়, একেবারে আধুলি। তা হোক, পাঠিয়ে দিও, দেখব।

ভুজঙ্গ বললে, ওর ইচ্ছে আমার সঙ্গে কাপাসতলায় যায়। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। আমি ওকে মাইনে দোব কোত্থেকে! ওরও স্ত্রীপুত্র আছে, মাইনে না পেলেই বা তাদের চলবে কি ক'রে? অথচ আমার কাছে কাজের তো তেমন চাপ নেই। সুতরাং একটু আয়েসী হয়ে উঠেছে। অন্য কোথাও যে ও কাজ করতে পারবে, তা মনে হয় না। তাই

—তাই আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও, না?

অম্লানবদনে ভুজঙ্গ বললে, হ্যাঁ। আমার বোঝা তুমি ছাড়া আর কে বইবে বল?

—ও। তা পাঠিয়ে দিও।

—দোব।

এতক্ষণে শঙ্কর এবং ইলা এল। ভুজঙ্গ তখনই ওদের টিপে দিলে যাতে শুভেন্দুর অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত খবর তারা না দেয়।

খাওয়া-দাওযার পরে ভুজঙ্গ এক সময় ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে তোমার কিছু বলার আছে ব্রততী?

—না। কি আর বলার থাকবে?

—কোনো কথা বলার নেই?

—না।

—তুমি কি আমার আশ্রমে একদিন আসবে না ব্রততী?

—কি ক'রে বলব?

ভুজঙ্গ আর কিছু বললে না। বিকেলে এক সময় বিদায় নিয়ে চ'লে এল।

এর পরের দিন সন্ধ্যাবেলা।

হারাধনকে সে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দিলে। বাক্স-বিছানা এবং অধিকাংশ জামা-কাপড়ও। এত জিনিস সেখানে নিয়ে গিয়ে সে করবে কি? অফিসের বেয়ারারা এল প্রণাম করতে। তাদের কী কান্না! ভুজঙ্গের চোখ

এতক্ষণে ছলছল ক'রে উঠলো। তাদের প্রত্যেককে সে দশ টাকা ক'রে বকশিস দিলে। অনেক টাকা মাইনে পেয়েছে। এত টাকা নিয়ে গিয়ে করবে কি ?

হারাধন সমস্ত ক্ষণ তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ালো। কোনো প্রয়োজনে কাছে এলেও চোখ নামিয়ে থাকে। ভুজঙ্গ বুঝতে পারে, তার চোখে চোখ পড়লে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়েই অমন ক'রে বেড়াচ্ছে।

বিদায়ের সময় যত ঘনিয়ে আসে ভুজঙ্গের মনও তত ভারি হয়ে ওঠে। শুভেন্দু মৃত্যুর কথা ভাবছে। ভুজঙ্গ অতদূর ভাবে না। বস্তুতঃ মৃত্যু সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহলও নেই। কিন্তু সংসারে ভালোবাসার বন্ধনে যাদের সঙ্গে সে বাঁধা পড়েছে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, এও তো এক প্রকার মৃত্যু! মানুষের হৃদয় জীবনে কতবার যে এই মৃত্যু ভোগ করে তার ইয়ত্তা আছে? অমায়া দ্বারা এই মৃত্যুকে নাকি জয় করা যায়। কিন্তু সেই অমায়া কি সহজলভ্য ? সেই বা কি রকম যেখানে হৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করবে অথচ কোনো গ্রন্থী পড়বে না ? এ কি সত্যই সম্ভব ?

বিদায়ের পর্ব ভুজঙ্গ প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। শুভেন্দুর কাছে বিদায় নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ব্রততী স্বচ্ছন্দ চিত্তেই বিদায় দিয়েছে। শ্রী এবং নৃপেন এখানে নেই। তারা চ'লে যাওয়ার আগে তাদের কাছেও বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। আর ছিল প্রকাশদের দল। কিন্তু তাদের কাছে ক'বারই গিয়ে ভুজঙ্গ দেখা পায়নি। ক'লকাতার বাইরে কোথায় নাকি তারা খানিকটা জমি কিনেছে। কি ক'রে কিনেছে তারাই জানে। সেখানে নাকি তারা মাথা গোঁজবার মতো ছোট ছোট বাড়ি তুলছে। প্রত্যহ আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে তারা নাকি সেখানে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রে। সুতরাং তাদের কাছে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করা মিথ্যা।

আর আছে সত্যহরি। তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ভুজঙ্গ করেনি। তার ইচ্ছাই হয়নি। কেন হয়নি, তা সে নিজেও বলতে পারে না।

মৃত্যু! মৃত্যু! শুভেন্দুর ছোঁয়াচ যেন তাকেও লেগেছে, কিন্তু অন্য এক রকম ক'রে। তার মনে হচ্ছে, মৃত্যুর জন্যে সব সময় দেহত্যাগেরও আবশ্যক

করে না। এই দেহতেই মানুষ লক্ষ মরণে মরছে। মরলো সত্যহরি, মরলো শ্রী, মরলো প্রকাশের দল। কিন্তু সেই সঙ্গে মরলো না কি শুভেন্দু, মরলো না ব্রততী, মরলো না সে নিজেও?

হারাধন এসে পিছন থেকেই জিজ্ঞাসা করলে, চা আনি বাবু?

—আনো বাবা।

এই ডাকে তার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠলো। সে চা নিয়ে এল, প্রতিদিন যেমন ক'রে নিয়ে আসে,—চা এবং প্লেট-ভর্তি খাবার।

—আবার সেই খাবার এনেছিস বাবা?

—মুড়ি আপনি সেখানে গিয়ে খাবেন বাবু,—মুড়ি আর গুড়ের চা। আমি তা দেখতে যাব না। এখানে আমার সামনে এই খেতে হবে।

সে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। ভুজঙ্গ তাকে ডাকলে, শোন্।

সে পিছনেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, সামনে এল না।

ভুজঙ্গ বলতে লাগলো: আমার সঙ্গে চললো শুধু একটা কম্বল আর বালিশ। আর ওই কাপড়ের ঝুলিটায় খান দুই কাপড়, একটা পাঞ্জাবী আর খান কয় বই। আর যা এখানে রইলো, এ সব তোর। এগুলো তুই নিবি। অফিসে ব'লে দিয়েছি, কেউ বাধা দেবে না।

ব'লেই ভুজঙ্গ চমকে উঠলো। আরে, এই তো মৃত্যু! মৃত্যুকালে পিতা তার সম্পত্তি পুত্রকে দিয়ে যাচ্ছে! হারাধন কাঁদছে, যেমন পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদে বিয়োগবেদনাতুর পুত্র।

ভুজঙ্গ এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করলে। জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে, অফিস কি বন্ধ নাকি রে?

—না বাবু।

—তাহ'লে বাবুরা কেউ তো দেখা করতে এলেন না।

—তাঁরা বোধ হয় আসবেন না বাবু।

—কেন রে?

—ভয়ে।

—ভয়ে!

—হ্যাঁ বাবু। ওঁদের ধারণা আপনার সঙ্গে মাথামাথি করলে বড়বাবু চ'টে যেতে পারেন।

নৃপেনকে ওরা বড়বাবু বলে।

ভুজঙ্গ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমার সঙ্গে দেখা করলে নৃপেন চটতে পারে, একথা ওঁদেব মনে এল কি ক'রে?

হারাধন চুপ ক'রে রইল।

ভুজঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা কবলে, কিন্তু বেযারারা তো এসেছিল। তারা তো ভয় পাযনি।

—না বাবু।

ভুজঙ্গ ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাহ'তে আর মিথ্যে দেবি করা নয বাবা। চল, স্টেশনেই একটুক্ষণ বসা যাবে।

—তাহ'লে গাড়িটা বার কবতে বলি বাবু?

—গাড়িটা? অফিসের গাড়িটা! আজ থেকে আমি তো কাজ করি না হারাধন। গাড়িটা দেবে কেন?

—দেবে বাবু। আমাকে বলেছে, আপনি যখন বাব হবেন তখন ড্রাইভাবকে খবর দিতে।

—কি দরকার বাবা! রাস্তায একখানা রিক্সা ডেকে নেওযা যাবে' খন।

ভুজঙ্গ কাপড়েব ঝুলিটা কাঁধে তুলে নিতে যাচ্ছিল। হাবাধন হাঁ হাঁ ক'রে সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলে। বগলে নিলে বিছানাটা। বললে, আসুন।

নিচে নেমে হারাধন একটা ট্যাক্সি ডাকলে।

ভুজঙ্গ আপত্তি জানিযে বললে, আবার ট্যাক্সি কেন হারাধন, একটা রিক্সা হোলেই তো,

বাধা দিয়ে হারাধন বললে, কী যে বলেন বাবু! উঠুন।

ব'লে নিজে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো।

হাওড়া স্টেশন।

প্ল্যাটফর্মের উপর বিছানাটা নামিয়ে তার উপর হারাধন ভুজঙ্গকে বসালে। ঝুলিটা দিয়ে বললে, এটা ধরুন। আমি টিকিটটা ক'রে আনি।

ভয়ঙ্কর ভিড়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জানালার সামনে সার বেঁধে টিকিট কেনবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টিকিট কিনে আনতে হারাধনের বেশ খানিকটা দেরি হোল।

বললে, খুব ভিড় হবে। ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগে না গেলে জায়গা পাওয়া মুস্কিল হবে।

ঝুলি কাঁধে এবং বিছানাটা বগলে নিয়ে হারাধন এগিয়ে চললো। পিছনে ভুজঙ্গ। ঠেলে ঠুলে একপাশে জানালার ধারে ভুজঙ্গের জন্যে একটুখানি জায়গা সে কোনোমতে ক'রে দিলে। ভুজঙ্গ জানালার বাইরে এদিক-ওদিক চায় ইলাদের জন্যে। কিন্তু তাদের আর দেখা নেই।

ট্রেন ছাড়তে আর যখন মিনিট দশেক আছে, দেখা গেল শঙ্কর আর ইলা আসছে।

এসে কৈফিয়তের সুরে বললে, আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর বললে, আর কেউ আসেনি ?

ওদের মুখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে ভুজঙ্গ কি যেন ভাবছিল। ওদের প্রশ্ন বোধ হয় তার কানেই গেল না।

ওরা আবার জিজ্ঞাসা করলে, একাই চললেন তাহ লে ?

এবারে কথা কানে যেতেই ভুজঙ্গ চমকে উঠলো। বললে, একা কেন ? আরও অনেকে চলেছেন সঙ্গে।

—আবার কে ?—ওরা ভিতরের দিকে দৃষ্টি হানলে।

—ব্রততী যাচ্ছে।—ভুজঙ্গ হাসলে।

—তাই নাকি ? কই তিনি ?—ইলা উৎসাহের আধিক্যে জানালা দিয়ে ভিতরে মাথাটা গলিয়ে দিলে।

ভুজঙ্গ হাসলে। বললে, শুধু ব্রততী নয়, শুভেন্দুবাবুও যাচ্ছেন।

সে আবার কি! এবারে ওরা রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ভুজঙ্গ যেন আগের বাক্যের জের টেনেই বলতে লাগলো: সবাই যাচ্ছেন, রক্তমাংসের দেহে যদিচ নয়, যাচ্ছেন আমার চোখের স্বপ্নে। শঙ্করবাবু, মৃত্যু নেই,—বয়ে চলেছে একটা অবিচ্ছেদ্য অখণ্ড জীবনপ্রবাহ। মানুষও কোনোদিন একা নয়, তার জীবন-মুকুরে প'ড়েছে সহস্র লোকের ছায়া। আমিও তাই বয়ে নিয়ে চ'লেছি এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে।

ভুজঙ্গ নিমীলিত চক্ষে দৃশ্যটা যেন দেখতে লাগলো।

শেষ ঘণ্টা পড়লো: ঢং ঢং।

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়ালো বিপিন। ট্রেনের বাঁশি তখন বেজেছে।

বিপিন বললে, পায়ের ধুলো নেওয়া আর হোল না। যাই হোক, এইটে রাখুন।

ব'লে একটা টিফিন-ক্যারিয়ার জানালা দিয়ে গলিয়ে দিলে।

—কি এটা?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে।

—আপনার রাত্রের খাবার। বৌদি পাঠিয়ে দিলেন।

আরও কত কি সে বলতে লাগলো। কিন্তু ট্রেন বিপিনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। তার সমস্ত কথা শোনা গেল না।

শেষ